অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল

(Higher Secondary)

শ্রী কে, কে, দত্ত এম, এ
ভূতপূর্ব অধ্যাপক, সিটি কলেজ, কলিকাতা
সহযোগিতায়
শ্রী এস, এল, গুহ এম, এ
অধ্যাপক, সিটি কলেজ, কলিকাতা

বুক লজ
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১।১।১ডি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মূল্য : চার টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা মাত্র

প্রকাশক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সাহা রায়

১।১।১ডি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—সেপ্টেম্বর—১৯৫৬

এজেন্ট

মৌলিক লাইব্রেরী
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

বেঙ্গল বুক এজেন্সি
১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

বামা পুস্তকালয়
১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২

জে, এন, ঘোষ এণ্ড সন্স
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স
১/১/১ডি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

সান্যাল এণ্ড কোং
১/১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

এইচ, ঠাকুর এণ্ড ব্রাদার্স
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

এবং

কলিকাতা ও মফঃস্বলের সমস্ত পুস্তকের দোকানে পাওয়া যায়।

মুদ্রাকর—শ্রীবিনয়রতন সিং
ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪১ বিবেকানন্দ রোড, কলি[illegible]

ভূমিকা

পনেরো বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে বাংলা ভাষায় অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল রচনার যে পরীক্ষা-মূলক প্রয়াস আমরা আরম্ভ করিয়াছিলাম, অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দের আনুকূল্যে, আমাদের সে প্রচেষ্টা সার্থক হইয়াছে। গত বৎসর কলিকাতা প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্ধমান প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্য আমাদের যে নূতন অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল প্রকাশিত হইয়াছিল, অল্পকালের মধ্যেই তাহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে।

অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দের এই আনুকূল্যে উৎসাহিত হইয়া আমরা বর্তমানে উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য আমাদের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোলের এই প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করিতেছি। বলা বাহুল্য এই গ্রন্থের ক্ষেত্রেও আমাদের গ্রন্থ-রচনার আদর্শকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। যাহাদের জন্য ইহা রচিত হইল, তাহারা যদি ইহার দ্বারা উপকৃত হয় তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হইবে।

ইতি

গ্রন্থকারদ্বয়

এই বইখানির বৈশিষ্ট্য :

- এই বইতে আলোচিত প্রশ্নের সংখ্যা অন্যান্য বই অপেক্ষা অনেক বেশী।

- সিলেবাস অনুযায়ী প্রত্যেক অধ্যায়ের যথাসম্ভব সম্ভাব্য প্রশ্নগুলি আলোচিত হইয়াছে।

- যে প্রশ্নের উত্তরে যে মানচিত্র প্রয়োজন তাহা দিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করা হয় নাই।

- যে প্রশ্নের যে উত্তব তাহাই লেখা হইয়াছে। কতকগুলি প্রশ্ন দিয়া একটি উত্তর লেখার চেষ্টা করা হয় নাই।

- উত্তর যথাসম্ভব সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে এবং যে প্রশ্নেব যতটা উত্তর প্রয়োজন তাহাই দেওয়া হইয়াছে।

- যথাসম্ভব নূতন পরিসংখ্যান দেওয়া হইয়াছে।

- বই সিলেবাস অনুযায়ী লেখা হইয়াছে এবং কোন কিছুই বাদ দেওয়া হয় নাই। সুতরাং শিক্ষার্থীদের অন্য কোন পাঠ্য-পুস্তক পড়ার প্রয়োজন হইবে না।

Board of Secondary Education, West Bengal

Syllabus in Economic

Geography

ECONOMIC GEOGRAPHY

Map-work—Candidates may be required to draw outline maps of (*a*) the World (*b*) India, and locate therein climatic regions, production centres, trade routes and trade centres.

CLASS IX & X

1. (A) Man and his environment.

Principal factors of environment :—(*a*) Physical : geographical location, mountains, rivers, coast-line ; climate, soil, animals, vegetation, minerals etc. (*b*) Non-physical : population, political and social organization, religion, etc. Adaptation of man to his environment ; effects of environment on the economic life of man.

Examples from Indian conditions.

1. (B) The Importance of Economic Geography.

2. Climatic regions of the world—Polar, Temperate (cool and warm), Tropical and Equatorial—their influence on vegetation, animal life, distribution of population, transport, economic development, etc. Natural divisions in India,

3 Principal resources of the world and their utilisation (To be studied with special reference to Indian condtiions)

(*a*) Agriculture and rural industry : Agriculture—its main features , intensive and extensive cultivation ; types of farming ; importance of soil and irrigation. Principal agricultural products —(i) Food crops : Rice, wheat, tea, coffee, sugar-cane and sugar-beet : (ii) Commercial crops : Cotton, jute, hemp, silk, rubber and oilseeds. Their uses and principal growing areas, important markets.

(*b*) Forests : (*i*) Different classes of forests—distribution of forest areas—products of the forests—other advantages. The Lumber industry and the paper-pulp industry. (*ii*) Indian forests and their utilisation.

(*c*) Pastoral Industries : (i) Livestock—its importance—food, transport and power, raw materials, clothing. Principal products and their uses. Production of raw wool, hides and skins, frozen meat Important areas devoted to commercial roaring of Cattle and Sheep. (ii) India's livestock problems—trade in Hides and Skins.

1. *Minerals and power resources* : (*a*) Mining : its features. Principal minerals and their uses—(i) Metals : Iron, copper, lead, tin, alumininm. (ii) Non-metallic : Coal, petroleum salt, mica, building materials, principal fields of the world and their reserves important mining industries. (*b*) Hydro-electricity—Importance. (*c*) Principal minerals in India and their problems. Multi-purpose schemes in India in relation to power and irrigation.

2. *Fishing* : (*a*) Sources—inland, coastal and deep sea. Physical characteristics of fishing grounds—principal fishing grounds. Problems of the fishing industry. (*b*) The fishing industry in India.

3. *Transport, trade routes and trade centres* : (*a*) Importance of transport—different modes of modern transport—roads, inland —waterways, railways, shipping, airways. A descriptive study with special reference to India. (*b*) Trade Routes : Land Routes (road and rail) Water Routes (ocean, canal and river) and Air-routes, Examples of Important Routes. The Suez Canal and the Panama Canal. (*c*) Trade Centres : (i) Ports and Harbours : their functons, relation with the hinterlond ; required conditions for development. Some important ports of international standing, India's principal ports. (ii) Towns and Cities ; Conditions favouring growth—some important trade centres of the world.

CLASS X1

(A) *Manufactnring Industries* :

(*a*) Essential factors for development—raw materials, power resources, climate. transport, labour and markets. Important Industries—Iron and Steel, Textile (cotton, woollen, silk and artificial silk), Jute, Paper and Chemical. Chief world centres.

(*b*) Principal manufacturing industries in India—Cotton, Iron and Steel ; Jute, Paper, Sugar, Chemical and Engineering.

(B) Foreign Trade of India—direction and composition.

(C) Population—regional distribution—density of population—factors of density.

(D) West Bengal—Principal Agricultural and Mineral resources—Large scale industries and industrial regions—Tea industry —Importance of Calcutta Port.

সূচীপত্র

(নবম শ্রেণী)

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় ... ... ১—৪২

মানুষ ও তাহার পরিবেশ (Man and his Environment)

(বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব—অবস্থান ভূপ্রকৃতি—নদ-নদী—উপকূল—জলবায়ু—ভূত্বক—মৃত্তিকা — উদ্ভিদ — জীবজন্তু—আকৃতি — আয়তন — ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব—অপ্রাকৃতিক পরিবেশ—জাতি—ধর্ম—সরকার—সমাজ—লোকসংখ্যা।)

দ্বিতীয় অধ্যায় ... ... ৪৩—৪৫

অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা

(Definition and Importance of Economic Geography)

তৃতীয় অধ্যায় ... ... ৪৫—৭২

প্রাকৃতিক অঞ্চল (Natural Regions)

(প্রাকৃতিক অঞ্চলের ব্যাখ্যা — বৈশিষ্ট্য—প্রয়োজনীয়তা — বিভিন্ন বিভাগ—সংক্ষিপ্ত বিবরণ—প্রধান প্রধান অঞ্চলের বিশদ বিবরণ ও তুলনামূলক বিচার—ভারতের প্রাকৃতিক অঞ্চল।)

চতুর্থ অধ্যায় .. .. ৭৩—১৫১

কৃষি (Agriculture)

(কৃষির সাফল্য—বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকা—ভারতের বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকা—ভূমিক্ষয় সমস্যা ও প্রতিকার—ধান, গম, পাট, তুলা, ইক্ষু, বাট, রবার, চা, কফি, শণ, রেশম ও তৈলবীজের ব্যবহার, উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা, উৎপাদন ও বণ্টন।)

পঞ্চম অধ্যায় ... ... ১৫২—১৬২

অরণ্য সম্পদ (Forest Resources)

(পৃথিবীর অরণ্য সংস্থান ও উহাদের বিবরণ—ভারতের অরণ্য ও অরণ্যজাত দ্রব্য—কাষ্ঠ চেরাই শিল্প।)

ষষ্ঠ অধ্যায় ... ... ১৬৩—১৭৬

পশুপালন (Pastoral Industries)

(পশুর উপকারিতা—পশুচারণ ক্ষেত্র—পশুজাত দ্রব্য—পশম, চামড়া, মাংস, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য—ভারতের পশু ও চামড়ার ব্যবসা।)

(দশম শ্রেণী)

সপ্তম অধ্যায় ... ... ১৭৭—২২৫

খনিজ ও শক্তি-সম্পদ (Minerals and Power Resources)

(অর্থনৈতিক জীবনে খনিজ সম্পদের প্রভাব—স্বর্ণ ও হীরকের সহিত কয়লা ও লৌহের তুলনা—কয়লা, পেট্রোলিয়াম, জলবিদ্যুৎ, লৌহ, তাম্র, এ্যালুমিনিয়াম, সীসা, টিন, লবণ, অভ্র, গৃহ নির্মাণের উপযোগী দ্রব্যাদির ব্যবহার, বিভিন্ন দেশে ও ভারতে উৎপাদন ও বণ্টন।)

অষ্টম অধ্যায় ... ... ২২৬—২৪৩

বহুমুখী নদী পরিকল্পনা (Multipurpose River Projects)

(বহুমুখী নদী পরিকল্পনার অর্থ—দামোদর, ভাক্রা-নাঙ্গাল, ময়ূরাক্ষী, মহানদী, কোশী, তুঙ্গাভদ্রা, নাগার্জুন সাগর, মাচকুন্দ, রামাপদ সাগর, চম্বল, রিহাণ্ড, ভদ্রা, তাপ্তী, মাহী, কৃষ্ণা-পেনার, কয়না, কংসবতী, জলডাকা ও গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা—ভারতের সেচ ব্যবস্থা।)

নবম অধ্যায় ... ... ২৪৪—২৫৪

ম স্য আহরণ (Fishing)

(মৎস্যক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য—বিভিন্ন মৎস্যক্ষেত্র ও মৎস্য আহরণ—ভারতের মৎস্য আহরণ।)

দশম অধ্যায় ... ... ২৫৫—২৮৫

পরিবহন ও বাণিজ্য পথ (Tr ınsport & Trade Centres)

(পরিবহনের গুরুত্ব—বিভিন্নপ্রকার পরিবহন ব্যবস্থা—মহাদেশ অতিক্রমী রেলপথ —জলপথ—সুয়েজ-পানামা—মহাসাগরীয় আকাশ পথ—ভারতের আকাশপথ।)

একাদশ অধ্যায় .. ... ২৮৬—৩২৬

বন্দর, বাণিজ্যকেন্দ্র, নগর ও শহর (Ports, Trade Centres, Cities and Towns)

(বন্দরের উন্নতি—পশ্চাৎভূমি—পুনঃরপ্তানি বন্দর—পৃথিবীর প্রধান প্রধান বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র — ভারতের বন্দর — সহর পত্তন—ভারতের বিভিন্ন সহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র ।)

(একাদশ শ্রেণী)

দ্বাদশ অধ্যায় ... ... ৩২৭—৩৫১

শ্রম শিল্প (Manufacturing Industries)

(শ্রম-শিল্পের একদেশতার কারণ—পৃথিবীর ও ভারতের লৌহ ও ইস্পাত, কার্পাস, ইক্ষু, পাট, পশম, রেশম, কৃত্রিম রেশম, কাগজ, রাসায়নিকশিল্প ও ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ।)

ত্রয়োদশ অধ্যায় ... ...

ভারতের বহির্বাণিজ্য (Foreign Trade of India)

(ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য—গতি ও প্রকৃতি ।)

চতুর্দশ অধ্যায় .. ...

জনবসতি (Population)

(পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে লোক সমাবেশ—কারণ—ভারতের লোক-বসতি ও কারণ ।)

পঞ্চদশ অধ্যায় ... ...

পশ্চিমবঙ্গ (West Bengal)

(পশ্চিমবঙ্গের কৃষি—খনিজ সম্পদ—বৃহদাকার শিল্প—শিল্পাঞ্চল—চা শিল্প—কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব ।)

Higher Secondary Questions from 1960 to 1963.

চিত্র-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। মানুষ ও তাহার পরিবেশ	৫
২। পৃথিবী (প্রাকৃতিক)	১১
৩। ভগ্ন ও অভগ্ন তট	১৪
৪। নদী মাতৃক প্রাচীন সভ্যতা	২১
৫। ভারত (প্রাকৃতিক)	২৫
৬। গঙ্গা নদীর সমস্থলী	২৮
৭। ভারত (তটরেখা)	৩৩
৮। ভারত (বৃষ্টিপাত)	৩৭
৯। ভারত (অবস্থান)	৩৮
১০। প্রাকৃতিক অঞ্চলের বিভাগ	৪৬
১১। পৃথিবীর প্রাকৃতিক বিভাগ	৫৩
১২। পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চল	৫৭
১৩। পৃথিবীর মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল	৬১
১৪। পৃথিবীর ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর দেশ	৬৩
১৫। ভারতের প্রাকৃতিক অঞ্চল	৭০
১৬। পৃথিবী (মৃত্তিকা)	৭১
১৭। ভারত (মৃত্তিকা)	৮০
১৮। পৃথিবী (ধান)	৮৪
১৯। পৃথিবী (গম)	৮৮
২০। ভারত (গম)	৯২
২১। ভারত (ধান)	৯৫
২২। ভারত (পাট ও মেস্তা)	১০০
২৩। পৃথিবী (তুলা)	১০৫
২৪। পৃথিবী (ইক্ষু চিনি)	১১২
২৫। পৃথিবী (বীট চিনি)	১১৫
২৬। পৃথিবী (রবার)	১১৯
২৭। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রবার অঞ্চল	১২১
২৮। ভারত (চা)	১২৬

	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৯।	পৃথিবী (চা)	১২৭
৩০।	পৃথিবী (কফি)	১৩১
৩১।	ভারত (কফি)	১৩৭
৩২।	পৃথিবী (কাঁচা রেশম উৎপাদন স্থান)	১৫৩
৩৩।	পৃথিবীর উদ্ভিদ ও অরণ্যসম্পদ	১৫৫
৩৪।	ভারত (বারিপাত)	১৫৮
৩৫।	পৃথিবী (কয়লা)	১৮৬
৩৬।	ভারত (কয়লা)	১৮৮
৩৭।	পৃথিবীর পেট্রোলিয়াম উৎপাদন ও রপ্তানি	১৯৩
৩৮।	ভারত (পেট্রোলিয়াম)	১৯৬
৩৯।	পৃথিবীর কার্য্যকরী জল বিদ্যুৎ শক্তি	২০১
৪০।	ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদন	২০৫
৪১।	পৃথিবীর লৌহ আকরিক	২১১
৪২।	ভারত (লৌহ খনি)	২১৩
৪৩।	পৃথিবীর (তামার খনি)	২১৬
৪৪।	পৃথিবীর (এ্যালুমিনিয়াম)	২১৯
৪৫।	দামোদর পরিকল্পনা	২২৮
৪৬।	ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা	২৩১
৪৭।	ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা	২৩৩
৪৮।	ভারতের নদী পরিকল্পনা	২৩৫
৪৯।	গঙ্গা-বাঁধ পরিকল্পনা	২৩৮
৫০।	ভারতের জলসেচ	২৪২
৫১।	পৃথিবী (মৎস্যচারণ ক্ষেত্র)	২৫০
৫২।	ভারত (মৎস্যসুলভ স্থান)	২৫৩
৫৩।	পৃথিবীর মহাদেশপারের রেলপথ	২৬৬
৫৪।	ভারতের রেলপথ	২৭০
৫৫।	আসাম লিঙ্ক	২৭২
৫৬।	সুয়েজ খাল	২৭৫
৫৭।	পানামা খাল	২৭৭
৫৮।	পৃথিবীর আটলান্টিক বাণিজ্য পথ	২৮১
৫৯।	পৃথিবী (আকাশ পথ)	২৮৩

	বিষয়			পৃষ্ঠা
৬০।	ভারতের বিমান পথ	...	...	২৮৫
৬১।	পৃথিবী (সহর ও বন্দর)	...	...	৩০১
৬২।	ভারতের প্রধান ও অপ্রধান বন্দর	..	...	৩০৭
৬৩।	ভারতের প্রধান বন্দর ও পশ্চাৎভূমি	..	...	৩১০
৬৪।	ভারত (সহর ও শিল্পকেন্দ্র)	...	...	৩১৯
৬৫।	যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প	...	...	৩৩০
৬৬।	এশিয়ার ও ইউরোপের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প		...	৩৩১
৬৭।	ভারত (লৌহ ও ইস্পাত শিল্প)	...	...	৩৩৫
৬৮।	জামসেদপুরের অবস্থান	...	...	৩৩৭
৬৯।	পৃথিবীর কার্পাস বয়ন শিল্প	...	...	৩৪১
৭০।	ইংলণ্ডের কার্পাস শিল্প	...	...	৩৪২
৭১।	ভারতের প্রধান বস্ত্র শিল্প কেন্দ্র	...	...	৩৪৪
৭২।	হুগলী নদীর তীরে পাটকল	...	...	৩৪৬
৭৩।	পৃথিবীর চিনি উৎপাদন	...	...	৩৪৮
৭৪।	ভারতের প্রধান চিনি উৎপাদন কেন্দ্র	...	...	৩৫০

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল

প্রথম অধ্যায়

মানুষ ও তাহার পরিবেশ
(Man and his Environment)

Q. I. What is meant by 'environment' in Economic Geography? Show, with suitable examples, that the economic activities of man are greatly influenced by his environment. (H. S. 1961)

(অর্থনৈতিক ভূগোলে 'পরিবেশ' শব্দের অর্থ কি? মানুষের অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপ যে প্রধানতঃ পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত উদাহরণ দ্বারা দেখাও।)

Or,

Describe, with suitable examples, the influence of Geographical environment on the economic activities of man. (H. S. 1960)

(মানুষের অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপ যে ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত উদাহরণ সহ বর্ণনা কর)।

Or,

What do you understand by Physical Environment of man?

Give illustrations, preferably from India, to bring out the effect of physical environment on the economic activity of man. (Pre C. U. 1961)

(মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশ বলিতে কি বুঝ? মানুষের অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব উদাহরণ সহ বর্ণনা কর। উক্ত উদাহরণ ভারত হইতে দেওয়া শ্রেয়)

Or,

Explain, with special reference to India, how the economic development of a country is greatly dependent on the physical factors of environment. (Pre C. U. 1963)

(প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর অর্থনৈতিক উন্নতি কিভাবে নির্ভরশীল তাহা বিশেষতঃ ভারত হইতে উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দাও।)

Ans. যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে মানুষ তাহার জীবনযাত্রা নির্বাহ করে তাহাকে **পরিবেশ** (Environment) বলে। মানুষের পরিবেশ বিভিন্ন প্রকার।

এই বিভিন্ন প্রকার পরিবেশ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। নিম্নে উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল :

পরিবেশ

প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক — অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি (পর্বত, মালভূমি, সমভূমি), তটরেখা, নদ-নদী, জলবায়ু, মৃত্তিকা, উদ্ভিদ্, জীবজন্তু

অপ্রাকৃতিক (সামাজিক বা অর্থনৈতিক) — জাতি, ধর্ম, সরকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, জনসংখ্যা

মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। অনুকূল পরিবেশ উন্নতির সহায়ক। প্রতিকূল পরিবেশ প্রতিপদে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া মানুষকে পশ্চাতে ঠেলিয়া রাখে। মানুষের উদ্যমশীলতা ও কর্মকুশলতা অবশ্য প্রতিকূল পরিবেশকে অনেকক্ষেত্রে লঙ্ঘন করিয়া দেশের ও দশের অর্থনৈতিক উন্নতির পথ সুগম করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে অনুকূল পরিবেশের মধ্যে বাস করিয়াও আলস্য ও শ্রমবিমুখতার জন্য অনেক দেশ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। সে যাহা হউক, বিভিন্ন প্রকার ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে নিম্নের আলোচনা হইতে উহা বুঝিতে পারা যাইবে :

(১) **অবস্থান (Location)** : অবস্থান দ্বৈপ উপদ্বীপীয়, প্রান্তীয়, তটসংলগ্ন, মহাদেশীয়, প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক সীমারেখা বেষ্টিত, উচ্চ-অক্ষাংশীয় বা নিম্নঅক্ষাংশীয় প্রভৃতি হইতে পারে। অবস্থানভেদে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং মানুষের কর্মপ্রচেষ্টায় পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর কোন দেশ ভূপৃষ্ঠের মধ্যস্থলে অবস্থিত, সমুদ্র-সান্নিধ্য, সমুদ্র, পর্বত, মরুভূমি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা বেষ্টিত এবং মধ্যঅক্ষাংশে অবস্থানজনিত সুখকর জলবায়ু সমন্বিত হইলে সেই দেশের পক্ষে একদিকে যেমন অধিবাসীদের শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব হয় অন্যদিকে ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্রের সান্নিধ্যহেতু অর্থনৈতিকক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতিলাভ করা সম্ভব হয়। গ্রেটব্রিটেনের এরূপ অনুকূল অবস্থান বর্তমান থাকায় উহা শিল্প-বাণিজ্যে অশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। ভারত তিনদিকে সমুদ্র ও উত্তরে হিমালয়ের মত প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা বেষ্টিত এবং পৃথিবীর প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায় ইহার অবস্থান-

জনিত অনুকূল পরিবেশ বর্তমান। বিদেশী শাসনমুক্ত হওয়ার পর হইতে অনুকূল পরিবেশের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইহা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু যে দেশের অবস্থান প্রাকৃতিক বাধায় পূর্ণ, চতুঃসীমা কৃত্রিম এবং পরিবহন ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক অসুবিধা ও আরও নানাবিধ অবস্থানজনিত অসুবিধা ভোগ করিতে হয় সে দেশের সর্ববিধ উন্নতি প্রতিপদে ব্যাহত হয়। তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, গ্রীণল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশকে এরূপ অবস্থানজনিত অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় বলিয়া অর্থ-নৈতিকক্ষেত্রে ইহারা অনগ্রসর।

(২) **ভূপ্রকৃতি** (**Physical Features**) : ভূপ্রকৃতি পর্বতময়, মালভূমি কিংবা সমভূমি সমন্বিত হইতে পারে। **পার্বত্য অঞ্চল** সাধারণতঃ শ্বাপদ-সঙ্কুল, বন্ধুর, কঙ্করময় ও বনভূমিতে সমাচ্ছন্ন। এজন্য এখানে যাতায়াত ও কৃষিকার্য্যের অসুবিধা, জনবিরল, এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম করিয়া চলিতে হয় বলিয়া এখানকার অধিবাসিগণ কষ্ট-সহিষ্ণু, বলিষ্ঠ ও সাহসী সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহারা অর্থনৈতিক জীবনে উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু পর্বত বৃষ্টিগর্ভ বায়ুকে প্রতিহত করিয়া বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং তুষার-শীতল বায়ুর গতিরোধ করিয়া দেশকে শীতের কঠোরতা হইতে রক্ষা করে। ইহা ছাড়া পর্বত নদীর উৎস, খনিজ ও বনজ সম্পদের আধার, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের আদর্শস্থল, পশু পালনের এবং স্বাস্থ্যলাভের উপযুক্ত স্থান। পর্বতের প্রভাবে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসিগণ অর্থনৈতিক উন্নতি-লাভের সুযোগ-সুবিধা পায়। (ভারতের হিমালয় পর্বত এরূপ সুযোগ-সুবিধা দিয়া আসিতেছে।) **মালভূমি** সৃষ্টি হয় পার্বত্যভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া। এজন্য অধিকাংশ মালভূমি কৃষি বা অন্যান্য ব্যাপারে বিশেষ সুবিধাজনক না হইলেও খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। (ভারতের দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, ব্রেজিলের বা যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপালেশিয়ান মালভূমি এরূপ নানাবিধ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ।) **সমভূমি** সাধারণতঃ উর্বর এবং পরিবহনযোগ্য। ইহা জলাভূমি, মরুভূমি, অত্যধিক শীতল বা অস্বাস্থ্যকর না হইলে লোকবসতির অনুকূল এবং কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে উন্নত হইতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবীর বিভিন্ন নদীমাতৃক সমভূমিতেই লোকবসতি সর্বাধিক। পৃথিবীর মোট আয়তনের শতকরা ৫০ ভাগ সমভূমি, কিন্তু উহাতে পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৯০ জন বাস করে। (ভারতের গঙ্গার অববাহিকার সমভূমি অঞ্চলে এরূপ অনুকূল পরিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।)

(৩) **নদ-নদী** (**Rivers**) : পরিবহন, ভূমির উর্বরতা সাধন, জলসেচন এবং অন্যবিধ জলের অভাব দূর করা নদীর কাজ। নদী বরফাবৃত বা খরস্রোতা না হইলে পরিবহনের সুবিধা ঘটায় এবং নদীর অববাহিকা অঞ্চলের উর্বরতার জন্য

কৃষিকার্য্যও উন্নতি লাভ করে। কৃষি ও যাতায়াত ব্যবস্থার সুযোগকে ভিত্তি করিয়া নানাবিধ অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা সফল হয় এবং উক্ত অঞ্চলের অধিবাসিগণ অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করিতে পারে। গঙ্গা, নীল, সিন্ধু প্রভৃতি নদীগুলিকে এইভাবে অর্থ নৈতিক উন্নতিতে পরম সহায়ক দেখিতে পাওয়া যায়।

(৪) **উপকূল (Coast-line) :** উপকূলের বৈশিষ্ট্য সাধারণতঃ দ্বিবিধ—ভগ্ন ও অভগ্ন। ভগ্ন উপকূল বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মাণের সুযোগ দিয়া বাণিজ্যিক সুবিধা ঘটায়, অধিবাসীদিগকে সমুদ্রভয়মুক্ত করে, ভাল নাবিক হইতে সাহায্য করে, সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের সুযোগ দেয় এবং এই ভাবে অর্থনৈতিক উন্নতিতে পরম সহায়ক হয়। কিন্তু অভগ্ন উপকূল বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করে। ইংলণ্ড ও জাপান ভগ্ন উপকূলের সুবিধার জন্য যতটা উন্নত ভারত ও আফ্রিকা অভগ্ন উপকূলের জন্য ততটা উন্নত হইতে পারে নাই। ভারতের উপকূল রেখা যে সমস্ত স্থানে কিছুটা ভগ্ন (যেমন, সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ) তথাকার অধিবাসিগণ কিছুটা ভগ্ন উপকূলের সুবিধা গ্রহণ করিয়াছে।

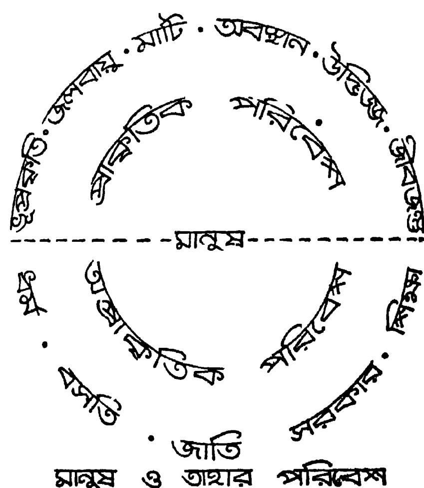
(৫) **জলবায়ু (Climate) :** জলবায়ু উদ্ভিদ উৎপাদন, জীবজন্তুর বাসস্থান, লোকবসতি, মানুষের কর্মকুশলতা, যানবাহন, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। জলবায়ুর বিভিন্নতার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদের এবং মানুষের কর্মপ্রচেষ্টায় প্রকারভেদ সৃষ্টি হয় এবং অর্থনৈতিক মান নির্ণীত হয়। সুখকর নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু সাধারণতঃ মানুষের সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক উন্নতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। গ্রেটব্রিটেন, জাপান প্রভৃতি দেশ এ বিষয়ে ভাগ্যবান। কিন্তু ভারতের জলবায়ু মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার দিক দিয়া ততটা সুখকর না হইলেও প্রবল প্রতিবন্ধক একথাও বলা চলে না।

(৬) **ভূত্বক ও মৃত্তিকা (Earth's Crust and Soil) :**—ভূত্বকের গঠনের উপর খনিজ সম্পদের অবস্থান নির্ভর করে। প্রতিকূল পরিবেশ থাকিলেও মানুষ খনিজ সম্পদের আহরণের জন্য আকৃষ্ট হয়। ঐ সমস্ত অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি খনিজ সম্পদের আহরণের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে। এই ভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ভারতের দাক্ষিণাত্যের মালভূমি প্রভৃতি অঞ্চল উন্নত হইতে পারিয়াছে। **মৃত্তিকা** বিভিন্ন প্রকার কৃষিজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন স্থির করে। উর্বর মৃত্তিকা শস্য উপাদনের পক্ষে বেশী উপযোগী। ভারতের নদী অববাহিকা অঞ্চলের মৃত্তিকা যতটা উর্বর, মালভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা ততটা উর্বর নহে। কোন কোন স্থানের মৃত্তিকা মৃৎ শিল্পের পক্ষেও উপযোগী। যেমন,—কৃষ্ণনগরের।

(৭) **উদ্ভিদ (Vegetation) :** বনভূমিতে কাষ্ঠ আহরণ ও তৃণভূমিতে পশু-

পালন উদ্ভিদ সংস্থানের ফলেই সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং উদ্ভিদও মানুষের অর্থ-নৈতিক উন্নতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। পশুপালন ও কাষ্ঠ আহরণের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতের তৃণভূমির প্রাচুর্য্য না থাকিলেও বনভূমি কম নয়। আসামে, হিমালয় অঞ্চলে, দাক্ষিণাত্যে কাষ্ঠ আহরণ কার্য্যে অনেক লোক ব্যাপৃত।

(৮) **জীবজন্তু (Animals) :** জীবজন্তুও প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয়, পরিধেয় প্রভৃতি যোগান দিয়া মানুষের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, চামড়া, রেশম প্রভৃতি জীবজন্তু হইতেই পাওয়া যায়। সুতরাং ইহার প্রতিপালন ও সংগ্রহ দ্বারাও বহুলোক জীবিকা নির্বাহ করে। অনেক জীবজন্তু ভূ-প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটাইয়া মানুষের উপকার সাধন করে। যেমন, কেঁচো (Earth-worm) জমির উর্ব্বরতা রক্ষা করিয়া এবং উত্তর আমেরিকার বিভার (Beaver) মাটির বাঁধ নির্মাণ করিয়া অনেক উপকার সাধন করে। ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও জীবজন্তুর প্রভাব যথেষ্ট দেখা যায়। জাপানের মৎস্য শিকার উহার উপজীবিকার একটি প্রধান অঙ্গ।



মানুষ ও তাহার পরিবেশ

সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের উপর বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া অপ্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবও কম নহে।

মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা ও জীবনযাত্রা প্রণালী উভয় প্রকার পরিবেশের দ্বারা প্রভাবান্বিত। মানুষ চিরদিনই প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। এই সংগ্রাম অনেক ক্ষেত্রে সাফল্যলাভও করিয়াছে। কিন্তু মানুষ একেবারে 'পরিবেশের প্রভাবমুক্ত হইতে পারে নাই। পরিবেশের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া বা উহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া মানুষ জীবনযাপন করিয়া আসিতেছে। যে সমস্ত পরিবেশ মানুষের উপব প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে তাহা পঞ্চম পৃষ্ঠায় চিত্রাকারে দেখান হইল।

Q. ২. "Man is influenced by his environment, but not controlled by it." Explain the statement

("মানুষ তাহার পরিবেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, কিন্তু উহা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না"—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর)।

Ans. নানাপ্রকার প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা ও জীবনযাত্রার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এজন্য মানুষ কোথায়ও কৃষিজীবী, কোথায়ও পশুপালক, কোথায়ও শিকারী আবার কোথায়ও বা যাযাবর। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতিও এইভাবে পরিবেশের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। ভারতে অনেক নদ-নদী বর্তমান। উহাব অববাহিকা অঞ্চলগুলি উর্বর ও কৃষিকার্যেব উপযুক্ত। এজন্য ভাবতের অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিজীবী। জাপানে লোকবসতির তুলনায় কৃষিকার্যের উপযুক্ত জমির পরিমাণ কম। এজন্য ঐ দেশের অধিবাসী শিল্পে ও মৎস্য শিকারে বেশী লিপ্ত। গ্রীণল্যাণ্ড অত্যন্ত শীতপ্রধান স্থান। সেখানে কৃষিকার্য বা শিল্পসাধনা সম্ভব নয়। এজন্য পশুশিকার ও পশুপালনই ঐ দেশের লোকের প্রধান উপজীবিকা। পরিবেশেব বিভিন্নতাব দরুণঃ উহাদের এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিভিন্ন পরিবেশ এইভাবে মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। কিন্তু সভ্য মানুষ কোন দিনই নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া নাই এবং কখনই পরিবেশের দাসত্ব স্বীকার করিতে অভ্যস্ত নহে। প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সে সর্বযুগেই সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে। এই সংগ্রামের জন্যই মানুষ অনেকক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাবমুক্ত হইতে না পারিলেও উহার দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। এই সংগ্রাম দ্বারা মানুষও পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এইভাবে মানুষ ও পরিবেশ এ উভয়ের সংঘাতের ফলে প্রতিকূল পরিবেশ অনুকূল পরিবেশে পরিণত হইতেছে। এ প্রসঙ্গে দুই একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। সুয়েজ খাল কাটার পূর্বে সুয়েজ যোজক প্রাকৃতিক পরিবেশ হিসাবে জলপথে সরাসরি ইউরোপ হইতে এশিয়া বা অষ্ট্রেলিয়া

আসার প্রবল অন্তরায় ছিল। মানুষ যতদিন এই প্রতিকূল পরিবেশের অধীন বা প্রভাবাধীন ছিল ততদিন তাহাকে আফ্রিকা ঘুরিয়া এশিয়া বা অষ্ট্রেলিয়া আসিতে হইত। ইহাতে সময় ও ব্যয় উভয়ই বেশী লাগিত। অনুরূপে পানামা খাল কাটার পূর্বে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে জলপথে যোগাযোগ রক্ষিত হইত দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরিয়া। কিন্তু মানুষের চেষ্টায় সুয়েজ ও পানামা খাল কাটার পর প্রতিকূল পরিবেশ অনুকূল পরিবেশে পরিণত হইয়াছে। এই ভাবে খাল কাটিয়া, পথ নির্মাণ করিয়া, রেল বসাইয়া, পর্বতের মধ্যদিয়া সুড়ঙ্গ কাটিয়া, নগর ও শহর পত্তন করিয়া নানাভাবে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছে এবং নূতন পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছে। জামসেদপুর, রুরকেলা, ভিলাই বা দুর্গাপুরের মত অরণ্যবহুল স্থান মানুষের চেষ্টাতেই শিল্পাঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। অনেকক্ষেত্রে জলসেচনের সাহায্যে শুষ্ক-মরুময় স্থান শস্যশামল হইয়া উঠিয়াছে। ভূগর্ভ হইতে খনিজ দ্রব্য আহরণ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, বহুমুখী নদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতি মানুষের চেষ্টাতেই সফল হইতেছে। এইভাবে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এ সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা মানুষ যে পরিবেশের হাতে ক্রীড়নক নহে তাহারই পরিচয়। সে এইভাবে পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অস্বীকার করিয়া আসিতেছে। তাহার শক্তি ও বুদ্ধিবলে পরিবেশকে সে সুখ-সুবিধার জন্য সাধ্যমত পরিবর্তন করিয়া লইতেছে, কিন্তু মানুষ পরিবেশের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই। এখনও নদী নদীই রহিয়া গিয়াছে। পর্বত পর্বতই রহিয়া গিয়াছে। শুধু উহাদিগকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। পর্বতের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা এখন আর বাধা নহে। আদিম কাল হইতে মানুষের এ অব্যাহত চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। পরিবেশ যদি মানুষকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ (control) করিতে পারিত তবে গুহামানব গুহামানবই থাকিয়া যাইত। সুদৃশ্য ও আরামপ্রদ অট্টালিকায় আর তাহার বাস হইত না।

Q. 3. "The economic life of a country is greatly influenced by her geographical location." Explain with illustrations.

("কোনও দেশের ভৌগোলিক অবস্থান উহার অর্থনৈতিক জীবনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।" উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।)

Ans. কোনও দেশের অবস্থান নানা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া বিচার করা চলে। এই বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া আমরা বিভিন্ন দেশের অবস্থানকে বিভিন্ন নামে অভিহিত

করিয়া থাকি। এইভাবে দেশের অবস্থানকে কেন্দ্রীয় (**Central**), প্রান্তীয় (Marginal), মহাদেশীয় (Continental), দ্বৈপ (Insular), উপদ্বীপীয় (Peninsular), উপকূলীয় (Littoral), উচ্চঅক্ষাংশীয় (High Latitudinal), নিম্নঅক্ষাংশীয় (Low Latitudinal) প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতে পারি। এই বিভিন্নরূপ অবস্থান মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে বিভিন্নভাবে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। নিম্নে উহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল :

(১) কোন দেশের অবস্থান **কেন্দ্রীয়** হইলে ঐ দেশ অন্যান্য দেশ হইতে প্রায় সমদূরে অবস্থিত এরূপ বুঝাইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় উক্ত দেশ অন্য বিভিন্ন দেশের সহিত সহজে ও অল্পসময়ে যোগাযোগ রক্ষা করার সুযোগ-সুবিধা পায়। ইহার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং দেশেরও অর্থনৈতিক উন্নতি সংঘটিত হয়। ভারত ও গ্রেটব্রিটেনের কেন্দ্রীয় অবস্থানের সুযোগ-সুবিধা আছে।

(২) কোনও দেশের অবস্থান যখন পৃথিবীর কোনও একপ্রান্তে থাকে তখন উহাকে **প্রান্তীয়** অবস্থান বলে। এরূপ অবস্থান হইলে উক্ত দেশের পক্ষে বিভিন্ন দেশের সহিত সম-সুবিধাযুক্ত অবস্থায় যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এজন্য এরূপ দেশ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিশেষ বিশেষ দেশের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে বাধ্য হয়। নিউজিল্যাণ্ডের এরূপ প্রান্তীয় অবস্থানের জন্য উহা গ্রেট ব্রিটেনের সহিতই অধিকমাত্রায় ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

(৩) সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত হইলে তাহাকে **মহাদেশীয়** অবস্থান বলে। এরূপ অবস্থায় দেশের জলবায়ু সাধারণতঃ চরমভাবাপন্ন হয় জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যও বিঘ্নিত হয়। তিব্বত, আফগানিস্থান, বলিভিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশের অবস্থান এরূপ মহাদেশীয়।

(৪) দেশের চতুর্দিক সমুদ্রবেষ্টিত হইলে উহাকে **দ্বৈপ** অবস্থান বলা হয়। এরূপ অবস্থান বৈদেশিক আক্রমণের হাত হইতে দেশকে অনেকটা নিরাপত্তা আনিয়া দেয়, দেশের অধিবাসীদিগকে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করিবার সুযোগ দেয়, জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন করে, অধিবাসীদের সুদক্ষ নাবিক হইবার সুযোগ দেয় এবং সমুদ্রপথে অনায়াসে বিভিন্ন দেশের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবার সুযোগ ঘটাইয়া শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। জাপান ও ইংলণ্ড এরূপ দ্বৈপ অবস্থানের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেছে।

(৫) কোন দেশের তিনদিক সমুদ্রবেষ্টিত থাকিলে উহাকে **উপদ্বীপীয়** অবস্থান বলে। এরূপ দেশ বিভিন্ন দেশের সহিত জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা পাইয়া থাকে। ভারত ও ইটালীর অবস্থান উপদ্বীপীয়।

(৬) কোন দেশ বিষুবরেখা হইতে দূরে অবস্থিত হইলে তাহাকে **উচ্চ অক্ষাংশীয়** এবং বিষুবরেখার নিকটে অবস্থিত হইলে **নিম্ন অক্ষাংশীয়** বলা হয়। মোটের উপর বিষুবরেখা হইতে দূরত্বের উপর জলবায়ু ও উদ্ভিদ সংস্থানের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। বিষুবরেখার নিকটবর্তী অঞ্চল উষ্ণ ও নিবিড় বনে আচ্ছন্ন। এজন্য এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি বেশী সম্ভব নয়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন। উহা ঘন বনে সমাচ্ছন্ন নহে। এরূপ অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নতির নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা আছে। পক্ষান্তরে উচ্চ অক্ষাংশে অবস্থিত মেরু-অঞ্চল সর্বদাই বরফাচ্ছন্ন থাকে। ইহা অত্যন্ত শীতপ্রধান অঞ্চল। এখানে উদ্ভিদ সংস্থান সামান্য। এরূপ অবস্থান অর্থনৈতিক উন্নতির সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে।

(৭) কোন দেশের অবস্থান সমুদ্র-উপকূলবর্তী হইলে তাহাকে **উপকূলীয়** বলা হয়। এরূপ অবস্থান জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা ঘটাইয়া থাকে। নরওয়ে, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশের অবস্থান উপকূলীয়। আবার যে সমস্ত বন্দর এইভাবে আন্তর্জাতিক জলপথের উপর অবস্থিত তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি লাভ করার সুযোগ-সুবিধা বেশী। এজন্যই সিঙ্গাপুর, বোম্বাই, নিউইয়র্ক, হংকং প্রভৃতি বন্দর বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে।

(৮) কোনও দেশ অন্য দেশ হইতে উচ্চপর্বত, সমুদ্র কিংবা মরুভূমি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থিত হইলে উহা বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে অনেকটা নিরাপদ থাকিতে পারে। কিন্তু অপ্রাকৃতিক সীমারেখা এরূপ সুবিধা দিতে পারে না। ভারত সুউচ্চ হিমালয় দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকায় উহার উত্তরের দেশগুলির আক্রমণ হইতে অনেকটা নিরাপদ আছে।

(৯) কোনও দেশ অন্য কোন উন্নত দেশের সান্নিধ্যে অবস্থিত হইলেও উন্নত দেশের দেখাদেখি নিজেও উন্নত হইতে চেষ্টা করিতে পারে।

সুতরাং কোনও দেশের অবস্থানও উহার অর্থনৈতিক জীবনের উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। যে সমস্ত দেশ অবস্থানজনিত একাধিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত সে সমস্ত দেশই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলণ্ড ও জাপানের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

চলাচল ব্যবস্থা ও বিজ্ঞানের উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও অনেক দেশ অবস্থানের প্রভাবমুক্ত হইতে পারে নাই।

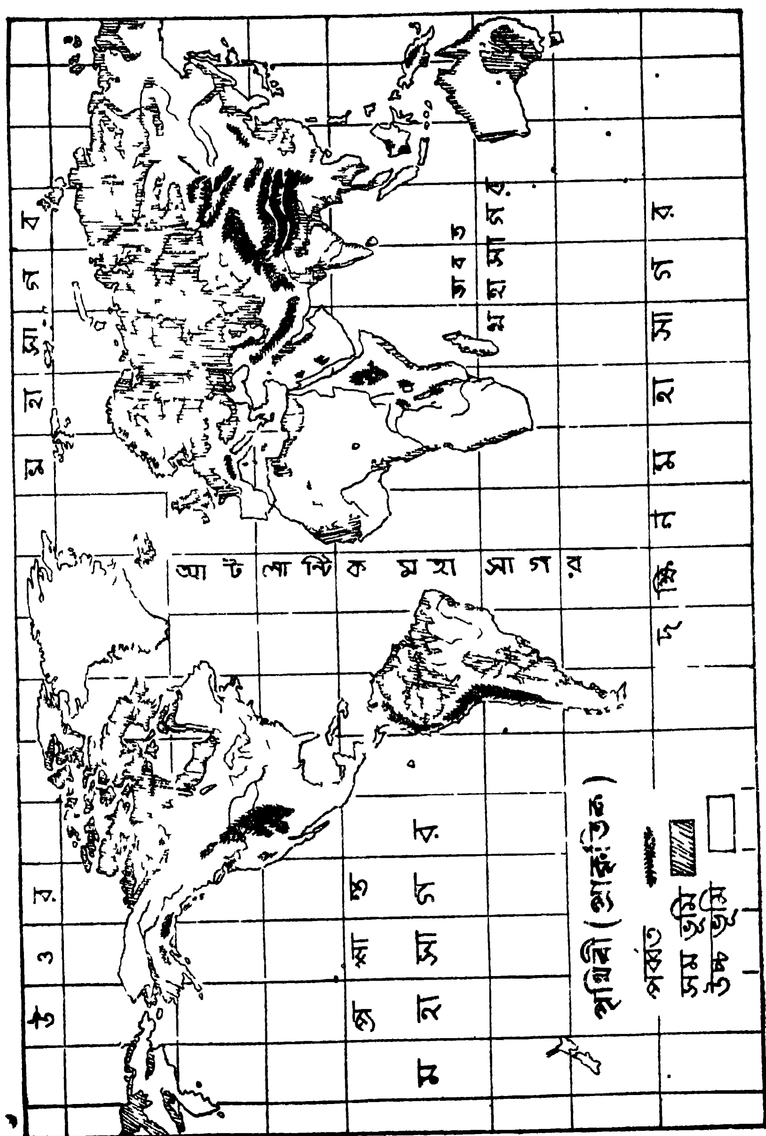
(বিভিন্ন দেশের অবস্থান Q. 4 এর মানচিত্রে দ্রষ্টব্য)

Q. 4. How do physical features affect the economic and commercial development of a country ?

(ভু-প্রকৃতি কিভাবে দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নতিতে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে ?)

Ans. কোনও দেশের ভূপ্রকৃতি পর্বত, মালভূমি বা সমভূমি সমন্বিত হইতে পারে। এই বিভিন্ন প্রকার ভূপ্রকৃতি মানুষের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নতিতে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। নিম্নে উহার বিশদ আলোচনা করা হইল :

(১) ভূ-প্রকৃতি পার্বত্য হইলে উহা জীবনযাত্রার পক্ষে কতকগুলি সুবিধা ও অসুবিধার সৃষ্টি করে। পার্বত্য অঞ্চল অনুর্বর ও কৃষিকার্য্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল নহে। এতদ্ অঞ্চলে রেলপথ রাস্তা প্রভৃতি নির্মাণ করা খুবই কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য। পার্বত্য নদীগুলিও খরস্রোতা এবং এজন্য নাব্য নহে। সুতরাং **যাতায়াত ব্যবস্থা** এখানে অনুন্নত। এরূপ নানাবিধ অসুবিধা থাকায় এখানে **লোকবসতি কম।** অধিবাসীরা দরিদ্র ও অনুন্নত এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আটিয়া উঠিতে পারে না। বিরল বসতি, শ্রমিকের অভাব, যানবাহনের অসুবিধা ও উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্বল্পতার জন্য এখানে শিল্প ও বাণিজ্য প্রসার লাভ করিতে পারে না। কিন্তু পর্বত মানব সভ্যতায় একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে নাই। ইহা মানুষকে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধাও দিয়া আসিতেছে। তবে ঐ সমস্ত সুযোগ-সুবিধার ফল সমভূমির অধিবাসীরাই অধিক মাত্রায় ভোগ করিয়া আসিতেছে। পার্বত্য অঞ্চল **অরণ্য** সম্পদে সমৃদ্ধ। এখান হইতেই পার্শ্ববর্তী সমভূমি অঞ্চলের অধিবাসিগণ কাষ্ঠ ও অন্যান্য বনজাত দ্রব্য আহরণের সুযোগ পায়। বনভূমি **পশু শিকারের** ও পর্বতের সানুদেশের তৃণভূমি **পশুপালনেরও** উপযোগী। ইহা খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ। খরস্রোতা নদীগুলি হইতে **জলবিদ্যুৎ** উৎপাদন করা চলে। পর্বত হইতে উৎপন্ন নদীগুলি সমভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভূমির **উর্বরতা** বৃদ্ধি করে। ইহা জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুকে প্রতিহত করিয়া **বৃষ্টিপাত** ঘটায় এবং উহা হিমালয়ের মত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত হইলে উত্তরের অত্যধিক **শীতলবায়ুকে** বাধা দেয়। উচ্চ পর্বত বহিরাক্রমণ হইতেও **দেশকে রক্ষা** করে। পার্বত্য অঞ্চলই বেশী **স্বাস্থ্যপ্রদ।**


আটলান্টিক মহাসাগর
ভারত মহাসাগর
প্রশান্ত মহাসাগর

এজন্য অধিকাংশ স্বাস্থ্যনিবাস পার্বত্য অঞ্চলেই দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ অঞ্চলের অধিবাসীরাও স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ ও দুর্দ্ধর্ষ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পর্বত নানাভাবে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

(২) **মালভূমিও** মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। তবে প্রত্যেক মালভূমির প্রকৃতি একরূপ নহে। প্রকৃতির বিভিন্নতার দরুণ কর্মপ্রচেষ্টাও বিভিন্নরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ মালভূমির মৃত্তিকা সমভূমি অপেক্ষা **অনুর্বর**। এজন্য **কৃষিকার্য** আশানুরূপ প্রসার লাভ করিতে পারে না। অনেক মালভূমি তৃণাচ্ছাদিত। সেখানে **পশুচারণ** হইয়া থাকে। বহুক্ষেত্রে মালভূমি **খনিজ** সম্পদে সমৃদ্ধ। কাবণ পার্বত্যভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মালভূমির সৃষ্টি হয়। এই ক্ষয়ের ফলে অভ্যন্তর ভাগের নানাবিধ খনিজ সম্পদ আহবণেব উপযুক্ত অবস্থায় আসিয়া পৌছায়। তবে এখানে **পরিবহন** ব্যবস্থাব অসুবিধা আছে। পার্বত্য অঞ্চল অপেক্ষা এখানে লোকবসতি কিছু বেশী হইলেও মোটের উপর বিরল। কেবলমাত্র খনিজ অঞ্চলে লোকবসতি অপেক্ষাকৃত বেশী। উচ্চতার জন্য মালভূমির জলবায়ু অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর। বৃহৎ মালভূমিব মধ্যে তিব্বত ও বলিভিয়ার মালভূমির নাম উল্লেখযোগ্য

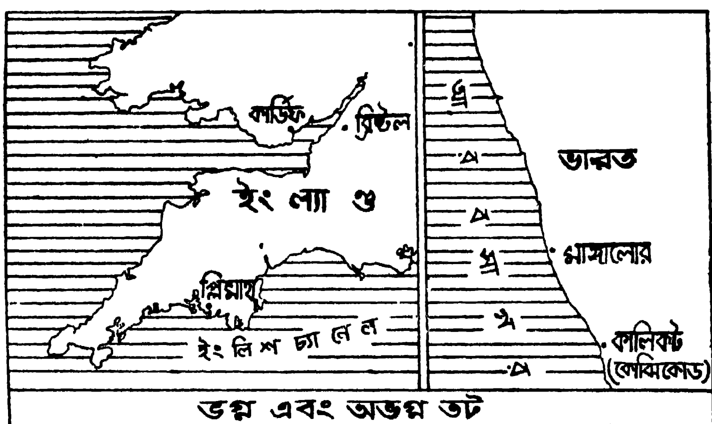
(৩) **সমভূমিই** মানুষের কর্মপ্রচেষ্টায সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা দিয়া থাকে। সমভূমি জলাভূমি, মরুভূমি, অরণ্যাচ্ছিত বা অস্বাস্থ্যকর না হইলে **কৃষিকার্যের** পক্ষে সর্বাধিক উপযুক্ত। নদীমাতৃক সমভূমি হইলে ভূমি উর্বরতার দিক দিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ হয়। বৃষ্টিপাত স্বল্প হইলে নদীর জল লইয়া মাঠে **জলসেচ** করা চলে। সর্বপ্রকার পরিবহন ব্যবস্থাও এখানে উন্নতি লাভ করিতে পারে। পৃথিবীর শতকরা ৮৫ভাগ রেলপথ সমভূমিতে অবস্থিত। নদী স্বাভাবিক পবিবহনের কাজ করে। প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধা জীবনযাত্রার অনুকূল বলিয়া এখানে লোকবসতিও ঘন। সমভূমির পরিমাণ পৃথিবীর অর্ধেক হইলেও এখানে মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৯০ভাগ বসবাস করিয়া থাকে। কৃষিজাতদ্রব্যের প্রচুর উৎপাদন, প্রচুর শ্রমিক, যানবাহনের সুবিধা, অধিবাসীদের চাহিদা, বিক্রয়কেন্দ্রের সান্নিধ্য প্রভৃতির জন্য সমভূমিতে **শ্রমশিল্পও** যথেষ্ট প্রসার লাভ করিতে পারে। প্রাচীন চৈনিক, ভারতীয়, ব্যবিলনীয় ও মিশরীয় সভ্যতা নদীমাতৃক সমভূমিতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। এগার পৃষ্ঠায় মানচিত্র হইতে বিভিন্ন দেশের ভূপ্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যাইবে।

Q. 5. "Nature of coast-line of a country affects its commercial and industrial development to a great extent." Discuss the statement with at least two examples. (C. U. Inter 1960)

("কোনও দেশের তটরেখার প্রকৃতি উহার বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।" অন্ততঃ দুইটি উদাহরণ-সহ উক্ত বিবৃতি আলোচনা কর।)

Ans. কোনও দেশের তটরেখা (Coast-line) উক্ত দেশের অধিবাসীদের বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতিতে (Commercial and industrial development) যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। তটরেখা বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে, যেমন, ভগ্ন, অভগ্ন, উচ্চ, নিম্ন ইত্যাদি। তটরেখা ভগ্ন ও নিম্ন হইলে উহা বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি, তথা অর্থনৈতিক উন্নতির পরম সহায়ক হয়। তটরেখা ভগ্ন হইলে সমুদ্র দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। এরূপ অভ্যন্তরভাগে সমুদ্রের প্রচণ্ড ঢেউ প্রবেশ করিতে পারে না। ফলে জাহাজ নিরাপদে অবস্থান করিতে পারে এবং ঝড়ের প্রকোপ হইতেও রক্ষা পায়। যেখানে জাহাজ নিরাপদে অবস্থান করিতে পারে তথায় অনায়াসেই পোতাশ্রয় গঠিত হইতে পারে। পোতাশ্রয় গঠনের সুবিধা থাকিলে এবং জলপথে পণ্য আমদানি-রপ্তানি সুযোগ সুবিধা থাকিলে সেখানে বন্দর গড়িয়া উঠিতে পারে। সুতরাং ভগ্ন তটরেখা পোতাশ্রয় ও বন্দর গঠনের সুযোগ সুবিধা দিয়া থাকে। সাধারণতঃ জলপথে যাতায়াত বা মাল চলাচল ব্যয় স্থলপথের ব্যয় অপেক্ষা কম। সুতরাং বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সংখ্যা প্রয়োজনমত বৃদ্ধি পাইলে স্বল্প ব্যয়ে দেশ-বিদেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয়। এই ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে রপ্তানি-যোগ্য শিল্পজাত ও অন্যান্য পণ্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইভাবে ভগ্ন উপকূল শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া সমুদ্রের সংস্পর্শে আসিয়া অধিবাসিগণ সমুদ্রভয়রহিত হয় এবং উদ্যমশীল ও সাহসী হওয়ার সুযোগ-সুবিধা পায়। নিকটে মৎস্যচারণ ক্ষেত্র থাকিলে মৎস্য শিল্পও দ্রুত প্রসার লাভ করিতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গ্রেট্ ব্রিটেন ও হল্যাণ্ডের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের তটরেখা ভগ্ন ও নিম্ন। এজন্য অনেক সুন্দর সুন্দর বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে। দেশের অভ্যন্তরভাগও সমুদ্র হইতে বেশী দূরে নয়। ফলে স্বল্পব্যয়ে দেশ-বিদেশের পণ্য আদান-প্রদান করিয়া যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে।

সমুদ্রপথে দুঃসাহসিক অভিযানের মধ্য দিয়া ঐ দেশের অধিবাসিগণ বিভিন্নদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারিয়াছে। ইহার ফলে এককালে হল্যাণ্ডের বৈদেশিক অধিকৃত অঞ্চলের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল উক্ত দেশের ৬০গুণ। ব্রিটেনের অধিকারও এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে ব্রিটিশের সূর্য্য কখনও অস্তমিত হয় না—এরূপ প্রবাদও আছে। উপকূল-রেখা শুধু ভগ্ন হইলেই যে সে দেশের অধিবাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্যে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে খ্যাতিলাভ করিবে একথা বলা চলে না। কারণ অধিবাসীরা ভগ্ন উপকূল রেখার সুযোগ নাও গ্রহণ করিতে পারে। গ্রীসের উপকূল রেখা ভগ্ন। কিন্তু গ্রেটব্রিটেন ও হল্যাণ্ডের মত উহা অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইহা ছাড়া ভগ্ন তটরেখার সহিত অভ্যন্তরে যাতায়াত সুবিধা এবং আমদানি-রপ্তানি যোগ্য পণ্যের প্রাচুর্য্য থাকা আবশ্যক। নরওয়ের উপকূল রেখা ভগ্ন। কিন্তু সমুদ্রের তীরেই উচ্চ পর্বত থাকায় দেশের অভ্যন্তরে যাতায়াত বিঘ্নিত হয়।



ভগ্ন এবং অভগ্ন তট

উপকূল রেখা অভগ্ন হইলে ঢেউয়ের প্রচণ্ডতার জন্য জাহাজ তটরেখায় নিরাপদে ভিড়িতে পারে না। সেজন্য কৃত্রিম পোতাশ্রয় ভিন্ন বন্দর গড়িয়া উঠিতে পারে না। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। ভারত ও আফ্রিকা এরূপ অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে। এজন্য ভারতের ৩,০০০ মাইল দীর্ঘ তটরেখার মধ্যে বোম্বাই, কোচিন, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তন প্রভৃতি ছাড়া বড় বন্দর গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। কেবলমাত্র কচ্ছ, কাম্বে ও মান্নার উপসাগরের তটভাগ কিছুটা ভগ্ন। ঐ স্থানগুলি মৎস্যশিকারের জন্য উল্লেখযোগ্য। বদ্বীপ অঞ্চলগুলি কিছুটা

ভগ্ন হইলেও উহারা অগভীর, কর্দমাক্ত ও নৌ-চলাচলের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। মানুষের চেষ্টায় ব্যবসা-বাণিজ্যের তাগিদে অনেকস্থলে কৃত্রিম পোতাশ্রয় গঠন করিয়া বন্দর সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণের তুলনায় পোতাশ্রয় রক্ষার ব্যয় অত্যধিক হইয়া পড়ে। সুতরাং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য মানুষ এখনও তটরেখার প্রভাব মুক্ত হইতে পারে নাই। তাই বলা যাইতে পারে যে তটরেখা শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

Q. 6. "Climate has a great influence on the economic activities of man." Explain the statement with at least two suitable examples from Indian conditions, (Burdwan Entrance 1961).

("মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের উপর জলবায়ুর যথেষ্ট প্রভাব আছে।" ভারতীয় অবস্থা হইতে অন্ততঃ দুইটি 'উপযুক্ত উদাহরণ দিয়া বিবৃতিটি ব্যাখ্যা কর।)

Or,

Describes with suitable examples from India, the influence of climate on man's economic life. (H. S. 1962)

(মানুষের অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপের উপর জলবায়ুর যে প্রভাব ভারত হইতে উদাহরণ সহ তাহার বর্ণনা দাও।)

Ans. মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ ও জীবনযাত্রার উপর জলবায়ু নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। মানুষের খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, কর্মক্ষমতা ও কর্মকুশলতা সব কিছুই জলবায়ুর প্রভাবাধীন। জলবায়ু কিভাবে মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেওয়া হইল :

(১) মানুষের খাদ্য, পরিধেয় ও বাসস্থানের উপকরণ অধিকাংশই কৃষিজাত, বনজাত ও পশুজাত দ্রব্য হইতে আসিয়া থাকে। কিন্তু উহাদের উৎপাদন জলবায়ুর প্রভাবাধীন। কৃষিকার্যের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। জলবায়ুর এরূপ অবস্থা না থাকিলে **কৃষিকার্য্য** প্রসারলাভ করিতে পারে না। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বা আসামে উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর জন্য কৃষিকার্য যেরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে, রাজস্থানের উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ুতে সেরূপ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে **অরণ্য সংস্থান ও তৃণভূমির** প্রাচুর্য জলবায়ুর বিভিন্নতার জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়। **পশুচারণ** তৃণভূমিতেই বেশী প্রসার লাভ করিয়া থাকে। এজন্য দক্ষিণ আফ্রিকার 'ভেল্ড', অষ্ট্রেলিয়ার 'ডাউন্স', এশিয়ায় ও ইউরোপের 'ষ্টেপস', উত্তর আমেরিকার 'প্রেইরি' এবং দক্ষিণ

আমেরিকার 'পাম্পাস প্রভৃতি তৃণভূমিগুলি অনুকূল মহাদেশীয় জলবায়ুর প্রভাবেই সৃষ্টি হইয়াছে এবং তজ্জন্য এ সমস্ত অঞ্চলে পশুচারণ প্রসার লাভ করিয়াছে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের নিবিড় বনভূমি উষ্ণ ও প্রচুর বৃষ্টিপাতযুক্ত জলবায়ুর জন্যই সম্ভব হইয়াছে। মরুভূমির গুল্ম ও কাঁটা গাছ শুষ্ক জলবায়ুরই প্রতীক। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এবং উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনস্থলে যে **মৎস্যচারণ** ক্ষেত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহাতে জলবায়ুর প্রভাব বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্তিকা যাহার উপর কৃষিকার্য নির্ভরশীল তাহাতেও জলবায়ুর প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) মানুষের **কর্মক্ষমতা** ও **কর্মকুশলতা** জলবায়ুর উপর অনেকটা নির্ভর করে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের জলবায়ু উহার অধিবাসীদের কর্মদক্ষতা ও কর্মকুশলতা বৃদ্ধির পক্ষে যতটা সহায়ক উষ্ণমণ্ডলের জলবায়ু সেরূপ নহে।

(৩) মানুষের **বাসস্থান** ও **উপনিবেশ** বিস্তারের উপরও জলবায়ুর প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। উষ্ণ ও হিম মরু অঞ্চলে এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলের অনেকস্থলে লোকবসতি বিরল। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই লোকবসতি ঘন। অনুকূল জলবায়ু ভিন্ন এক দেশের লোক ভিন্ন দেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপনে পরাঙ্মুখ হয়। দক্ষিণ-পূর্ব অষ্ট্রেলিয়ার নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু ইউরোপীয়দের উপনিবেশ স্থাপনে যে ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে, অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরের উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু সেরূপ আকর্ষণ করিতে পারে নাই

(৪) **যন্ত্রশিল্পের** উপরও জলবায়ুর প্রভাব ব্যাপক উহার উপর জলবায়ুর প্রভাব দ্বিবিধ—**প্রত্যক্ষ** ও **পরোক্ষ**। প্রথমতঃ নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুই শিল্প-প্রচেষ্টার আদর্শস্থল। ইহা ছাড়া জলবায়ু প্রত্যক্ষ ভাবে বিভিন্নপ্রকার শিল্পের **একদেশতা** (Localisation) নির্ণয় করে। এজন্য কার্পাস শিল্পের উপযোগী আর্দ্র জলবায়ুর (শুষ্ক জলবায়ুতে কার্পাস তন্তু ছিঁড়িয়া যায়) জন্য বোম্বাই আমেদাবাদ, ওসাকা, ম্যানচেষ্টার প্রভৃতি কার্পাস শিল্পের জন্য, ময়দা শিল্পের উপযোগী শুষ্ক জলবায়ুর জন্য (আর্দ্র জলবায়ুতে গম পচিয়া যায়) করাচী, কানপুর, মিনিয়াপলিস, বুদাপেষ্ট প্রভৃতি ময়দা শিল্পের জন্য, চলচ্চিত্র শিল্পের উপযোগী সূর্য-কিরণোজ্জ্বল জলবায়ুর জন্য কালিফোর্নিয়া, ইতালি, দক্ষিণ ফ্রান্স প্রভৃতি চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

যন্ত্রশিল্পের উপর **পরোক্ষ** প্রভাবও কম নয়। প্রথমতঃ জলবায়ু (ক) **চাহিদা** নিয়ন্ত্রণ করে। শীতপ্রধান ইংলণ্ডে বা কাশ্মীরে গরম বস্ত্রের চাহিদার জন্য পশমশিল্প ও গ্রীষ্মপ্রধান বাংলাদেশে সূতী বস্ত্রের চাহিদার জন্য কার্পাস শিল্পের পত্তন এজন্য বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

(খ) জলবায়ু শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তনও পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। শীতপ্রধান ও পর্বতসঙ্কুল দেশে বাহিরে চলাফেরা বা যানবাহনের অসুবিধার জন্য কাঁচামাল ও বৃহৎ দ্রব্যাদি আমদানি-রপ্তানির পক্ষে সুবিধাজনক নহে। এজন্য সুইজারল্যাণ্ড বা কাশ্মীরের মত স্থানে কুটির শিল্পই সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছে।

(গ) জলবায়ু কাঁচা মালের উৎপাদনও নিয়ন্ত্রণ করিয়া পরোক্ষভাবে শিল্প স্থাপনে সহায়তা করে। পশ্চিমবঙ্গের পাট শিল্প, বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্প, উত্তরপ্রদেশের ইক্ষুশিল্প প্রভৃতির অবস্থান কাঁচামালের প্রাচুর্যের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

(ঘ) শ্রমিকের কর্মনৈপুণ্যের জন্যও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। অথচ উহার সরবরাহ ও কর্মনৈপুণ্য জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল।

(ঙ) পরিবহন ব্যবস্থাও জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। যেমন তুষার-শীতল অঞ্চলে বা মরুভূমি অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা না থাকিলে পণ্য আদান-প্রদান ভালভাবে চলিতে পারে না। এজন্য জলপথে ও রেলপথে যেখানে যাতায়াত সুবিধা সেখানেই সাধারণতঃ বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠে। পক্ষান্তরে জলবায়ুই জলপথে ও রেলপথে যাতায়াত অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে।

বর্তমান কালে বিজ্ঞানের প্রভাবে অনেকস্থলে শিল্পস্থাপনে বা অন্য কাজকারবারে মানুষ জলবায়ুকে অনেকক্ষেত্রে আয়ত্তে আনিয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারে নাই।

Q. 7. Write a short essay on the effect of climate, both direct and indirect, on the industries of a country. Illustrate your answer with some conspicuous examples.

(C. U. Inter. 1949, 1952 ; G. U. Inter. 1949, 1952)

দেশের শিল্পের উপর জলবায়ুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব সম্বন্ধে উদাহরণ সহ একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ।)

Or

Write an essay on the effect of climate on the manufacturing industries. (C. U. Inter. 1927, 1929, 1933, 1937, 1942, 1946 ;

G. U. Inter. 1953)

(সর্জন শিল্পের উপর জলবায়ুর প্রভাব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ।)

Ans. শিল্পের উপর জলবায়ুর প্রভাব অসামান্য। জলবায়ু দেশের শিল্পকে

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। শিল্পকারখানা গড়িয়া তুলিতে হইলে কাঁচমাল, যন্ত্রপাতি, শ্রমিক, যানবাহন, শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় বাজার প্রভৃতির প্রয়োজন। এই সমস্তগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে যেস্থানে যে ধরণের কাঁচামাল উৎপন্ন হয় সেই স্থানে সেই ধরণের কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল শিল্প গড়িয়া উঠাই স্বাভাবিক। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কাঁচামালের সান্নিধ্যহেতু অনেক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। একমাত্র খনিজ সম্পদ ছাড়া সমস্ত প্রকার কাঁচা-মালের উৎপাদন জলবায়ুর উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে। এরূপ অবস্থায় জলবায়ু প্রত্যক্ষভাবে কাঁচামালের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিয়া পরোক্ষভাবে শিল্প গড়িয়া উঠার উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, পূর্ববাংলার জলবায়ু পাট চাষের আদর্শস্থল। এই অনুকূল জলবায়ুতে প্রচুর পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কাঁচামাল পাটের উপর নিভর করিয়াই পশ্চিমবঙ্গে পাটশিল্প গড়িয়া উঠে। এরূপভাবে শিল্প গড়িয়া উঠা শিল্পের উপর জলবায়ুব পরোক্ষ প্রভাবই সূচিত হইতেছে। অনুরূপ-ভাবে তুলার প্রাচুর্যের জন্য বোম্বাই ও আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্প এবং ইক্ষুদণ্ডের প্রাচুর্যের জন্য উত্তরপ্রদেশের শর্করা শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আঙ্গুর উৎপাদনের জন্য মদ্য শিল্প, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্পাস উৎপাদন অঞ্চলের কার্পাস শিল্প, কানাডা, নরওয়ে ও ফিনল্যাণ্ডের সরলবর্গীয় বৃক্ষের জন্য কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজ শিল্প প্রভৃতি শিল্পের উপর জলবায়ুর পরোক্ষ প্রভাবের ফলেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

(২) পরিবহন ব্যবস্থার উপরও জলবায়ুর প্রভাব সুস্পষ্ট। অত্যধিক শীতপ্রধান স্থানে তুষারপাতের ফলে রেলপথে বা জলপথে যাতায়াত বিঘ্নিত হয়। উষ্ণ মরু অঞ্চলে বালিয়াড়ির আধিক্য হেতু রেলপথ নির্মাণ দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রতিকূল আবহাওয়ায় বিমান চলাচলও করা যায় না। সুতরাং জলবায়ু পরিবহন ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। চলাচল ব্যবস্থা ভাল না থাকিলে শিল্পোপযোগী কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, শ্রমিক প্রভৃতির আমদানি সুষ্ঠভাবে চলিতে পারে না। আবার শিল্পজাত দ্রব্যাদিও বিক্রয় কেন্দ্রে পাঠান সম্ভব হয় না। শিল্পস্থাপনের পক্ষে ভাল পরিবহন ব্যবস্থাও থাকা অত্যাবশ্যক। জলবায়ু এইভাবে পরিবহন ব্যবস্থার উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করিয়া পরোক্ষভাবে শিল্পস্থাপনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

(৩) শ্রমশক্তির নৈপুণ্য ও সরবরাহের উপরও শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন নির্ভর করে। কিন্তু ইহাদের নৈপুণ্য ও সরবরাহ জলবায়ুর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে

প্রভাবান্বিত। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশের নাতিশীতোষ্ণ স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া মানুষকে কর্মতৎপর, অধ্যবসায়ী ও সুনিপুণ করে। অনুকূল আবহাওয়ার জন্য লোকবসতিও ঘন হয়। ফলে শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত শ্রমিক সহজলভ্য হয়। পক্ষান্তরে মধ্য আফ্রিকার মত উষ্ণ জলবায়ু অনেকটা বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করে। সুতরাং জলবায়ু মানুষের কর্মশক্তির ও বাসস্থানের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করিয়া পরোক্ষভাবে শিল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

(৪) জলবায়ুর উপর মানুষের চাহিদাও নির্ভর করে। শীত প্রধান স্থানে গরম বস্ত্রের চাহিদা বেশী। এজন্য গ্রেটব্রিটেন পশম শিল্পে উন্নত। ভারতের মত উষ্ণ জলবায়ুতে সুতিবস্ত্রের চাহিদা বেশী। এজন্য কার্পাস শিল্প অধিক সংখ্যায় গড়িয়া উঠিয়াছে। কাশ্মীরের শীতল আবহাওয়ার জন্যও সেখানে পশমবস্ত্র শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং জলবায়ু প্রত্যক্ষভাবে মানুষের চাহিদা সৃষ্টি করিয়া পরোক্ষভাবে শিল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

(৫) জলবায়ু পরোক্ষভাবে শিল্পাগারের আয়তনও নিয়ন্ত্রণ করে। কাশ্মীর ও সুইজারল্যাণ্ডের মত পার্বত্য ও শীতপ্রধান স্থানে ভারী জিনিস আমদানি-রপ্তানি করা বা ঘরের বাহিরে কাজ করা খুবই কষ্টসাধ্য। এজন্য স্বল্পায়তনের কুটির শিল্পই অধিক সংখ্যায় গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৬) ইহা ছাড়া জলবায়ু প্রত্যক্ষ ভাবেও শিল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আর্দ্র জলবায়ু ভিন্ন কার্পাস শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে না। কারণ শুষ্ক আবহাওয়ায় কার্পাস সূতা ছিঁড়িয়া যায়। এজন্য আর্দ্র জলবায়ু ভাবাপন্ন বোম্বাই, আমেদাবাদ, ম্যানচেষ্টার, ওসাকা প্রভৃতি কার্পাস শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শুষ্ক আবহাওয়া ময়দা শিল্পের উপযোগী। কারণ জলীয় আবহাওয়ায় গম পচিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এজন্য শুষ্ক আবহাওয়া বিশিষ্ট করাচী, কানপুর, মিনিয়াপলিস, বুদাপেষ্ট প্রভৃতি ময়দা শিল্পের জন্য উল্লেখযোগ্য। আবার চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল জলবায়ু বিশেষ উপযোগী। এজন্য এরূপ আবহাওয়া বিশিষ্ট কালিফোর্ণিয়া (লস এঞ্জেল্স), দক্ষিণ-ফ্রান্স, ইতালী, বোম্বাই প্রভৃতি স্থান চলচ্চিত্র শিল্পে অগ্রণী। সুতরাং শিল্পের উপর জলবায়ুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব কোনটাই কম নয়।

বিজ্ঞানের যুগে মানুষের কর্মকুশলতার জন্য অনেক অসাধ্য সাধন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফলে কানপুরের মত শুষ্ক আবহাওয়াপূর্ণ স্থানেও কারখানার মধ্যে কৃত্রিম আর্দ্র আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া কার্পাস শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এইভাবে

মানুষ জলবায়ুর প্রতিক্রিয়াকে অনেকক্ষেত্রে নিজের বশে আনিতে পারিয়াছে, কিন্তু উহাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারে নাই।

Q. 8. Describe the role played by the river valleys in the economic development of a country. (C. U. Inter 1957)

(অর্থ নৈতিক উন্নতিতে নদী-উপত্যকার অবদান বর্ণনা কর।)

Or

Describe the role of rivers in the economic development of a country. (Pre-C. U. 1962)

(কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে নদীর ভূমিকা বর্ণনা কর।)

Ans. নদী-উপত্যকা মানুষের বসতিস্থাপনে এবং অর্থনৈতিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। অর্থনৈতিক জীবনে নদীর দান অপরিসীম। নদী নানাভাবে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে এবং জীবনধারণের পক্ষে পরম সহায়ক অবস্থার সৃষ্টি করিয়া উহার উপত্যকাবাসীদের উন্নতির পথ সুগম করে। নিম্নে উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল :

(১) নদীর উপত্যকা ও বদ্বীপ অঞ্চল নদী বাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। উক্ত পলিমাটি সমৃদ্ধ অঞ্চল খুব উর্বর। এজন্য এখানে কৃষিকার্য্যের সুযোগ সুবিধা সর্বাধিক এবং এ কারণে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ নদী-উপত্যকাতেই সর্বাধিক হইয়া আসিতেছে। শস্য উৎপাদনের বেশী সুযোগ সুবিধা থাকায় বেশী সংখ্যক লোক এখানে বসবাস করিতে আকৃষ্ট হয়। এজন্য নদী-উপত্যকা শস্য-শ্যামল ও ঘন বসতিপূর্ণ। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা তাই উর্বর, শস্যশ্যামল ও ঘন বসতিপূর্ণ।

(২) নদী লোকের পানীয় জলের একটি স্বাভাবিক উৎস। ইহা কৃষিকার্য্যের জন্য জলসেচনেরও সুযোগ—সুবিধা দিয়া থাকে। বৃষ্টি বিরল স্থানে এই ভাবে নদী অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছে। নীল নদ হইতে জল সেচ করিয়া মিশরের মত মরু অঞ্চলও শস্যশ্যামল হইয়াছে। পঞ্চনদ হইতে খাল কাটিয়া জলসেচন দ্বারা পাঞ্জাবও অনুরূপভাবে শস্য উৎপাদনে একটি উদ্বৃত্ত এলাকায় পরিণত হইয়াছে।

(৩) নদী উহার শাখা-প্রশাখা লইয়া দেশের অভ্যন্তরে সুন্দর জলপথ সৃষ্টি করে। এই জলপথের সাহায্যে বিভিন্ন অঞ্চলে পণ্য আদান-প্রদান হইয়া থাকে। নদী সমুদ্রগামী হইলে বিদেশের সহিতও পণ্য আমদানী-রপ্তানী করা চলে। নদীপথে যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা থাকায় নদী উপত্যকাতেই মানুষ শিল্পে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে

লিপ্ত থাকে এবং নানাবিধ উপায়ে অর্থোপার্জন করিয়া থাকে। স্থলপথে যাতায়াত অপেক্ষা নদীপথে পণ্য চলাচল ব্যয়ও কম। অতি প্রাচীনকালে নদীই বাণিজ্য বিস্তারের প্রধান অবলম্বন ছিল। নদীতীরে ও নদী মোহনায় সহজে নগর ও বন্দর গড়িয়া উঠিতে পারে। এভাবে গঙ্গা নদীর তীরে কলিকাতা, পাটনা, কানপুর, যমুনার তীরে দিল্লী, টেমসের তীরে লণ্ডন প্রভৃতি নগর ও বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিযাছে। প্রকৃত প্রস্তাবে নদী উপত্যকাই বন্দরের সমৃদ্ধশালী পশ্চাৎভূমি। এইভাবে নদী উপত্যকা কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে এবং মানুষ অনায়াসে জীবিকা অর্জন করিতে পারে। এজন্য এখানে মানুষের



নদী মাতৃক প্রাচীন সভ্যতা

অন্নের ভাবনা খুব কম থাকে। ফলে নদী-উপত্যকার অধিবাসিগণ নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-কলা প্রভৃতিতে মনোনিবেশ করিতে পারে। অতি প্রাচীন কালে যে সমস্ত স্থান সভ্যতার লীলাভূমি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল উহারা সমস্তই নদী-উপত্যকায় অবস্থিত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ মিশরীয় সভ্যতা নীলনদের উপত্যকায়, ব্যাবিলনের সভ্যতা টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায়, ভারতীয় সভ্যতা সিন্ধুনদের উপত্যকায় এবং চীনের সভ্যতা হোয়াংহো নদীর উপত্যকায় গড়িয়া উঠিয়াছিল—উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(৪) নদী অরণ্যাঞ্চল হইতে কাঠ বা বাঁশ ভাসাইয়া আনার ব্যাপারেও বিশেষ কার্য্যকরী। কাশ্মীরের ঝিলাম ও উত্তরপ্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলের নদী হিমালয় হইতে অনেক কাঠ ভাসাইয়া আনিতে সাহায্য করে। ব্রহ্মপুত্র নদী কাঠ ও বাঁশ চালানে উল্লেখযোগ্য। কানাডা, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের নদীগুলি অনেক নরম কাঠ শিল্পাঞ্চলে লইয়া যাইতে সাহায্য করে।

(৫) খরস্রোতা পার্বত্য নদী জলবিদ্যুৎ উৎপাদনেও বিশেষ কার্য্যকরী। দাক্ষিণাত্যের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি ঐরূপ খরস্রোতা নদীর উপর অবস্থিত। কানাডার নদীগুলিও এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৬) নদীর গতিপথের বিভিন্ন প্রবাহ অবশ্য মানুষের জীবনযাত্রার উপর বিভিন্ন ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। নদীর প্রবাহকে সাধারণতঃ তিন অংশে ভাগ করা হইয়া থাকে। (১) পার্বত্য প্রবাহ, (২) সমভূমি প্রবাহ ও (৩) বদ্বীপ প্রবাহ। পার্বত্য প্রবাহে নদী খরস্রোতা, কাঠ বা বাঁশ পরিবহনে ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশেষ সুবিধাজনক। এ অঞ্চলের উপত্যকা সঙ্কীর্ণ এবং এখানে কৃষিপোযোগী ভূমিভাগ কম। সমভূমি প্রবাহে নদীর গতিবেগ কম এবং এখানে নদী পলির দ্বারা সমভূমি বিস্তৃতিতে সাহায্য করিয়া থাকে। এ অঞ্চলে উপত্যকা বিস্তৃত এবং ভূমি-ভাগও খুব উর্বর। বদ্বীপ অঞ্চলেও ভূমিভাগ প্রশস্ত ও উর্বর।

(৭) নদী মৎস্যেরও আধার। এজন্য মৎস্য শিকারও নদী-উপত্যকাবাসীর একটি উল্লেখযোগ্য উপজীবিকা।

(৮) সহরের ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জল নদী হইতেই বেশী সরবরাহ হইয়া থাকে। কলিকাতা নগরীর প্রয়োজনীয় জলের অধিকাংশ গঙ্গা হইতে পাওয়া যায়। ইহার উপকণ্ঠের পাট শিল্প, কাগজ শিল্প প্রভৃতির প্রয়োজনীয় জলও গঙ্গা হইতে পাওয়া যায়; জামসেদপুরের লৌহ ও ইস্পাত কারখানার জল সুবর্ণরেখা হইতে সরবরাহ হয়।

(৯) বর্ত্তমানযুগে নদীর উপর বাঁধ দিয়া বা উহা হইতে খাল কাটিয়া বিভিন্ন বহুমুখী পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়ার পর বন্যা নিরোধ, জলসেচন, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, স্বাস্থ্যোন্নতি, অবসর বিনোদন, মৎস্যচাষ, বনভূমির আবাদ প্রভৃতির দ্বারা নানাবিধ সমাজকল্যাণ সাধিত হইতেছে।

সুতরাং নদী যে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করে ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু নদী যে মানুষের অশেষ অপকারও সাধন করিয়া থাকে—ইহা ভুলিলে চলিবে না। দেশ নদীহীন হইলে কিংবা দেশের নদী অনাব্য, খরস্রোতা বা স্বল্পতোয়া হইলে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ

করিতে হয়। ইহা ছাড়া নদীর বন্যা উপত্যকাবাসীদের অশেষ দুর্দশার কারণ হয়। বন্যার ফলে মানুষের ঘরবাড়ী, গরুবাছুর, অস্থাবর সম্পত্তি, শস্য প্রভৃতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এরূপ বন্যার ধ্বংসলীলার জন্য পশ্চিমবঙ্গের দামোদর, চীনের হোয়াংহো প্রভৃতি নদীকে দুঃখের নদী (river of sorrow) আখ্যা দেওয়া হয়। নদীর কূল ভাঙ্গা-গড়ার ও দিক পরিবর্তনের জন্যও মানুষকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয় এবং মানুষের অনেক কীর্ত্তি লোপ পায়। পদ্মার কবলে পূর্ববঙ্গের প্রাচীন কীর্ত্তি চলিয়া যাওয়ায় ইহার এক নাম কীর্ত্তিনাশা।

সুতরাং নদীর স্থিতিশীলতা, নাব্যতা ও জলসরবরাহের উপর উপত্যকাবাসীর উন্নতি-অবনতি অনেকাংশে নির্ভর করে।

Q. 9. Describe briefly the influence of physical features on the economic life of India.

(ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের উপর উহার ভূ-প্রকৃতির প্রভাব বর্ণনা কর।)

Or,

Discuss how the physical environment influences economic activities in a region of (a) mountains and (b) coastal plains. Give examples from the Indian Union, as far as possible.

(Pre-C. U. 1962)

(পর্বত ও উপকূলীয় সমভূমি—এই প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে যথাসম্ভব ভারত হইতে উদাহরণ দিয়া আলোচনা কর।)

Ans. ভূ-প্রকৃতি (physical features হিসাবে ভারতকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা হইয়া থাকে :

(১) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল,

(২) মধ্য ভাগের শতদ্রু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সমভূমি অঞ্চল,

(৩) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল,

(৪) উপকূলের সমভূমি অঞ্চল।

উপরিউক্ত বিভাগগুলি ভারতের অর্থ-নৈতিক জীবনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে নিম্নে উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল :

(১) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল : এই অঞ্চল ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে

উত্তর-পূর্ব দিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০০ মাইল। ইহা হিমালয় ও উহার শাখা-প্রশাখা লইয়া গঠিত। ইহা দুরতিক্রম্য সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী দ্বারা গঠিত। ইহার উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ এভারেষ্টের উচ্চতা ২৯১৪৯ ফুট। দুরতিক্রম্য ২।৪টা গিরিপথ ছাড়া পার্শ্ববর্তী দেশগুলির সহিত এ অঞ্চল দিয়া যাতায়াত করা যায় না। এই উচ্চ পর্বতশ্রেণী ভারতকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ইহা উত্তরের শীতলবায়ুকে বাধা দিয়া ভারতকে প্রবল শৈত্যের হাত হইতে রক্ষা করিতেছে এবং জলীয় বাষ্পকে বাধা দিয়া ভারতে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটাইতেছে। এখান হইতে উৎপন্ন গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদী মধ্যভাগের সমভূমি গঠনে সহায়তা করিতেছে এবং পার্বত্য অংশে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করার সুযোগ দিতেছে। এ অঞ্চল বনজ ও খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ। ইহা স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া সুবিদিত। পর্বতগাত্রে ধান, চা, কমলালেবু, আলু প্রভৃতিও জন্মিয়া থাকে। এখানকার অধিবাসীরা বলিষ্ঠ ও কর্মঠ। কিন্তু এ অঞ্চলে যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। এজন্য এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ ঠিকমত চলিতেছে না। গিরিপথ দিয়া তিব্বতের সহিত কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। লোকবসতি এ অঞ্চলে খুব কম। কাষ্ঠ আহরণ ও পশুপালনই অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা।

(২) **মধ্যভাগের শতদ্রু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সমভূমি অঞ্চল**ঃ উত্তরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত, পশ্চিমে পূর্ব পাঞ্জাব এবং পূর্বে আসামের পর্বতশ্রেণী দ্বারা সীমাবদ্ধ ভূভাগ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। ইহা পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ২০০০ মাইল এবং উত্তর দক্ষিণে ২০০ হইতে ২৫০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা নদী বাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। এজন্য খুব উর্বর এবং নদীগুলি হইতে জলসেচনের সুবিধা আছে। তাই এ অঞ্চল কৃষিকার্য্যের বিশেষ উপযুক্ত। সমভূমি বলিয়া রাস্তা বা রেলপথ নির্মাণ বিশেষ অসুবিধাজনক নহে। এজন্য জলপথে, স্থলপথে ও রেলপথে এখানে যাতায়াতের সুবিধা আছে। জলবায়ু মোটামুটি মনুষ্যবাসের উপযোগী। বৃষ্টিপাত মোটামুটি এবং কোন কোন অঞ্চলে (যেমন আসামে) প্রচুর। এ অঞ্চলের এরূপ প্রাকৃতিক সুবিধা থাকায় ইহাই প্রাচীন ভারতের সভ্যতার উৎপত্তিস্থল এবং কালক্রমে ইহাই ভারতের কৃষিজ, বনজ, প্রাণীজ সম্পদে এবং শিল্পে, বাণিজ্যে, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল ও ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে।

(৩) **দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল**ঃ উত্তরের আরাবল্লী পর্বত হইতে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত এবং পশ্চিমঘাট পর্বত, পূর্বঘাট পর্বত, উত্তরের সাতপুরা, বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্বত, অনেক অনুর্বর উচ্চভূমি এবং নদী উপত্যকা

লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। একমাত্র ইহার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল ও উপত্যকা ভিন্ন অন্যান্য অঞ্চল বিশেষ উর্বর নহে। কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল খুব উর্বর, জলসঞ্চয়ী এবং কার্পাস উৎপাদনের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মোটামুটিভাবে এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত খুব কম। সুতরাং ইহা গঙ্গার সমভূমি অঞ্চলের মত কৃষিকার্য্যে সমৃদ্ধ নহে। তবে এ অঞ্চল বনজ ও নানাবিধ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এজন্য এ অঞ্চল কয়লা, লৌহ, স্বর্ণ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য আহরণে এবং তৎসংক্রান্ত শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কার্পাস শিল্প প্রভৃতিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।



(৪) উপকূলের সমভূমিঃ পশ্চিমে কচ্ছ-কাথিয়াবাড় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ হইয়া পূর্বে সুন্দরবন অঞ্চল পর্য্যন্ত এই সমভূমি বিস্তৃত। পশ্চিমদিকে ইহা আরব সাগর ও পশ্চিমঘাট পর্বত এবং পূর্বদিকে পূর্বঘাট পর্বত ও বঙ্গোপসাগরের

মধ্যে এই সমভূমি অবস্থিত। একমাত্র অনুর্বর, বন্ধুর ও বৃষ্টিহীন উত্তর-পশ্চিমাংশ ভিন্ন সমগ্র সমভূমি অঞ্চল উষ্ণ, আর্দ্র ও উর্বর। পশ্চিম উপকূল পূর্ব উপকূল অপেক্ষা বেশী আর্দ্র কিন্তু কম প্রশস্ত। এ অঞ্চলে কৃষিকার্য্যের সুবিধা আছে। সমুদ্রে মৎস্য আহরণও একটি প্রধান উপজীবিকা। লবণ, কার্পাস, জাহাজ নির্মাণ, নারিকেলের শাঁস, ছোবড়া, তৈল, সিগারেট প্রভৃতি অন্যান্য শিল্প এ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য। জলপথে, স্থলপথে ও রেলপথে এখানে যাতায়াতেরও সুবিধা আছে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল উপরিউক্ত উপায়ে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে এবং বিভিন্নপ্রকার ভূ-প্রকৃতি মানুষের কার্য্যকলাপে বিভিন্নতা আনিয়া দিয়াছে। ২৫ পৃষ্ঠায় ভারতের ভূ-প্রকৃতির মানচিত্র দেওয়া হইল।

এই প্রশ্নের Q. এর লিখিত প্রশ্নটির উত্তরের জন্য এই অধ্যায়ের Q 4 অবশ্য দ্রষ্টব্য।

Q. 10. Illustrate with reference to the valley of Ganga the influence of environment on the economic activities of the dwellers of the valley (C. U. Inter 1959)

(গঙ্গা নদীর উপত্যকা উল্লেখ করিয়া উহার অধিবাসীদের অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপের উপর পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা কর।)

Ans. মানুষের জীবনযাত্রার উপর পরিবেশের (Environment) প্রভাব অপরিসীম। এই প্রভাবের জন্য মানুষ কোথায়ও কৃষিজীবী, কোথায়ও পশুপালক, কোথায়ও শিকারী, আবার কোথায়ও বা শিল্পে উন্নত। পরিবেশ সুসভ্য মানুষের কর্ম প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিলেও বহুলাংশে প্রভাবান্বিত করে। অনুকূল পরিবেশ মানুষের জীবনযাত্রাকে সরল ও সুন্দর করে এবং উক্ত পরিবেশের সদ্ব্যবহার করিলে জীবনযাত্রার মান সর্বপ্রকারে উন্নত হয়। পরিবেশ সাধারণতঃ দুই প্রকার—ভৌগোলিক (প্রাকৃতিক) এবং সাংস্কৃতিক (অপ্রাকৃতিক)। ভূ-প্রকৃতি, অবস্থান, জলবায়ু, মৃত্তিকা, খনিজ সম্পদ, আভ্যন্তরীণ জলভাগ, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, জীবজন্তু প্রভৃতি ভৌগোলিক পরিবেশের অন্তর্গত। আর ধর্ম, রাষ্ট্রতন্ত্র, জনসংখ্যা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত। এই বিভিন্ন প্রকার পরিবেশ গঙ্গার উপত্যকার অধিবাসীদের অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে নিম্নে সংক্ষেপে উহার বর্ণনা দেওয়া হইল:

(১) **ভূ-প্রকৃতি:** ভূ-প্রকৃতি পর্বত, মালভূমি বা সমভূমি সমন্বিত হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে ভূ-প্রকৃতি নদীবাহিত সমভূমি হইলে উহা পলিমাটি সমৃদ্ধ হয়, জল

সেচনের সুবিধা পায় এবং জলপথে ও স্থলপথে যাতায়াতের সুবিধালাভ করিতে পারে। ফলে এরূপ অঞ্চল লোকবসতির অনুকূল হয় ; কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। গঙ্গার উপত্যকায় এরূপ প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধা থাকায় ইহা কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে বিশেষ উন্নত হইতে পারিয়াছে। ইহা হিমালয় অঞ্চলের সুযোগ-সুবিধাগুলিও অতিমাত্রায় ভোগ করিতে পারে।

(২) **অবস্থান** : কোনও ভূভাগের অবস্থান সমুদ্রের নিকটবর্তী হইলে উহার জলবায়ু চরমভাবাপন্ন হইতে পারে না এবং বিদেশের সহিত ও সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে পারে। ইহা ছাড়া উহা প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা সুরক্ষিত হইলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ভয়ে কম ভীত হয়, অধিবাসিগণ নিশ্চিন্তমনে বসবাস করিতে পারে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে মনোনিবেশের সুযোগ পায়। গঙ্গার উপত্যকা অঞ্চলের উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের কিছুটা সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত হইলেও বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-ভাগ সমুদ্রের নিকটেই অবস্থিত। ফলে এখানে শীতোষ্ণতার প্রখরতা নাই। ইহা ছাড়া উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সন্ধিস্থলে অবস্থিত বলিয়া কোন অংশেই জলবায়ুর কঠোরতা দেখা যায় না। উত্তরের হিমালয়, দক্ষিণের বিন্ধ্য, সাতপুরা, মহাকাল, মহাদেব, পশ্চিমের আরাবল্লী এবং পূর্বে আসাম ও ব্রহ্মদেশের পর্বতমালা ইহাকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ভয় হইতে অনেককাল হইতেই নিরাপত্তা দান করিয়াছে। এজন্য এ অঞ্চলের অধিবাসিগণ শিক্ষা, সভ্যতা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে অনেকটা উন্নত হইতে পারিয়াছে।

(৩) **জলবায়ু** : নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু মানুষের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। গঙ্গার উপত্যকা উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। এজন্য ইউরোপের মত ঠিক নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু দেখা না গেলেও এ অঞ্চলের জলবায়ু লোকবসতির প্রতিকূল নহে। বৃষ্টিপাত কোন কোন অঞ্চলে প্রচুর। পশ্চিমদিকে বৃষ্টিপাত কিছুটা কম হইলেও অনেকস্থলে জলসেচনের সুবিধা আছে। ফলে কৃষিকার্য প্রসারলাভ করিতে পারিয়াছে।

(৪) **মৃত্তিকা** : যে অঞ্চলের মৃত্তিকা উদ্ভিদের খাদ্য উপকরণে সমৃদ্ধ সে অঞ্চলে কৃষিকার্য্যের অন্যান্য অনুকূল অবস্থা থাকিলে কৃষিকার্য্য প্রসার লাভ করে। গঙ্গার উপত্যকা উর্বর পললময় মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। অন্যান্য অনুকূল অবস্থা বর্তমান থাকায় এরূপ মৃত্তিকা কৃষিকার্য্যের প্রসারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে।

(৫) **খনিজ-সম্পদ** : খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলে খনিজ সংক্রান্ত নানাবিধ শিল্প গড়িয়া উঠে এবং উহাকে কেন্দ্র করিয়া জনবহুল নগরের পত্তন হয়। গঙ্গার উপত্যকার নিকটবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলেও কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, তাম্র প্রভৃতি

আছে। এজন্য খনিজ অঞ্চল যথা, রাণীগঞ্জ, আসানসোল, ঝরিয়া, প্রভৃতি জনবহুল শিল্প প্রধান স্থানে পরিণত হইয়াছে।

(৬) গঙ্গার উপত্যকায় আর্য্যজাতির আবির্ভাব ও তাহাদের বসতিস্থাপন, বহু জনহিতকর সম্রাটের শাসনব্যবস্থা, ধর্ম, আচার-নিষ্ঠা প্রভৃতি এ অঞ্চলকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে।



সুতরাং নানাবিধ অনুকূল পরিবেশ গঙ্গা উপত্যকাকে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ও সভ্যতায় উন্নত হইতে সাহায্য করিয়াছে। এজন্য এ অঞ্চলের একটা অতীত ঐতিহ্যও গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এবংবিধ অনুকূল পরিবেশ এককালে যেমন পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল কালক্রমে অনুকূল পরিবেশেতে জীবনযাত্রার বিভিন্ন উপকরণ সহজলভ্য হওয়ায় এ অঞ্চলের

অধিবাসীদের অলসতা ও শ্রমবিমুখতাও বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে তুলনামূলকভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে এ অঞ্চল আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। অনেকের মতে পরাধীনতাই ইহার প্রধান কারণ। যাহা হউক ভারত এখন স্বাধীন। সুতরাং এ অঞ্চলের আশানুরূপ সমৃদ্ধি লাভ আর বিলম্বিত হইবে না এরূপ আশা পোষণ করা যাইতে পারে। গঙ্গা উপত্যকার অবস্থান ২৮ পৃষ্ঠার চিত্রে দেখান হইল।

Q. 11. Give an acount of the part played by the Ganges in the economic life of India. (C. U. Inter. 1947)

(ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে গঙ্গার প্রভাব বর্ণনা কর।)

Ans নদী-তীরবর্তী অঞ্চল প্রাচীন সভ্যতার লীলভূমি। কালক্রমে মানুষ নদী তীরবর্তী অঞ্চলেই অধিক সংখ্যায় বসবাস করিয়া আসিতেছে। কারণ মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে নদীর দান অপরিসীম। ইহা বিভিন্ন উপায়ে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবান্বিত করে। গঙ্গানদীও অনুরূপ ভাবে মানুষের কার্য কলাপের উপর নানাভাবে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। নিম্নে উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল:

(১) হিমালয়ের গাড়োয়াল পর্বতের গঙ্গোত্রি নামক হিমবাহ হইতে গঙ্গা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০০ মাইল। এইভাবে পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহা বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিত হইতে গিয়া ইহা অনেক বদ্বীপও গঠন করিয়াছে। উৎপত্তি স্থান হইতে পতন স্থান পর্য্যন্ত ইহাকে তিন অংশে বিভক্ত করা চলে, যেমন, পার্বত্য অংশ (উচ্চগতি), সমভূমি অংশ (মধ্যগতি) ও বদ্বীপ অংশ (নিম্নগতি)। এই বিভিন্ন অংশ নানা ভাবে ভারতবাসীর জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

(ক) পার্বত্য অংশে ইহা অত্যন্ত খরস্রোতা। এজন্য তথায় ইহা নৌবাহনযোগ্য নহে। কিন্তু ইহা পার্বত্য অঞ্চলের কাঠ ভাসাইয়া লইয়া দূরবর্তী সহর ও শিল্পাঞ্চলে পাঠাইতে সাহায্য করিতেছে। ইহা ছাড়া ইহা জলবিদ্যুৎ শক্তির আধার। আবার এই খরস্রোতা নদী উহার উভয় পার্শ্ব ও তলদেশ ক্ষয় করিয়া নুড়ি, কাঁকর, বালি, মাটি প্রভৃতি মধ্যগতিতে স্থানান্তর করিয়া ভূমিভাগ গঠন করিতে সাহায্য করিতেছে। পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের নদীই জল সরবরাহের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস।

(খ) পার্বত্য অঞ্চল হইতে বাহিত কাঁকর, নুড়ি, বালি, মাটি প্রভৃতি নদীর

মধ্যগতিতে উহার উভয় পার্শ্বে সঞ্চিত হইয়া কালক্রমে উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের বিরাট পলল গঠিত সমভূমি সৃষ্টি করিয়াছে। এই সমভূমি অত্যন্ত উর্বর এবং কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত। এজন্য বহুলোক এখানে কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। সুতরাং গঙ্গার এই দান অবিস্মরণীয়।

(গ) গঙ্গার নিম্নগতি বদ্বীপ অঞ্চল। ইহাও গঙ্গা বাহিত পলল দ্বারা গঠিত এবং কৃষিকার্য্যের বিশেষ উপযুক্ত। ইহা ছাড়া ইহার বদ্বীপ অঞ্চলের সুন্দরবন এলাকার কাঠ, ঘাস, পাতা, মধু প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করিতেছে।

(২) গঙ্গার উভয় তীর হইতে বহু উপনদী যেমন যমুনা, শোন, অলকানন্দা, রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডক কোশী প্রভৃতি আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই উপনদীগুলি গঙ্গার জলপ্রবাহ বৃদ্ধি করিয়া অধিবাসীদের পানীয় জল, স্নানের জল, সেচের জল প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করিতেছে। জলই জীবন। জল না হইলে মানুষ বাঁচিতে পারে না। গঙ্গার অফুরন্ত জলরাশিই এজন্য মানুষকে উহার তীরে বসবাসের জন্য আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা ছাড়া গঙ্গা হইতে বহু খাল কাটিয়াও বহুদূর পর্য্যন্ত জল সরবরাহের সুবিধা করা হইয়াছে।

(৩) গঙ্গার দান উত্তর ভারতের সমভূমি নরম শিলা দ্বারা গঠিত। এজন্য রাস্তা ও রেলপথ নির্মাণ এতদ্ অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত সহজ। এজন্য রাস্তা ও রেল-পথের পরিমাণও এ অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং জলপথ, স্থলপথ ও রেলপথে যাতায়াত এ অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। ফলে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে এ অঞ্চল অগ্রগতি লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে।

(৪) এরূপ যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বর্তমান থাকায় ইহার তীরে বহু নগর, বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা, কানপুর, পাটনা প্রভৃতির প্রসিদ্ধি যে গঙ্গা নদীর জন্য একথা অস্বীকার করিবার নাই।

(৫) গঙ্গার জল অতীব পবিত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। গঙ্গায় অবগাহন করিলে পাপমুক্ত হওয়া যায় ইহা বহুলোকের ধর্ম বিশ্বাস। তাই ইহার তীরে কাশী, এলাহাবাদ, হরিদ্বার প্রভৃতি অনেক তীর্থক্ষেত্র অবস্থিত। বিভিন্ন অঞ্চল হইতে তীর্থযাত্রীদের সমাগম হয় বলিয়া যাত্রীদের আহার, বাসস্থান প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া এবং তাহাদের নিকট বহু পণ্য বিক্রয় করিয়া বহুলোক জীবিকা অর্জন করিতেছে। ফলে তীর্থকেন্দ্রগুলিও ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।

(৬) গঙ্গা নদীতে মৎস্য শিকার করিয়াও বহুলোক জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে।

(৭) গঙ্গা ও উহার উপনদীর উপর যে সমস্ত নদী উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহা কার্য্যকরী হইলে নানা দিক দিয়া উহার তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসিগণ উপকৃত হইবে। গঙ্গা না থাকিলে এরূপ সম্ভাবনা কমই থাকিত।

(৮) গঙ্গা নদী বৃষ্টির জল ও বরফগলা জলে পুষ্ট। এজন্য ইহাতে প্রায় বার মাসই প্রচুর জল থাকে বলিয়া ইহা সুনাব্য।

সুতরাং উত্তর ভারতের ঐশ্বর্য্য—কৃষি শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি গঙ্গার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

তবে গঙ্গার গঠনমূলক পরিকল্পনা থাকিলেও উহার যে ধ্বংসমূলক পরিকল্পনা নাই এরূপ বলা চলে না। ইহার প্লাবন পলি সঞ্চয়ে সাহায্য করিলেও উহা বহু শস্য নষ্ট করে, অনেক লোককে গৃহহীন করে এবং নানাভাবে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ইহার কূল ভাঙ্গা-গড়াতে নূতন জনপদ সৃষ্টি হইলেও উহার ভাঙ্গন অশেষ ক্ষতির কারণ হয়। তবে ইহার ধ্বংসলীলা অপেক্ষা গঠনলীলাই বেশী। তাই মানুষ এই নদী হইতে প্রভূত উপকৃত। নদী উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী হইলে ধ্বংসলীলার অনেক অবসান ঘটিবে আশা করা যায়।

(গঙ্গার গতি ২৮ পৃষ্ঠার মানচিত্রে দ্রষ্টব্য)

Q. 12. Compare and contrast the east coast of India with the west coast in respect of

(i) suitability for locating ports and harbours; (ii) economic activities in the coastal plains (C. U. Inter 1958)

(নিম্নলিখিত বিষয়ে ভারতের পূর্ব উপকূলের সহিত পশ্চিম উপকূলের তুলনা করঃ (১) বন্দর ও পোতাশ্রয় গঠনের উপযুক্ততা; (২) উপকূল সমভূমিতে অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপ।)

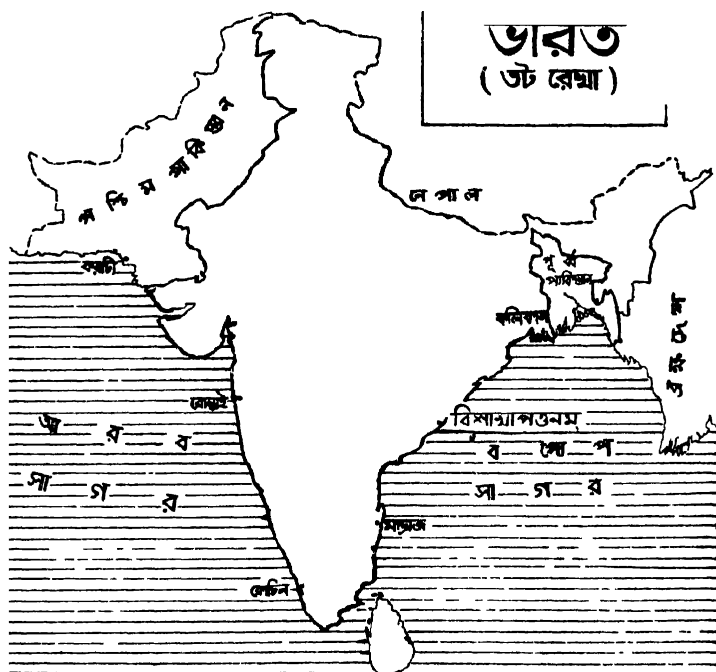
Ans. ভারতের মূল ভূখণ্ডের উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য ৩০০০ মাইলের অধিক। কিন্তু এই দীর্ঘ উপকূল রেখার মধ্যে ভগ্নতা ও বক্রতা খুব কম।

ইহার পশ্চিম উপকূল কচ্ছ উপসাগর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অঞ্চলে কচ্ছ, কাম্বে ও মান্নার উপসাগর উপকূল রেখাকে কিছুটা ভগ্ন ও বক্র করিয়াছে। কিন্তু এই উপসাগরগুলি অত্যন্ত অগভীর। কচ্ছ উপসাগরের কতকাংশ 'রান' বা লবণ জলাভূমি পূর্ণ। এই উপকূলের আরবসাগর অগভীর না হইলেও বৎসরের প্রায় ৬ মাস উহা মৌসুমীবায়ু বিক্ষুব্ধ। তাহা ছাড়া পশ্চিম

উপকূলের সমভূমির পরিসর কোথায়ও ৩০ মাইলের বেশী নহে। দিল্লী, এলাহাবাদ প্রভৃতি অভ্যন্তরস্থ পশ্চাৎভূমিতে অবস্থিত স্থানগুলি সমুদ্র হইতে বহুদূর অবস্থিত। এইগুলি পশ্চিম উপকূলের বন্দর ও পোতাশ্রয় গঠনের অন্তরায়। এজন্য এখানে অধিক সংখ্যক বন্দর ও পোতাশ্রয় গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। এ উপকূলের কেবলমাত্র বোম্বাই, গোয়া ও কোচিন বন্দর স্বাভাবিক পোতাশ্রয়যুক্ত। বোম্বাই একটি দ্বীপের আড়ালে অবস্থিত বলিয়া সুন্দর পোতাশ্রয়যুক্ত এবং মূল ভূখণ্ডের সহিত রেলপথ দ্বারা যুক্ত। এজন্য ইহা একটি বিরাট বন্দরে পরিণত হইযাছে। কচ্ছ উপসাগর তটে ভারতের নূতন বন্দর কান্দলা অবস্থিত। ইহার অবস্থান স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের মত। কিন্তু উপসাগর ও বন্দরের খাঁড়িতে জলের গভীরতা বেশী নহে। করাচী বন্দরের অভাব পূরণ করার জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে এই বন্দর গঠন করিতে হইয়াছে। এ অঞ্চলের অন্যান্য অনেক বন্দরে যেমন ম্যাঙ্গালোর, রত্নগিরি, পোরবন্দর প্রভৃতিতে কোন পোতাশ্রয় নাই। এজন্য জাহাজকে দূর সমুদ্রে দাঁড়াইতে হয় এবং নৌকাগুলি ঢেউয়ে দুলিতে দুলিতে মাল উঠানামার কাজ করে। কেবলমাত্র পালতোলা জাহাজ কোনক্রমে ভিড়িতে পারে। এই বন্দরগুলির মধ্যে একমাত্র ওখা বন্দরে কিছু বড় জাহাজ ভিড়িতে পারে।

পূর্ব উপকূল খুলনার সীমান্তবর্তী কালিন্দী মোহনা হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। হুগলী, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি নদীগুলির বদ্বীপ এই উপকূলেই অবস্থিত। এই বদ্বীপগুলির অবস্থানহেতু এই উপকূল ভাগ পশ্চিম উপকূল অপেক্ষা কিছুটা বেশী ভগ্ন। কিন্তু তটভাগের নিকট সমুদ্র অগভীর ও তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ। নদীগুলির মুখে বালুচড়া থাকায় জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে না। ফলে বন্দর ও পোতাশ্রয় গঠনের পক্ষে এ উপকূলও অনুপযুক্ত। তবে পূর্ব উপকূলের সমভূমির পরিসর পশ্চিম উপকূলের সমভূমির পরিসর অপেক্ষা বিস্তৃততর এবং কোন কোন স্থানে প্রায় ২০০ বিস্তৃত। এ উপকূলের প্রধান বন্দর মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম ও কলিকাতা। মাদ্রাজ বন্দরকে কৃত্রিম উপায়ে পোতাশ্রয়ে পরিণত করা হইয়াছে। হুগলী নদীর বালুচড়া সরাইয়া কলিকাতা বন্দরকে পোতাশ্রয়ের উপযোগী করা হইয়াছে এবং জোয়ারের প্রভাবে জাহাজ যাতায়াত করে। হুগলী নদীর বালুচড়া সরাইতে প্রতি বৎসর বহুকোটি টাকা ব্যয় হয়। একমাত্র বিশাখপত্তনম বন্দরটি পর্বতের আড়ালে অবস্থিত বলিয়া সুন্দর ও স্বাভাবিক পোতাশ্রয় বিশিষ্ট। ইহা ছাড়া এই উপকূলে চাঁদবালি, মসুলিপত্তনম, নাগাপত্তম, তুতিকোরিন, কুড্ডালোর, পন্দিচেরী প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্দর আছে। কিন্তু ইহাদের অনেকগুলিতেই পোতাশ্রয় নাই। ভারতের তটভাগে ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রায়

১৫০টি বন্দর আছে। তন্মধ্যে মাত্র ১৮টি উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে আবার ৭।৮টি বৃহৎ বন্দরের পর্য্যায়ে পড়ে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে উপকূলের দৈর্ঘ্যের তুলনায় বন্দরের ও পোতাশ্রয়ের সংখ্যা খুবই কম। এরূপ অল্পসংখ্যক বন্দর উপকূল বাণিজ্যের ও বহির্বাণিজ্যের প্রবল অন্তরায়। কলিকাতা বন্দরের চাপ ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কলিকাতা বন্দরের চাপ কমানোর জন্য হলদিয়াতে একটি নূতন বন্দর গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।



উপকূলবর্তী সমভূমির প্রসারতা উভয় উপকূলে সমান নহে। পশ্চিম উপকূলের সমভূমি অপেক্ষা পূর্ব উপকূলের সমভূমির প্রসারতা বেশী।

পশ্চিম উপকূলের সমভূমি সঙ্কীর্ণ হইলেও উহা উর্বর। এখানে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর কৃপায় প্রচুর বারিপাতও হয়। এজন্য এখানে ধান, নারিকেল, মসলা,

রবার, চা, কফি প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলে বহুলোক কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে। ইহা ছাড়া বহুলোক বনভূমি হইতে শাল, সেগুন প্রভৃতি কাষ্ঠ আহরণে, সমুদ্র হইতে মৎস্য শিকারে, কার্পাস, ইক্ষু, লবণ প্রভৃতি শিল্পে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে এবং এইভাবে বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপের পরিচয় দিয়া থাকে।

পূর্ব উপকূলে বদ্বীপের সংখ্যা বেশী। ভূমিভাগও অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। বৃষ্টিপাত পশ্চিম উপকূল অপেক্ষা কম হইলেও জলসেচনের সুবিধা আছে। সমভূমিও উর্বর। এজন্য পশ্চিম উপকূল অপেক্ষা এ উপকূল কৃষি সমৃদ্ধ। ধান, কার্পাস, ইক্ষু, চীনাবাদাম, ডাল, মশলা, তামাক প্রভৃতি উৎপন্ন করিয়া বহুলোক জীবিকা নির্বাহ করে। সমুদ্র ও নদীতে মৎস্য শিকার, শঙ্খ আহরণ, জাহাজ, কার্পাস, ইক্ষু, লবণ প্রভৃতি শিল্পকার্য্য, বনভূমি হইতে কাষ্ঠ আহরণ প্রভৃতি অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপে নিযুক্ত থাকিয়া এতদ অঞ্চলের অধিবাসিগণ জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে।

Q. 13. Describe the effect of climate of India on the economic activities of its people.

(ভারতের অধিবাসীদের উপর উহার জলবায়ুর ফলাফল বর্ণনা কর।)

Or

What do you understand by monsoon type of climate? Can you say why so much importance is attached to monsoons in India? (C. U. Inter. 1931, 1942)

(মৌসুমী জলবায়ু বলিতে কি বুঝ ? ভারতে মৌসুমী জলবায়ুর প্রতি এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয় কেন বলিতে পার ?)

Or

Describe the effetts of Monsoon on the economic life of India.

(ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব বর্ণনা কর।)

উঃ. ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ুর তারতম্য দেখা গেলেও মোটের উপর উহার জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র বলা যাইতে পারে। একমাত্র উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল ও মরুভূমি ছাড়া শীত-গ্রীষ্মের প্রখরতা দৃষ্ট হয় না। এরূপ জলবায়ু মানুষের কর্ম উদ্যমে পরম সহায়ক না হইলেও খুব প্রতিকূল নহে। সুতরাং কৃষি, শিল্প, যানবাহন প্রভৃতি প্রসারে জলবায়ু প্রবল প্রতিবন্ধক নহে। এজন্য অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপে ভারতের জলবায়ু অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে। ভারতের অর্থনৈতিক

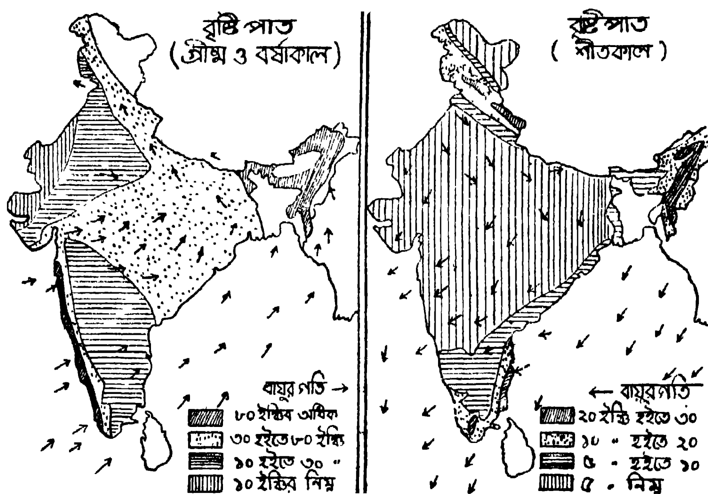
জীবনে জলবায়ুর প্রতিকূল বা অনুকূল প্রভাব বিস্তারে মৌসুমী বায়ু বিশেষ কার্য্যকরী।

মৌসুমী কথাটা আরবী ভাষার 'মৌসীম' শব্দ হইতে আসিয়াছে। ইহার অর্থ ঋতু বা মরসুম। ঋতুভেদে যে জলবায়ুর পরিবর্তন হয় তাহাকে মৌসুমী জলবায়ু বলে। ভারতের মত ক্রান্তীয় অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে সমুদ্র হইতে আগত জলকণাবাহিত বায়ু যে উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর সৃষ্টি করে এবং শীতকালে স্থলভাগ হইতে শুষ্ক বায়ু যে নাতিশীতোষ্ণ শুষ্ক জলবায়ুর সৃষ্টি করে তাহাকে মৌসুমী জলবায়ু বলে। ভারতের গ্রীষ্মকালের মৌসুমী বায়ুকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এবং শীতকালের মৌসুমী বায়ুকে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু বলে। ভারত উহার মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা ৯০ ভাগ গ্রীষ্মকালীন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর জন্য পাইয়া থাকে। এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং বর্ষণের সময়ের উপর ভারতের অর্থ নৈতিক কার্য্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে চলিয়া থাকে বা বিঘ্নিত হয়। কারণ ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এখানে শতকরা ৯০ জন লোক কৃষির উপর জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভর করে। ভারতের কৃষিপোযোগী উর্বর ভূমির অভাব নাই। কিন্তু জল ভিন্ন ইহার কাজ সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হইতে পারে না। এই জল বৃষ্টি বা সেচের সাহায্যে পাওয়া যায়। ভারতে সেচ প্রথার এখনও সম্যক উন্নতি হয় নাই। কৃষিপোযোগী জমির মাত্র শতকরা ২০ ভাগ সেচ প্রথায় সিঞ্চিত হইতে পারে। সুতরাং কৃষককে বৃষ্টির উপরই বেশী নির্ভর করিতে হয়। এই বৃষ্টিপাত আবার মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু মৌসুমী বায়ু প্রভাবিত বৃষ্টিপাত সকল বৎসর ঠিক মত সময়ে পরিমাণ-মত হইতে দেখা যায় না। এজন্য অর্থ নৈতিক কার্য্যকলাপের গতি-প্রকৃতিও সকল বৎসর সমভাবে অগ্রসর হইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষি কার্য্যের সহিত তথা কৃষকের ভাগ্যের সহিত অন্যান্য সকলের ভাগ্য জড়িত হইয়া পড়ে। কৃষককে বৃষ্টিপাতের সহিত জুয়াখেলার মত (gamble in rains) লিপ্ত থাকিতে হয়। ঠিকমত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইলে বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফসলের প্রাচুর্য্য দেখা দিলে কৃষকদের আর্থিক অবস্থার সম্যক উন্নতি ঘটে। কারণ কৃষকদের বা জমির মালিকদের ভোগের প্রয়োজনাতিরিক্ত শস্য বিক্রয় করিয়া অর্থাগম হয়। এরূপ অর্থাগম হইলে সরকার ঠিকমত সময়ে কৃষকদের বা মালিকদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতে পারে। অন্যান্য পাওনাদারও তাহাদের পাওনা ঠিকমত সময়ে পাইয়া থাকে। উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রয়ের দরুণ লোকের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে শিল্পজাত ও অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে এবং বিক্রয় বৃদ্ধি পায়। কৃষিজাত কাঁচামালের প্রাচুর্য্য হেতু শিল্পজাত দ্রব্যেরও

উৎপাদন বাড়িয়া যায়। নানাবিধ জিনিসপত্রের ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে। পাট, চা প্রভৃতির বৈদেশিক বাণিজ্যও বৃদ্ধি পায়। মোটর, রেল, জাহাজ প্রভৃতিতে কাঁচা মাল ও শিল্পজাত দ্রব্য বহন বৃদ্ধি পাওয়ায় উহাদের আয় বৃদ্ধি হয়। পক্ষান্তরে শুল্ক, রাজস্ব প্রভৃতির দ্বারা সরকারের আয়ের ভাণ্ডারও সমৃদ্ধ হইতে থাকে। ইহাতে সরকারের পক্ষে অনেক উন্নয়নমূলক কার্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় এবং ফলে বহুলোকের কর্মসংস্থান হয় ও বেকার সমস্যার লাঘব ঘটে। সুতরাং মৌসুমী বায়ুর কৃপায় ঠিকমত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ বারিবর্ষণ হইলে সর্বদিকে তৎপরতা, সমৃদ্ধি ও উন্নতির সাড়া পড়িয়া যায়। সকলের মুখেই তখন হাসি ফুটিয়া উঠে। দেশের মধ্যে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি হ্রাস পায়। 'আমাদের দাবী মান্‌তে হবে' বলিয়া বিভিন্ন দলের চীৎকারে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয় না এবং কলিকাতার মত সহরে যান-বাহন চলাচল বিঘ্নিত হয় না। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকে এবং মন্ত্রীমণ্ডলীরও গালিগালাজ শুনিতে হয় না। আইন সভায় বিরোধীপক্ষের সোরগোল কম থাকে এবং উহার কার্যও স্থির মস্তিষ্কে চলিতে পারে।

কিন্তু ঠিকমত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টি মৌসুমী বায়ুর কৃপায় না হইলে উপরি-উক্ত পরিস্থিতির বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হয়। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি হইলে ফসল ভাল হইতে পারে না। ঠিকমত সময়ে বৃষ্টি না হইলে কৃষির কাজ ঠিকমত অগ্রসর হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় প্রথমতঃ খাদ্য শস্যের অপ্রাচুর্য্য দেখা দেয় এবং দুর্ভিক্ষের সূচনা করে। কৃষকদের নিকট ভোগের প্রয়োজনাতিরিক্ত শস্য থাকে না। বরং উহার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষিজাত দ্রব্যের প্রাচুয্য না থাকায় ক্রয়-বিক্রয় বাজারে মন্দা উপস্থিত হয়। ইহাতে একদিকে কৃষকদের আর্থিক অবস্থার অবনতি এবং অপর দিকে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে মন্দা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাট্‌তি দেখা দেয়। কাঁচামালের অভাবে এবং লোকের ক্রয়-ক্ষমতার দুর্বলতার দরুণ শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস পায়। ইহাতে শিল্প কারখানায় ছাঁটাই আরম্ভ হয় এবং বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পাওনাদার তাহাদের পাওনা পায় না। সরকারের শুল্ক, রাজস্ব কমিয়া যায়। এজন্য নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্য ব্যাহত হয়। বাজেটের ঘাট্‌তি পূরণের জন্য করের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং নানাবিধ দ্রব্য মূল্যও বৃদ্ধি পায। ইহাতে জনসাধারণের দুর্গতি বাড়িতেই থাকে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হয়। বিভিন্ন দল তাহাদের নিজস্ব দাবীদাওয়া উপস্থিত করিয়া সরকারকে বিব্রত করিয়া তোলে। আইনসভা বিরোধী-পক্ষের উত্তেজনায় সরগরম হইয়া উঠে এবং উহার সুষ্ঠু কার্য্য বিঘ্নিত হয়।

আন্দোলন, সভা-সমিতি, মিছিল ইত্যাদিতে মানুষের জীবনযাত্রা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। সর্বদিকেই একটা নিরাশা ও হতাশার ছায়াপাত হয় এবং দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত হয়। অত্যধিক বারিবর্ষণের ফলে বন্যার সৃষ্টি হয়। ফলে বাড়ীঘর, ধন, প্রাণ, ফসল প্রভৃতি বিনষ্ট হয় এবং চলাচল ব্যবস্থায় বিপর্য্যয় সৃষ্টি হয়। তখন মানুষের দুর্গতির শেষ থাকে না। সুতরাং মৌসুমী বায়ু আমাদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার মাপকাঠি—ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। অন্য কোন প্রাকৃতিক ঘটনা ভারতের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে কিনা সন্দেহ।



বর্তমানে অনেক নদী উন্নয়ন পরিকল্পনা দ্বারা মৌসুমী বায়ুর খামখেয়ালীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না উহা আমাদের সম্পূর্ণ কাজে আসিতেছে সে পর্য্যন্ত মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর কি? উপরে মৌসুমী-বায়ুর গতিপথ ও বৃষ্টিপাত দেখান হইল।

Q. 14. Discuss the influence of position of India on its commercial and industrial development.

(ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের উপর উহার অবস্থানের প্রভাব বর্ণনা কর।)

Ans. ভারতের শিল্প বাণিজ্যের উপর উহার অবস্থানের প্রভাব নিম্নলিখিত উপায়ে বর্ণনা করা যাইতে পারে:

(১) ভারতীয় ইউনিয়নের সমস্ত অংশটী উত্তর গোলার্দ্ধে অবস্থিত। ইহা মোটামুটি ৮° উত্তর অক্ষাংশ হইতে ৩৭° উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে এবং ৭০° পূর্ব দ্রাঘিমা হইতে ৯৭° পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত।



কর্কটক্রান্তি রেখা ইহাকে প্রায় সমদ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। ফলে উত্তর ভারত নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে এবং দক্ষিণ ভারত উষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। দক্ষিণভারতে সমুদ্র সান্নিধ্যহেতু ও উচ্চতার জন্য উষ্ণতার প্রভাব বেশী নয়। হিমালয় পর্বত অবস্থিত থাকায় উত্তরের শীতল বায়ুও দেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না এবং উহা মৌসুমী বায়ুকে প্রতিহত করিয়া ভারতে বৃষ্টিপাতে সহায়তা করিয়া থাকে। উত্তর

ভারত সমুদ্র হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত বলিয়া উহার জলবায়ু সামান্য চরমভাবাপন্ন। মোটের উপর ভারতের এই অবস্থানজনিত জলবায়ু মানুষের উদ্যমশীলতার প্রতিবন্ধক নহে। এরূপ জলবায়ু কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সহায়ক এবং ভারত উহার সম-অক্ষাংশে অবস্থিত দেশগুলির তুলনায় ঐ সমস্ত বিষয়ে পশ্চাৎপদ বলা চলে না।

(২) ভারতের অবস্থান উপদ্বীপীয়। ইহা পূর্ব গোলার্ধের মধ্যস্থলে অবস্থিত! এরূপ অবস্থান আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল। এজন্য জলপথে ইহা আফ্রিকা, ইউরোপ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার সহিত অনায়াসে সংযুক্ত হইতে পারিয়াছে। ইহা ইউরোপ হইতে অষ্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে যাইবার প্রধান জলপথে, স্থলপথে ও বিমানপথের উপর অবস্থিত। সুতরাং ভারতের এরূপ অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে সহায়ক।

(৩) পাকিস্তান সীমান্ত ছাড়া ইহার স্থলসীমা অত্যুচ্চ ও দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া খুব সুবিধাজনক না হইলেও বহিঃশত্রুর হঠাৎ আক্রমণ হইতে ভারতকে রক্ষা করিতেছে। ফলে অধিবাসীদের পক্ষে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত জীবনযাপন সম্ভব হইতেছে এবং নানাবিধ কর্মপ্রচেষ্টায় মনোনিবেশ করা সম্ভব হইতেছে। ৩৮ পৃষ্ঠার মানচিত্র হইতে ভারতেয় অবস্থান মোটামুটি বুঝিতে পারা যাইবে।

Q. 15. Explain how the shape and size of a country influence its economic activities Give examples.

(C. U, Inter, 1953)

(দেশের আকৃতি ও আয়তন উহার অধিবাসীদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।)

Ans. পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বিভিন্ন দেশের আকৃতি ও আয়তন সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। বিভিন্ন দেশের আকৃতি বিভিন্ন রকমের। কোনও দুইটি দেশের আকৃতি অবিকল এক রকম দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে দেশের আকৃতি সাধারণভাবে সুসংবদ্ধ (Compact), বিক্ষিপ্ত (Fragmented), বর্গাকার (Square), ত্রিভুজাকৃতি (Triangular), সরু (Attenuated) ইত্যাদি নামে অভিহিত করা যায়। এই বিভিন্ন প্রকার আকৃতি নানাভাবে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ভারত, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের মত যে দেশ সুসংবদ্ধ অর্থাৎ উহার এক অংশ হইতে অপর অংশ সাগর, বিরাট মরুভূমি বা দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত দ্বারা বিচ্ছিন্ন নয়, সে দেশের রেলপথ, বাণিজ্য,

শিল্প, কৃষি, বসতি বিস্তার, সুষ্ঠু শাসন পরিচালনা এবং অন্যান্য নানা প্রকার উন্নতি সাধনের সুযোগ ঘটে। পাকিস্তান বা গ্রীসের মত বিক্ষিপ্ত হইলে উপরিউক্ত সুযোগ-সুবিধালাভ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না এবং এজন্য আর্থিক উন্নতি ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা ব্যাহত হয়। এরূপ অবস্থায় উক্ত দেশের কোন অংশে দুর্ভিক্ষ বা অন্য কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলে সহসা প্রতিকার করা সম্ভব হয় না। ফ্রান্স, জার্মানী, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের মত কোনও দেশ অনেকটা বর্গাকার হইলে সকল প্রান্তই মধ্যভাগ হইতে প্রায় সমান দূরে অবস্থিত থাকে। এরূপ দেশের সর্ব অংশ সমভাবে আর্থিক দিক দিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে এবং শাসিত হইতে পারে। দেশের সম্পদও বিভিন্ন অংশে সমভাবে বণ্টিত হইতে পারে। জাপান, ব্রিটেন ও ইন্দোনেশিয়ার মত দ্বীপময় হইলে বিভিন্ন অংশের সহিত যোগাযোগ রক্ষা ব্যাপারে কতকটা অসুবিধা ভোগ করিতে হয় বটে, কিন্তু সমুদ্র সান্নিধ্যহেতু মৎস্য শিকার, নৌবিদ্যা প্রভৃতিতে অধিবাসিগণ পারদর্শী হইতে পারে। চিলির মত কেবল পূর্ব-পশ্চিমে স্বল্প বিস্তৃত কিন্তু উত্তর-দক্ষিণে সুদীর্ঘ হইলে উহার বিভিন্ন অংশের মধ্যে জলবায়ুর পার্থক্য দেখা যায় এবং বৃহৎ কৃষি ব্যবস্থা গ্রহণ করা অসুবিধাজনক হয়। এজন্য চিলিতে মরুপ্রকৃতি, ভূমধ্যসাগরীয় ও নাতিশীতোষ্ণ এই তিন প্রকারের জলবায়ু দেখিতে পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন প্রকারের স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। দেশটি রাশিয়ার মত পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ হইলে জলবায়ুর এতটা পার্থক্য অবশ্য দেখা যায় না। সুতরাং দেশের আকৃতি বিভিন্নভাবে মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

আবার দেশের আয়তন ছোট মাঝারি, বৃহৎ প্রভৃতি নানাপ্রকারের হইতে পারে। কোন দেশের আয়তন ১০ লক্ষ বর্গমাইলের বেশী হইলে তাহাকে অতিবৃহদায়তন (Gigantic), ১ লক্ষ বর্গমাইল হইতে ১০ লক্ষ বর্গমাইল হইলে বৃহদায়তন (Large), ৪০ হাজার হইতে প্রায় ১ লক্ষ বর্গমাইল হইলে মধ্যমায়তন (Medium) এবং ৪০ হাজারের কম হইলে ক্ষুদ্রায়তন (Small বলা হয়। দেশটি আয়তনে বড ও ঘন বসতিপূর্ণ হইলে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতিতে উন্নতিলাভ করিতে পারে, যেমন, ভারত, চীন প্রভৃতি। আয়তনে বড অথচ বিরল বসতিপূর্ণ হইলে (যেমন অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা) পশুপালন বেশী প্রসারলাভ করিতে দেখা যায়। ইংলণ্ড, জাপান, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের মত ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট হইলে কৃষিজাত দ্রব্য দেশের প্রয়োজন মিটাইতে পারে না। ফলে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নত হইতে থাকে। সুতরাং এইভাবে দেশের আয়তনও উহার অধিবাসীদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

Q. 16. To what extent does the non-physical environment control human activities ?

অপ্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের কার্যকলাপ কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে ?

Or

"The race, religion and government influence the commerce of a country to a certain extent."—Support the statement by illustration.

('জাতি, ধর্ম ও সরকার দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করিয়া থাকে'—উদাহরণসহ এই উক্তি সমর্থন কর।)

Ans : মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে অনেকাংশে প্রভাবিত করিয়া থাকে তেমন অপ্রাকৃতিক পরিবেশও নানাভাবে মানুষের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। যে সমস্ত অপ্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে নিম্নে উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :

(১) জাতি (Race) : মানবগোষ্ঠী সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—শ্বেত জাতি (White Race), পীত জাতি (Yellow Race) এবং কৃষ্ণ জাতি (Black Race)। কিন্তু ইহারা ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে সমান ভাবে উন্নত নয়। শ্বেত জাতি ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশী উন্নত, পীত জাতি উহা অপেক্ষা কম উন্নত এবং কৃষ্ণ জাতি উহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অনেক অনুন্নত। গ্রেট ব্রিটেনের অধিবাসিগণ শ্বেত জাতির অন্তর্ভুক্ত। ইহারা ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা প্রভৃতি সর্ববিষয়ে রীতিমত উন্নত, পক্ষান্তরে আফ্রিকার নিগ্রোজাতি কৃষ্ণ জাতির অন্তর্ভুক্ত। ইহারা উপরি উক্ত সর্ববিষয়ে বিশেষ অনুন্নত। ইহাদের যাহা কিছু উন্নতি তাহা শ্বেত জাতির সংস্পর্শে আসিয়াই সম্ভব হইয়াছে। চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ পীত জাতির অন্তর্ভুক্ত। ইহারা বর্তমানে অনেকটা উন্নত। কিন্তু ইহাদের উন্নতি শ্বেত জাতির আদর্শ অনুসরণ করিয়াই সম্ভব হইয়াছে। ইহা হইতেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 'জাতির' প্রভাব বুঝিতে পারা যাইবে। যদিও বর্তমানে বিশুদ্ধ জাতি খুব কম স্থানেই আছে, নৃতত্ত্ব ও রাজনীতি ক্ষেত্রেও জাতিগত পার্থক্য লইয়া মতভেদ আছে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্যের কারণ অন্যভাবেও বিশ্লেষণ করা চলে তথাপি বাস্তবক্ষেত্রে ইহার প্রভাব সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না।

(২) ধর্ম (**Religion**) : ধর্মের অনুশাসনও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার

করিয়া আসিতেছে। পৃথিবীতে খৃষ্ট, বৌদ্ধ, ইস্‌লাম, হিন্দু প্রভৃতি ধর্মের বিশেষ প্রভাব আছে। এ সমস্ত ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপও বিভিন্নরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথার জন্য অর্থনৈতিক কার্যবিভাগ; বৌদ্ধধর্মের অহিংসনীতির জন্য জীবহত্যা নিষেধ এবং তজ্জন্য উক্ত ধর্ম অধ্যুষিত চীন ও জাপানে মাংস ও চামড়া ব্যবসায়ের অনগ্রসরতা, ইসলাম ধর্মে সুদ গ্রহণ ও মদ্যপান নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত ধর্ম অধ্যুষিত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসিগণের মধ্যে মদ্য ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অনগ্রসরতা উল্লেখ করা হয়। খৃষ্টধর্মে এরূপ কোন নিষেধ নাই বলিয়া খৃষ্টধর্ম অধ্যুষিত অঞ্চলে সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে সবপ্রকার অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ প্রসার লাভ করিতে পারিয়াছে। এককালে এই ধর্মের অনুশাসন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিলেও বর্তমানে ধর্মের গোঁড়ামি অনেক শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তাই বৌদ্ধ, চীন ও জাপানে মাংস ও মাছ প্রিয় খাদ্য, ইসলাম ধর্মাবলম্বী কাবুলীওয়ালাদের লগ্নীর কারবারই প্রধান উপজীব্য।

(৩) **রাষ্ট্র-সংগঠন (Political Organisation or Government)**: কোন দেশের রাষ্ট্র সংগঠন বা সরকারের কাঠামো, উহার স্থিতিশীলতা ও শক্তিমত্তা দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এজন্য শক্তিশালী স্থিতিশীল সোভিয়েট রাশিয়া ও বৃটেন যতটা উন্নত আফ্রিকার ও দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি সে তুলনায় অনেক অনুন্নত।

(৪) **সমাজ-সংগঠন (Social Organisation)** সমাজ সংগঠনও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। হিন্দুদের সমাজ ব্যবস্থায় কর্মানুসারে জাতিভেদ থাকায় কুম্ভকারের পুত্র কুম্ভকার হিসাবেই কাজ করিয়া থাকে। ইহাতে কর্মদক্ষতা বাড়িতে পারে বটে, কিন্তু কর্মবিভাগের জন্য কোন কর্মে লোকের অভাব এবং অন্য কর্মে লোকাধিক্য আসিয়া পড়ে। ইহাতে অর্থনৈতিক উন্নতি বিঘ্নিত হয়। অনেক সামাজিক ব্যবস্থা সভ্যতা বিরোধী এবং বর্বরোচিত। আফ্রিকায় এবং সুসভ্য যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ ব্যবস্থা সমাজ বিরোধী ত বটেই, অধিকন্তু অর্থনৈতিক উন্নতিরও পরিপন্থী।

(৫) **লোক সংখ্যা (Population)**: জনসংখ্যার পরিমাণের উপর শ্রমিক ও মূলধনের সরবরাহ নির্ভর করে। কোন দেশ জনবহুল হইলে শিল্পে-বাণিজ্যে উন্নত হওয়ার সুযোগ প্রায়। যেমন, যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটব্রিটেন। অষ্ট্রেলিয়া জনবিরল হওয়ায় যন্ত্রশিল্প অপেক্ষা পশুচারণই বেশী প্রসার লাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা

(Definition and Importance of Economic Geography)

Q 1. What is Economic Geography? Discuss briefly the importance of Economic Geography.

(অর্থনৈতিক ভূগোল কাহাকে বলে? সংক্ষেপে অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।)

Ans. পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মানুষ যে-সকল অর্থপ্রসূ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে সে-সকল বৃত্তির সহিত মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশের যে সম্পর্ক সে সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান যে শাস্ত্র পাঠ করিলে জন্মিয়া থাকে তাহাকে অর্থনৈতিক ভূগোল (Economic Geography বলে। কৃষিকার্য, মৎস্যশিকার, কাষ্ঠ আহরণ, খনিজদ্রব্য উত্তোলন, পশুপালন, পশুশিকার, শিল্পদ্রব্য উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ প্রভৃতি মানুষের অর্থপ্রসূ বৃত্তি। এই বৃত্তিগুলি আবার মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। মানুষের সহিত তাহার প্রাকৃতিক পরিবেশের যে নিকট সম্বন্ধ এবং উভয়ের উপর উভয়ের যে প্রভাব তাহা কম নয়। সুতরাং মানুষের অর্থপ্রসূ বৃত্তিগুলি প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা কি ভাবে প্রভাবিত হয় এবং মানুষ উহার উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাহার কার্য-কারণ সম্পর্কের বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনাই অর্থনৈতিক ভূগোলের মূল বিষয়বস্তু। সুতরাং অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রয়োজনীয়তা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে :

(১) বর্তমানকালের মানুষ পূর্বকালের মত কেবল মাত্র সামান্য আহার ও পরিধেয় পাইয়াই সন্তুষ্ট নহে। তাহার বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান আহরণ লিপ্সা প্রবল। অর্থনৈতিক ভূগোল জ্ঞান আহরণের একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র।

(২) এই শাস্ত্র পাঠ করিলে মানুষের পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে।

(৩) উক্ত পরিবেশ মানুষের জীবন যাত্রার উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে এবং মানুষই বা উহার উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে সে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ ইহা পাঠ করিলে সম্ভব হয়।

(৪) উক্ত ঘাত প্রতিঘাতের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে যে পরিবর্তন সাধিত হইতেছে সে সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়।

(৫) উক্ত জ্ঞান মানুষের বাস্তব জীবনেও প্রভূত উপকারে আসিয়া থাকে। পৃথিবীর কোন অংশে একটি কাজ অপর অংশ হইতে কি ভাবে অধিকতর উন্নতভাবে সম্পন্ন হইতেছে তাহা জানিয়া অপর অংশের অধিবাসিগণও তাহাদের নিজেদের কাজে উন্নতি লাভ করিতে পারে। যেমন আমাদের দেশে কৃষিকার্য এখনও অনুন্নত। জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ এ বিষয়ে অনেক উন্নত। উহাদের দেখিয়া আমাদের দেশে জাপানী পদ্ধতিতে ধান চাষের চেষ্টা চলিতেছে এবং অন্যান্য বিষয়েও বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করা হইতেছে। এক কালে আমাজান ও কঙ্গো অববাহিকা অঞ্চলের উপরই সকলে রবারের উপর নির্ভর করিত। কিন্তু মালয়ে ও ইন্দোনেশিয়াতে উপরিউক্ত জল বায়ুতে রবার চাষ আরম্ভ হওয়ার এ অঞ্চল এখন রবার উৎপাদনে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

(৬) কোন দেশে কি দ্রব্য প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন হয় এবং কোন দেশে উহা বিশেষ উৎপন্ন হয় না, জানা থাকিলে উক্ত জিনিসের আমদানি-রপ্তানি দ্বারা উভয় দেশই উপকৃত হইতে পারে।

(৭) ব্যবসা শিক্ষার সহিত অর্থনৈতিক ভূগোল শিক্ষাও অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে হইলে এবং নিজ দেশের প্রয়োজন মিটানোর জন্য বিদেশ হইতে পণ্য আমদানি করিতে হইলে বিভিন্ন দেশের পণ্য উৎপাদন, বণ্টন প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেবল মাত্র অর্থনৈতিক ভূগোলই এসম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দান করিতে পারে।

(৮) নাগরিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে অর্থনৈতিক ভূগোল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা অবশ্য কর্তব্য। দেশ বিদেশের অর্থনৈতিক সংবাদ জানা নাগরিক চেতনার খোরাক।

(৯ জ্ঞানার্জনের বিষয় হিসাবে এবং কার্যকরী বিজ্ঞান হিসাবে এই শাস্ত্রের অধ্যয়ন বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের জীবনযাত্রা প্রণালী এবং উহার পরিবেশ উভয়ই পরিবর্তনশীল। অর্থনৈতিক ভূগোল পাঠে আমরা এই পরিবর্তন অনুধাবন করিতে পারি এবং পরস্পরের অভিজ্ঞতা বিনিময় করিতে পারে। অধিকন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অর্থনৈতিক উন্নতির কিরূপ সম্ভাবনা আছে এবং ঐ সম্ভাবনার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া কি ভাবে পৃথিবীর ও সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ সাধন হইতে পারে সে সম্বন্ধেও অবহিত

হইতে পারা যায়। ইহা অতি সত্য কথা যে প্রাকৃতিক সম্পদের সম্যক ও সুষ্ঠু ব্যবহারের উপরেই সমগ্র মানব জাতির ভবিষ্যত কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। বর্তমানে প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক ভূগোলের শিক্ষার দ্বারাই চালিত হইতেছে। এই সকল কারণে দেশের প্রত্যেক কল্যাণ কামী ব্যক্তিরই অর্থনৈতিক ভূগোল পাঠ দ্বারা পৃথিবী ও নিজের দেশের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা অবশ্য কর্তব্য। কারণ এই জ্ঞান কার্যক্ষেত্রে প্রতিফলিত করা ভিন্ন দেশের ও দশের মঙ্গল লাভ কথনই সম্ভব হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাকৃতিক অঞ্চল

(Natural Regions)

Q. 1. What do you understand by 'Natural Regions'? Into how many natural regions can the world be divided? Name them and discuss the characteristics of such division.

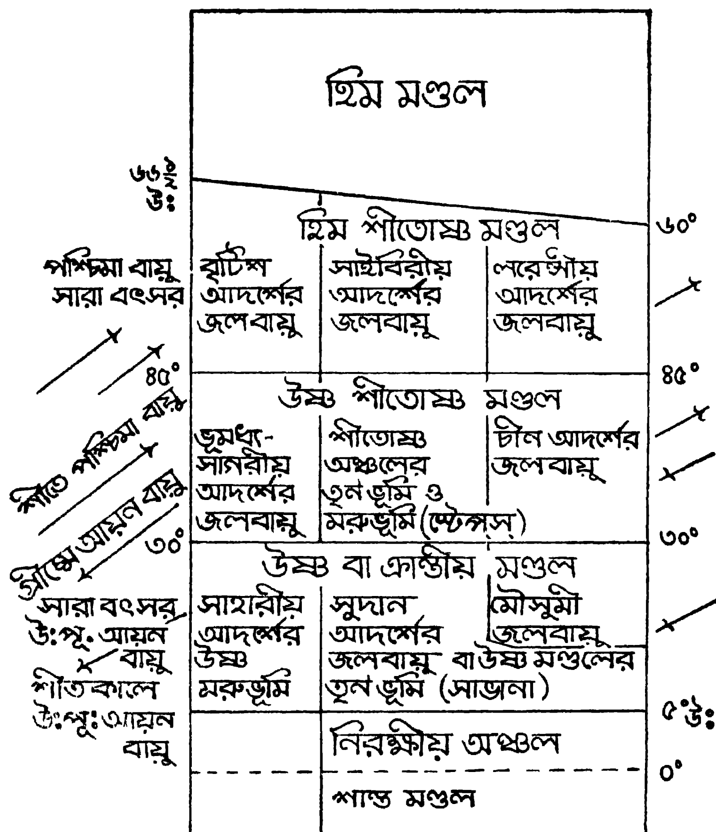
(প্রাকৃতিক অঞ্চল বলিতে কি বুঝ? পৃথিবীকে কয়টি প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা যাইতে পারে? উহাদের নাম কর এবং এরূপ বিভাগের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।)

Ans: পৃথিবীর সর্বত্র জলবায়ু একরূপ নহে। কিন্তু জলবায়ুর বিভিন্নতা সত্ত্বেও একাধিক অঞ্চলে একই প্রকার জলবায়ু দেখিতে পাওয়া যায়। জলবায়ুর এরূপ সাদৃশ্য হেতু ঐ সমস্ত অঞ্চলে জীবজন্তু, উদ্ভিদ সংস্থান ও মানুষের অর্থ নৈতিক উন্নতি প্রায় একরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। ভৌগোলিক বিচারের সুবিধার জন্য এরূপ অনুরূপ প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঞ্চলগুলিকে এক একটি নির্দিষ্ট বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই নির্দিষ্ট বিভাগের এক একটিকে একটি প্রাকৃতিক অঞ্চল (Natural Region) নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। অধ্যাপক হার্বার্টসনের মতে ভূ-পৃষ্ঠের যে অঞ্চলে অনুরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশের সমতাহেতু মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী ও কার্যধারা প্রায় একই প্রকারের সে অঞ্চলকেই 'প্রাকৃতিক অঞ্চল' বলে (an area of the earth's surface which is

essentially homogeneous with respect to the conditions that affect human life")।

পৃথিবীকে নিম্নলিখিত ১৩টি প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায় :

(১) নিরক্ষীয় অঞ্চল ; ২) সাভানা অঞ্চল ; (৩) মৌসুমী অঞ্চল , (৪) উষ্ণ



মরু অঞ্চল , (৫) ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল ; (৬) নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চল, (৭) নাতিশীতোষ্ণ মরু অঞ্চল ; (৮) চীন আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল ; (৯) বৃটিশ আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল , ১০) সাইবেরীয় আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল ; (১১) লরেন্সীয়

আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল; (১২) হিম মণ্ডল (তুন্দ্রা অঞ্চল); (১৩) পার্বত্য অঞ্চল।

প্রাকৃতিক অঞ্চলের আলোচনায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য:

(১) প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলিকে কোনও নির্দিষ্ট সীমারেখা দ্বারা পৃথক করা সম্ভব নয়। একটি বিভাগ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া অন্য বিভাগের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

(২) প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলি কোনও রাজনৈতিক সীমারেখা দ্বারাও চিহ্নিত নহে। একই দেশের মধ্যে একাধিক প্রাকৃতিক অঞ্চল থাকিতে পারে বা একাধিক দেশের মধ্যে একই প্রাকৃতিক অঞ্চল বিস্তৃত থাকিতে পারে।

(৩) জলবায়ুর ভিত্তিতে প্রধানতঃ এই বিভাগ সূচিত হইলেও একই বিভাগের মধ্যে জলবায়ুর কিছুটা তারতম্য হইতে পারে।

(৪) একই প্রাকৃতিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দুইটি পরবর্তী দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে স্থানীয় কারণে অল্প-বিস্তর ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতে পারে।

(৫) বস্তুতঃপক্ষে এই প্রাকৃতিক অঞ্চলের বিভাগগুলিতে জলবায়ুগত পার্থক্য-হেতু বৈসাদৃশ্য অপেক্ষা সাদৃশ্য অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়।

Q. 2. Discuss the importance of the study of Natural Regions.

(প্রাকৃতিক অঞ্চলের অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।)

Ans. 'প্রাকৃতিক অঞ্চল' অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে:

(১) প্রাকৃতিক অঞ্চলের অধ্যয়ন দেশের প্রত্যেক কল্যাণ-কামী ব্যক্তিরই অবশ্য কর্তব্য। ইহার অধ্যয়নে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রার সহিত উহার ভৌগোলিক পরিবেশের কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করা সম্ভব হয়। এই জ্ঞান দেশের উন্নতিমূলক কার্যধারার উপর প্রয়োগ করা চলে। কেননা একই প্রাকৃতিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইলেও বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বিভিন্নরূপ হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ—মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার সহিত ব্রেজিলের তুলনা করা চলে। ব্রেজিলের আমাজান অববাহিকা এবং মালয় ও ইন্দোনেশিয়া একই প্রাকৃতিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত মালয় ও ইন্দোনেশিয়ায় রবার উৎপাদন বিশেষ হইত না। অথচ ব্রেজিল এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রাকৃতিক অঞ্চলের অধ্যয়ন হেতু যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাহার ফলে কিছু দিন পূর্বে মালয় ও ইন্দোনেশিয়ায় রবারের চাষ আরম্ভ হয় এবং বর্তমানে ইহারা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ

রবার উৎপাদন স্থান। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চল সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকিলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পরস্পরের অভিজ্ঞতা যে বিনিময় করা চলে ইহা বলাই বাহুল্য।

(২) ইহা ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি শুধু পরিকল্পনা ভিন্ন বিলম্বিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইলে দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চল সম্বন্ধে জ্ঞান অপরিহার্য। যেমন কৃষির পরিকল্পনা সর্বতোভাবে প্রাকৃতিক অঞ্চলের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল।

(৩) লোক সংখ্যার চাপ কোন অঞ্চলে বৃদ্ধি পাইলে সে অঞ্চলের অনুরূপ জলবায়ু ভিন্ন স্থানে দেখা গেলে এবং সেখানে লোক বসতির চাপ কম থাকিলে বা অন্য কোন বাধা-বিপত্তি না থাকিলে সেখানে গিয়া লোক বসবাস করিতে পারে। বৃটিশ দ্বীপ-পুঞ্জ ও নিউজিল্যাণ্ডের জলবায়ু প্রায় অনুরূপ। এজন্য বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের অনেক অধিবাসী নিউজিল্যাণ্ডে গিয়া সুখে বসবাস করিতেছে।

Q 3 Discuss briefly the different kinds of 'Natural Regions' of the world

(পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক অঞ্চলের অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা দাও।)

An · পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

(১) **নিরক্ষীয় অঞ্চল (Equatorial Region) :** নিরক্ষ রেখার ৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে প্রধানত: এই অঞ্চল অবস্থিত। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূল ভাগ ও আমাজান অববাহিকা, আফ্রিকায় গিনি উপকূল ও কঙ্গো অববাহিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালয় ও ইন্দোনেশিয়া এই বিভাগের অন্তর্গত। সারা বৎসর ব্যাপী উচ্চ উত্তাপ (৮০° ফা।) এবং প্রবল বারিপাত (৮০" র অধিক) এ অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঋতুভেদে উত্তাপের তারতম্য ৫° র বেশী কম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রশস্ত পত্রযুক্ত বৃহদাকায় চিরহরিৎ অরণ্যই এ অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ। আবলুস মেহগনি, রবার, কোকো, তালগাছ, গাটাপাচা, নারিকেল, সাগু, ধান, ইক্ষু, সিঙ্কোনা তামাক মসলা, আনারস, কলা প্রভৃতি এ অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্য। নানা জাতীয় পাখী, বানর, বনমানুষ, গিরগিটি, সাপ, নানাপ্রকার কীটপতঙ্গ, প্রভৃতি এ অঞ্চলের জীবজন্তু। এখানকার গাছ, লতা, গুল্ম প্রভৃতির জন্য এত ঘন বনভূমির সৃষ্টি হয় যে উহা ভেদ করিয়া বৃহদাকার জীবজন্তুর পক্ষে চলাফেরা করা অসুবিধাজনক। রেড্ ইণ্ডিয়ান ও কঙ্গো অববাহিকার বামন জাতীয় লোক এ

অঞ্চলের আদিম অধিবাসী। আমাজন অববাহিকায় এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য পূর্ণ মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে 'আমাজন জলবায়ুর অঞ্চলও' বলা হয়। এ অঞ্চলের গাছের পাতা ও ডালপালা উপরের দিকে এরূপ ঘনসন্নিবিষ্ট যে সূর্য্যালোক ইহার অভ্যন্তর ভাগে ঠিকমত প্রবেশ করিতে পারে না। এজন্য মধ্যাহ্নেও এ অঞ্চল সন্ধ্যার মত মনে হয়। তাই ইহাকে 'গোধূলি অঞ্চল (Region of Twilight) বলা হয়। এ অঞ্চলের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর, মানসিক উন্নতির অন্তরায় এবং অলসতা বৃদ্ধির সহায়ক। এজন্য ইহা 'শক্তিহীনতার অঞ্চল' (Region of Debilitation) বলিয়াও পরিচিত। ইহা ছাড়া জীবজন্তুর ও পোকামাকড়ের উৎপাত এবং রাস্তাঘাট নির্মাণের অসুবিধাও যথেষ্ট আছে। বন্য ফলমূল আহরণ, পশু শিকার প্রভৃতি অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। শুধু মাত্র মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার জলবায়ু কিছুটা স্বাস্থ্যকর এবং এখানে জীবিকা অর্জনের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা বর্তমান। এখানে টিন, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি খনিজ সম্পদও আছে। ফলে এখানে লোক-বসতি ঘন।

(২) **সাভানা অঞ্চল (Savannah Region):** নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে ৫ হইতে ১৫ অক্ষাংশের মধ্যে প্রধানতঃ এই অঞ্চল অবস্থিত। দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা ও ব্রেজিলের কিছু অংশ, আফ্রিকার নাইজিরিয়া, সুদান, উগাণ্ডা, কেনিয়া, টাঙ্গানিকা, নিয়াসাল্যাণ্ড, এঙ্গোলা, উত্তর রোডেসিয়া এবং উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার কিয়দংশ ইহার অন্তর্গত। উষ্ণ (৯০ ফা) ও স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত (১৫"—৩০") গ্রীষ্মকাল এবং অপেক্ষাকৃত শীতল (৫০—৬০ ফা.) ও শুষ্ক (বৃষ্টিপাতহীন) শীতকাল ইহার জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। বৃক্ষ সমন্বিত তৃণভূমিই এ অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ।

এই তৃণভূমি আফ্রিকায় 'সাভানা' (Savannah), দক্ষিণ আমেরিকায় ভেনেজুয়েলাতে 'ল্যানোস' (Llanos) ও ব্রেজিলে 'ক্যামপস' (Campos) এবং দক্ষিণ আফ্রিকার রোডেসিয়ায় পার্কল্যাণ্ড (Park land) বলা হয়। হরিণ, জিরাফ, জেব্রা, ক্যাঙ্গারু, সিংহ, ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ প্রভৃতি জীবজন্তু, এমু, অষ্ট্রিচ প্রভৃতি পাখী এবং নানা প্রকার কীটপতঙ্গের এখানে বাস। এখানকার যাতায়াত ব্যবস্থা এখনও অনুন্নত। জলবায়ুও খুব স্বাস্থ্যকর নহে। এজন্য লোক বসতি কম। অধিবাসীরা প্রধানতঃ যাযাবর। পশুপালন ও পশুশিকার ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ভূট্টা, বাজরা, কার্পাস, কফি, চীনাবাদাম, তৈলবীজ, ইক্ষু, তামাক প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব হইলেও লোক বসতি বিরল বলিয়া কৃষিকার্য্য উন্নত হইতে পারে নাই। উপযুক্ত পরিশ্রম করিলে ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া ইহাকে 'পরিশ্রমের অঞ্চল' (Region of effort) বলা চলে।

(৩) **মৌসুমী অঞ্চল (Monsoon Region) :** ইহাও প্রধানতঃ ৫°—১৫° অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। ভারত, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, দক্ষিণ চীন, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর পশ্চিমাংশ, মধ্য আমেরিকার কিছু অংশ, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশ, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকায় পূর্ব উপকূল, মাদাগাস্কার, আবিসিনিয়া প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। উষ্ণ (৮০ —৯০ ফা) ও আর্দ্র (৪০"—৮০) গ্রীষ্মকাল এবং শুষ্ক ও শীতল (৬০ ফা) শীতকাল এই অঞ্চলের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। এ অঞ্চলের ভূমি উর্বর। এজন্য শাল, সেগুন, চন্দন, তাল, বাঁশ, কাঁঠাল, আম, জাম প্রভৃতি স্বাভাবিক উদ্ভিদের সমাবেশ সত্ত্বেও ধান, পাট, ইক্ষু, চা, কফি, গম, যব, বাজরা, জোয়ার, তৈলবীজ, তামাক, রেশম, নীল, ডাল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। গো, মেষ, মহিষ, হস্তী, চিতা, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি এ অঞ্চলের জীবজন্তু। কৃষিকার্যে লিপ্ত থাকিয়া বহু লোক এখানে বসবাস করিয়া থাকে। এজন্য এখানে লোকবসতি ঘন। ভূমির অত্যধিক উর্বরতার দরুণ ইহা 'বর্দ্ধিষ্ণু অঞ্চল' (Region of Increment) নামে অভিহিত। কৃষির উপর অত্যধিক লোকের চাপ বলিয়া অধিবাসীদের অনেকেই দরিদ্র এবং এজন্য কৃষির বৈজ্ঞানিক উন্নতি অপেক্ষাকৃত কম। অধিবাসীদের দারিদ্রের জন্য এখনও আশানুরূপ শিল্পোন্নতি হয় নাই।

(৪) **উষ্ণ মরু অঞ্চল (Hot Desert Region)** ১৫ হইতে ৩০ অক্ষাংশের মধ্যে মহাদেশগুলির পশ্চিমাংশে এই অঞ্চল অবস্থিত। উত্তর আফ্রিকায় সাহারা, দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারি, উত্তর আমেরিকার কলোরাডো ও মেক্সিকো, দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা, এশিয়ার আরব ও থর এবং পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমি এই বিভাগের অন্তর্গত। অতি উষ্ণ (৯৫ ফা) ও শুষ্ক (বৃষ্টিপাত ১০") গ্রীষ্মকাল এবং শীতল (৬০ ফা) ও শুষ্ক শীতকাল এ অঞ্চলের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। পাম্থপাদপ, খেজুর ও নানা জাতীয় কাঁটাগাছ ভিন্ন অন্যান্য স্বাভাবিক উদ্ভিদ সৃষ্টির পক্ষে জলবায়ু আদৌ অনুকূল নহে। কৃত্রিম জলসেচের সাহায্যে কোন কোন স্থানে সামান্য পরিমাণ গম, ভূট্টা, বাজরা, কার্পাস, ইক্ষু, ধান প্রভৃতি চাষ হইতেছে। কৃষিকার্যের বিশেষ অসুবিধা ও জলাভাবের জন্য লোক বসতি বিরল। অধিবাসীদের অধিকাংশ যাযাবর এবং উট, ছাগ, ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি জন্তু পালন উহাদের প্রধান উপজীবিকা। এরূপ চরমভাবাপন্ন জলবায়ু, বালুকাময় ভূমিভাগ ও বৃষ্টিপাতের অভাবহেতু ইহাকে 'চিরদুঃখময় অঞ্চল (Region of lasting difficulty) বলা হয়। এই মরু অঞ্চলের মধ্যে পেরুর ও মধ্য প্রাচ্যের তৈল, চিলির নাইট্রেট ও তাম্র, কালাহারির হীরক, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্ণ এবং সাহারার লবণ উল্লেখযোগ্য।

(৫) **ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল** (**Mediterranean Region** : মহাদেশগুলির পশ্চিমাংশে ৩০° হইতে ৪৫° অক্ষাংশের মধ্যে এই অঞ্চল অবস্থিত। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্সের দক্ষিণাংশ, ইতালি, বল্কান রাষ্ট্র সমূহ, লিবিয়া ও উত্তর আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকার কালিফোর্ণিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যচিলি, দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। উষ্ণ (৭০ ফা) ও আর্দ্র ২০"-৩০') শীতকাল ইহার জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। এরূপ জলবায়ু চেষ্টনাট, সিডার ওক, কর্ক, ও তুঁত প্রভৃতি বৃক্ষ এবং কমলা, জলপাই, লেবু, আঙ্গুর, পীচ, ন্যাসপাতি, খুবানি, কিসমিস, আখরোট ডুমুর, বাদাম, আপেল প্রভৃতি ফল উৎপাদনের আদর্শস্থল। জলসেচনের সাহায্যে গম, যব, ভূট্টা, ধান কার্পাস প্রভৃতির চাষও হইয়া থাকে। গো মেষ, অশ্ব, ছাগ, শূকর প্রভৃতিও পালিত হইয়া থাকে। প্রকৃতির কৃপায় এ অঞ্চলের অধিবাসীরা সহজেই জীবিকা অর্জনের উপায় খুঁজিয়া লইতে পারে। এজন্য লোক বসতি ঘন। অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি উন্নত। প্রাচীনকালে গ্রীক, রোমান ও আসিরীয় সভ্যতা ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী অঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। জীবনধারণের উপায় সহজ লভ্য হওয়ায় বৃহৎ শিল্প বিশেষ গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। নানাপ্রকার ফলের সংরক্ষণ, ময়দা ও বিস্কুট উৎপাদন, মদ সাবান রেশম প্রভৃতি শিল্প এখানে উন্নতিলাভ করিয়াছে।

(৬) **নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চল** (**Temperate Grassland Region**): ৩৫ হইতে ৪৫ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত মহাদেশগুলির অভ্যন্তরে এই অঞ্চল অবস্থিত। রাশিয়ার দক্ষিণাংশ, পোলাণ্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী ও জার্মানির কিয়দংশ, সাইবেরিয়ার দক্ষিণাংশ, মঙ্গোলীয়া, মাঞ্চুরিয়া, উত্তর আমেরিকার মধ্যাংশের নিম্নভূমি, দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ আফ্রিকার মালভূমি এবং অষ্ট্রেলিয়ার মারে-ডার্লিং অববাহিকা এই বিভাগের অন্তর্গত। স্থানভেদে এই তৃণভূমি বিভিন্ন নামে পরিচিত। ইহাকে উত্তর আমেরিকায় প্রেইরি (Prairie), দক্ষিণ আমেরিকায় 'পামপাস' (Pampas) এশিয়ায় স্তেপ্‌স (Steppes), আফ্রিকায় 'ভেল্ড' (Veld) এবং অষ্ট্রেলিয়ায় 'ডাউনস' (Downs) বলা হয়। এখানকার জলবায়ু চরম ভাবাপন্ন। স্বল্পস্থায়ী উষ্ণ (৭০°-৭৫) ও আর্দ্র (১০-৩০") গ্রীষ্মকাল এবং দীর্ঘস্থায়ী শীতল (৩০-৪০° ফা,) ও শুষ্ক শীতকাল এ অঞ্চলের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। এরূপ জলবায়ু বৃক্ষহীন তৃণভূমি উৎপাদনের আদর্শস্থল। গম যব, ওট রাই, ভূট্টা, বীট প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে 'পৃথিবীর শস্যভাণ্ডার' (Granaries of the world) আখ্যা দেওয় হয়। গরু, মেষ, গাধা, ঘোড়া, নেকড়ে,

হায়না প্রভৃতি এ অঞ্চলের জীবজন্তু। যাযাবর বৃত্তি ও পশুপালন অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। কৃষিকার্যের উন্নতি হওয়ায় স্থায়ী অধিবাসীও অনেক আছে। এ অঞ্চল শিল্পে অনুন্নত। কৃষি ও পশুজাত দ্রব্য রপ্তানি এ অঞ্চলের প্রধান ব্যবসা।

(৭). **নাতিশীতোষ্ণ মরু অঞ্চল (Temperate Desert Region) :** নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে মহাদেশগুলির অভ্যন্তর ভাগের উচ্চভূমিগুলি এই বিভাগের অন্তর্গত। এশিয়া মাইনর, আরব, ইরান, আফগানিস্থান, তিব্বত, গোবি, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি মালভূমি, উত্তর আমেরিকার রকি পার্বত্য অঞ্চলের অভ্যন্তরভাগ ও দক্ষিণ আমেরিকার পাটাগোনিয়া মালভূমি ইহার অন্তর্গত। গ্রীষ্মে অতি উচ্চ উত্তাপ (৯০° ফা,) ও অতিস্বল্প বৃষ্টিপাত (৫"-১০") এবং শীতকালে অত্যধিক শীত (৩০) ও তুষারপাত এ অঞ্চলের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। স্বল্প বৃষ্টিপাতে নিকৃষ্ট তৃণ ও সামান্য কাঁটাগাছ জন্মিয়া থাকে। জল সেচনের সুবিধাযুক্ত স্থানে কিছু গম, যব, ভূট্টা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। উট, উটপাখী, ঘোড়া, গাধা, গরু, মেষ প্রভৃতি প্রতিপালিত হয়। জনবসতি বিরল। ইহার কোন কোন স্থানে খনিজ লবণ, লবণাক্ত সার প্রভৃতি পাওয়া যায়। অধিবাসীরা যাযাবর। পশুপালন ও খনিজ দ্রব্য সংগ্রহ ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। এখানে জীবনযাত্রা খুবই আয়াস সাধ্য। এজন্য ইহাকেও 'চিরদুঃখময় অঞ্চল' (Region of lasting difficulty) বলা হয়।

(৮) **চীন আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল (China type of Climatic Region) :** ভূমধ্যসাগরের প্রায় সম অক্ষাংশে (৩০°-৪৫°) মহাদেশগুলির পূর্বাংশে এই অঞ্চল অবস্থিত। উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্বাংশ, দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়ে এবং ব্রজিলের দক্ষিণ-পূর্বাংশ, চীনের উত্তর ও মধ্যাংশ, জাপানের দক্ষিণাংশ, আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্বাংশ (নাটাল) এবং অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাংশ (নিউসাউথ ওয়েলস ও ভিক্টোরিয়া) এই বিভাগের অন্তর্গত। উষ্ণ (৮০° ফা) ও আর্দ্র (৪০") গ্রীষ্মকাল এবং শুষ্ক ও শীতল (৪০° ফা.) শীতকাল ইহার জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। তাল, বাদাম, ওক. বীচ, কর্পূর, ফার্ণ, তুঁতগাছ প্রভৃতি এ অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ। কৃষিজাত দ্রব্যাদির মধ্যে ধান, গম, ভূট্টা, তামাক, চা, ইক্ষু, কার্পাস, রেশম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাঘ, ভল্লুক, হরিণ, গরু, শূকর, ঘোড়া, প্রভৃতি এ অঞ্চলের জীবজন্তু। কৃষিকার্য্যও এ অঞ্চলের প্রধান উপজীবিকা। দক্ষিণ গোলার্ধে পশুপালনও উল্লেখযোগ্য। কার্পাস, রেশম, চামড়া ও পশম সংক্রান্ত শিল্পও এখানে উন্নত। এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতির বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

(৯) **বৃটিশ আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল (British type of Climatic Region) :** ৪০° হইতে ৫৫° অক্ষাংশের মধ্যে মহাদেশগুলির পশ্চিমপ্রান্তে এই অঞ্চল অবস্থিত।



পৃথিবীর প্রাকৃতিক বিভাগ

ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমাংশ (বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জসহ), কানাডার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিমাংশ, দক্ষিণ চিলি, টাসমানিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণাংশ এই বিভাগের অন্তর্গত। শীত-গ্রীষ্মে স্বল্পতাপ (৪০-৬০° ফা) এবং সারাবৎসর ব্যাপী বৃষ্টিপাত (৪০"-৫০") এ অঞ্চলের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। উপকূলের পার্বত্য অংশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক বেশী (১০০" র অধিক) দেখা যায়। ওক, ম্যাপেল, এলম, বীচ, বার্চ প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষ এবং উচ্চ ভূমিতে পাইন এ অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ। গম, যব, ওট, রাই, বিট, আলু, ভূট্টা প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য এবং আপেল, ন্যাসপাতি প্রভৃতিও ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। শূকর, গরু, ভেড়া, ঘোড়া এখানে প্রতিপালিত হয়। শীত-গ্রীষ্মের কঠোরতা নাই বলিয়া এখানকার অধিবাসীরা উদ্যমশীল ও পরিশ্রমী। ইহার ফলে এ অঞ্চলে শ্রমশিল্পেরও সমধিক প্রসার লাভ হইয়াছে। গো-মেষাদি প্রতিপালন, দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবসা, মৎস্য শিকার প্রভৃতিও প্রসার লাভ করিয়াছে। এখানকার লোক বসতি ঘন এবং এক কথায় বলিতে গেলে নানা বিষয়ে উন্নত।

(১০) **সাইবিরীয় আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল** (Siberian type of Climatic Region) ৫৫ হইতে ৬৫ অক্ষাংশের মধ্যে এ অঞ্চল অবস্থিত। আলাস্কা, কানাডা, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া, ফিনল্যাণ্ড, রাশিয়ার উত্তরাংশ এবং দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণাংশ ইহার অন্তর্গত। এখানে শীত দীর্ঘস্থায়ী এবং গ্রীষ্ম অল্পকালস্থায়ী। গ্রীষ্মের উত্তাপ ৭০ ফা এবং শীতের তাপ-৯০ ফা পর্যন্ত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সাধারণতঃ ২০"। পাইন, ফার, হেমলক, ডিল, লার্চ, স্প্রুস প্রভৃতি সরল বর্গীয় নরম কাঠের বৃক্ষ এ অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ। শ্বেত শৃগাল, শ্বেত ভল্লুক, খরগোস, এরমিন, সেবল প্রভৃতি সাদা বা ধূসর বর্ণের লোমশ জন্তু এখানে দেখা যায়। এ অঞ্চল কৃষিকার্য্য এবং অন্যান্য পশুপালনের বিশেষ উপযুক্ত নহে। ইহার দক্ষিণাংশে সামান্য রাই, ওট, যব উৎপন্ন হয় এবং গো-মেষাদি প্রতিপালিত হয়। এ অঞ্চল কাষ্ঠ ব্যবসা, অরণ্যজাত দ্রব্য ও পশুর লোম সংগ্রহের জন্য উল্লেখযোগ্য। তবে এখানে কাগজ, কৃত্রিম রেশম ও কাষ্ঠ সংক্রান্ত শিল্পেরও উন্নতি দেখা যাইতেছে।

(১১) **লরেন্সীয় বা মাঞ্চুরীয় আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল** (Laurentian or Manchurian type of climatic Region). ৪০° হইতে ৫৫° অক্ষাংশের মধ্যে মহাদেশগুলির পূর্বপ্রান্তে এই অঞ্চল অবস্থিত। কানাডার দক্ষিণ-পূর্বাংশ, যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাংশ, জাপানের ও মাঞ্চুরিয়ার উত্তরাংশ এবং আর্জেন্টিনার দক্ষিণ-পূর্বাংশ এই বিভাগের অন্তর্গত। এখানকার জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। এখানে গ্রীষ্মের

উত্তাপ ৭০° ফা এবং শীতের তাপ হিমাঙ্কের নীচে (৩০°) দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে এখানে শীত গ্রীষ্মের কঠোরতা বেশী। এ অঞ্চলে সারাবৎসর বৃষ্টিপাত (২০"-৪০") হয়। শীতকালে তুষারপাতও হয়। ওক, ফার, পাইন, স্প্রুস প্রভৃতি বৃক্ষ ইহার স্বাভাবিক উদ্ভিদ। গম, যব, ওট, রাই, ভূট্টা, সয়াবীন, আলু, বীট প্রভৃতির চাষও হইয়া থাকে। মেষ, শূকর, গরু প্রভৃতি পালিত হয় এবং বনে দীর্ঘ লোমযুক্ত সাদা বা ধূসর বর্ণের ভল্লুক, সেবল ও এরমিন দেখিতে পাওয়া যায়। এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাংশ ভিন্ন লোকবসতি বেশী নহে। যুক্তরাষ্ট্রের এই অঞ্চলের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য অন্যান্য অংশের তুলনায় বিশেষ উন্নত। অন্যান্য অংশে কাষ্ঠ সংগ্রহ, পশুশিকার, মৎস্য শিকার ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবসা উল্লেখযোগ্য উপজীবিকা। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং মনুষ্যবাসের উপযোগী।

(১২) **তুন্দ্রা অঞ্চল** (Tundra Region) : ৬৫ হইতে ৭৫° অক্ষাংশের মধ্যে এই অঞ্চল অবস্থিত। উহার ঊর্ধ্ব অক্ষাংশে জনমানবহীন তুষার মরু। উত্তর গোলার্ধের উত্তর কানাডা, উত্তর আলাস্কা, গ্রীণল্যাণ্ড, স্পিটস্‌বার্জেন, নরওয়ে ও সুইডেনের উত্তরাংশ সাইবেরিয়া ও রাশিয়ার উত্তরাংশ ও সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণ গোলার্ধের এণ্টার্টিকা ভূভাগ এই বিভাগের অন্তর্গত। তীব্র শীতযুক্ত দীর্ঘস্থায়ী শীতকাল (সবসময়ে ৫০ ফা এর নীচে) এবং ক্ষণস্থায়ী গ্রীষ্মকাল (৬০-৭০ ফা) ইহার জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। গ্রীষ্মে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। বৎসরের অধিকাংশ সময় বরফাবৃত থাকে। বৃষ্টিপাতের পরিবর্তে তুষারপাতও হয়। শৈবাল, তৃণ, গুল্ম ও নানা জাতীয় ফুল ইহার স্বাভাবিক উদ্ভিদ। শ্বেতভল্লুক, মেরু শৃগাল, বল্গাহরিণ মেরু খরগোস, শ্লেজকুকুর, সীল, সিন্ধুঘোটক, তিমি প্রভৃতি এ অঞ্চলের জীবজন্তু। এস্কিমো, ল্যাপ, ফিন, সামোয়েদ প্রভৃতি জাতির লোকগণ পশুপালন ও জীবজন্তু শিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। জীবন যাপন অতীব কঠোর বলিয়া ইহাকেও চিরকষ্টময় অঞ্চল (Region of Privation) বলা হয়।

(১৩) **পার্বত্য অঞ্চল** (Mountain Regions) : নিরক্ষীয় অঞ্চল হইতে তুন্দ্রা অঞ্চল পর্যান্ত যে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু ও উদ্ভিদ্‌ সংস্থান দেখিতে পাওয়া যায় উচ্চ পর্বতের পাদদেশ হইতে উহার সুউচ্চ অংশ পর্য্যন্ত অনেকক্ষেত্রে অনুরূপ জলবায়ু ও উদ্ভিদ সংস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ভূপৃষ্ঠ হইতে ক্রমশঃ উপরদিকে গড়ে প্রতি ৩০০ ফুট উচ্চতার জন্য ১ ফাঃ হিসাবে তাপ কমিতে থাকে। এজন্য আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত কিলিমাঞ্জারোতে ১৮০০০ ফুট উচ্চ অংশে তুন্দ্রা অঞ্চলের অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। আবার দক্ষিণ আমেরিকার কিটো সহর নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও ৯০০০ ফুট উচ্চতার জন্য সেখানে চিরবসন্ত বিরাজমান।

আমাদের হিমালয় পর্বতেও নিরক্ষীয় অঞ্চল ও তুন্দ্রা অঞ্চলের মধ্যবর্তী ক্রম-পরিবর্তনশীল জলবায়ু ও উদ্ভিদ দৃষ্টিগোচর হয়। বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, জীবজন্তু, বনজসম্পদ, চা, সিঙ্কোনা, ধান, কার্পাস, কমলালেবু ইত্যাদি উৎপন্ন হইলেও যাতায়াত ব্যবস্থা অনুন্নত থাকায় উহার বিভিন্ন সম্পদ এখনও ঠিকমত কাজে লাগান সম্ভব হইতেছে না।

Q. 4 Describe the climate of the Equatorial Region. Indicate the different types of agriculture and agricultural products in such a climatic region. (H. S. 1961)

(নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলবায়ু বর্ণনা কর। এরূপ জলবায়ুর বিভিন্ন প্রকার কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্যের বিবরণ দাও)।

Ans. নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী আমাজন অববাহিকা অঞ্চল, কঙ্গো অববাহিকা ও গিনি উপকূল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যে জলবায়ু দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে নিরক্ষীয় জলবায়ু (Equatorial climate) বলে। এই জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ।

(১) নিরক্ষীয় অঞ্চলে উষ্ণতা সর্বদাই অধিক। কারণ অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানে সূর্য্য কিরণ অপেক্ষাকৃত অধিক লম্বভাবে পতিত হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে এক একর জমি ৪০° অক্ষাংশে অবস্থিত এক একর জমি অপেক্ষা শতকরা ২৬ ভাগ বেশী উত্তাপ গ্রহণ করে।

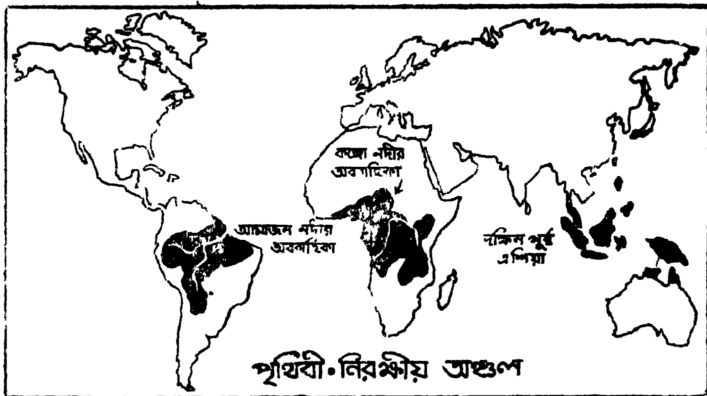
(২) এ অঞ্চলে বার্ষিক গড় উত্তাপ ৭৫ হইতে ৮০ ফা এর মধ্যে। দৈনিক উত্তাপের পার্থক্য কখনও ২০° ফা এর বেশী হয় না। উষ্ণতম ও শীতলতম মাসের মধ্যে উত্তাপের পার্থক্য অপেক্ষা দিন ও রাত্রির মধ্যে উত্তাপের পার্থক্য বেশী। এজন্য এখানকার শীতকাল রাত্রি (nights are the winters of tropics)।

(৩) যদিও এই অঞ্চলের গড় উষ্ণতা সর্বাধিক, কিন্তু ইহাই পৃথিবীর উষ্ণতম অঞ্চল নহে। ইহার সর্বোচ্চ উষ্ণতা ১০০° ফা এর বেশী এবং সর্বনিম্ন উষ্ণতা ৭০° ফা. এর কম হয় না।

(৪) সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে উচ্চতার দরুণ অবশ্য তাপ গড়ে ৩০০ ফুটে ১ ফা. হিসাবে কমিয়া যায়। ইকুয়েডরের কিটো সহর এই অঞ্চলে অবস্থিত। ইহা সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৯০০০ ফুট উচ্চ। ইহার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। এখানকার গড় উষ্ণতা ৫৫° ফা. এবং শীত ও গ্রীষ্মের উত্তাপের পার্থক্য ১° ফা.। এইস্থান

ইউরোপীয়দের বাসের উপযুক্তস্থান। ইহার মনোরম জলবায়ুর জন্য ইহাকে 'চির বসন্তের স্থান' (Land of Eternal Spring) বলা হয়।

(৫) সিঙ্গাপুরের মত সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানে সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ুর প্রভাবে জলবায়ু মৃদু ও আরামদায়ক এবং এই অঞ্চলের অভ্যন্তর ভাগের জলবায়ু মোটেই সুখদায়ক নহে, বরং গুমট ও অস্বাস্থ্যকর এবং শক্তিহীনতা ও মানসিক দৌর্বল্যের সৃষ্টি করে (enervating and degrading)।



পৃথিবী-নিরক্ষীয় অঞ্চল

(৬) এ অঞ্চলে সারাবৎসরই বৃষ্টিপাত হয়। অত্যধিক উষ্ণতা হেতু এখানে নিম্নচাপ ও শান্তবলয় (Belt of Calm or Doldrums)। তজ্জন্য এখানে পরিচলন্-জনিত বৃষ্টিপাত (Convectional rains) হয়। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ু এখানে আসিয়া ঊর্ধ্বগামী হয়। এই ঊর্ধ্বগামী বায়ু উপরের শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া ঘণীভূত হইয়া বারিকণায় পরিণত হয় এবং বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই বায়ু পথিমধ্যে বিভিন্ন সাগর ও মহাসাগর হইতে প্রচুর জলীয় বাষ্পও বহন করিয়া থাকে। ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রচুর হয়। এখানকার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৮০"-১০০"। সারাবৎসর বৃষ্টিপাত হইলেও মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসে দুইবার নিরক্ষরেখার নিকটে, জুনমাসে উহার উত্তর দিকে এবং ডিসেম্বর মাসে উহার দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত বেশী বৃষ্টি হয়। আবার অধিকাংশ দিনে এখানে দুপুরের দিকে আকাশ ঘন কৃষ্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হয় এবং বিকালের দিকে বিদ্যুৎও বজ্রপাতের সহিত বৃষ্টিপাত হয়। অভ্যন্তর ভাগ অপেক্ষা উপকূল ভাগে বৃষ্টির পরিমাণ বেশী। ইকুয়েডরের মত

উষ্ণস্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। এরূপ সারাবৎসর ব্যাপী বৃষ্টিপাত জলবায়ুর উষ্ণতাকে অনেকটা হ্রাস করে।

কৃষি: সমগ্রভাবে এ অঞ্চলের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর হইলেও এ অঞ্চল পৃথিবীর বনজাত দ্রব্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার। সামান্য আয়াসে এখানে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যশস্য উৎপন্ন করা যায়। জনবিরলতার জন্য এখানে কৃষি ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করিতে পারে নাই। তাহা ছাড়া বন পরিষ্কার করিয়া ব্যাপকভাবে কৃষিকার্য্য করা এখনও সম্ভব হয় নাই। বন পরিষ্কৃত অঞ্চলে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য ভূমি-ভাগ বেশী ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং উহার উর্বরতা হ্রাস করে এজন্য এখানে কৃষিকার্য্য অনেকটা সহজ ও সরল উপায়ে অনুষ্ঠিত হয়। অরণ্যের প্রান্তভাগ পরিষ্কার করিয়া যাহাতে অতি শীঘ্র গাছপালা গজাইয়া না উঠে সেজন্য উহা আগুনে পোড়াইয়া বৃক্ষ-তৃণহীন করিয়া লওয়া হয়। ইহার পর শলাকা বা অনুরূপ কোন যন্ত্রাদি দ্বারা মাটিতে গর্ত করিয়া তাহাতে বীজ ঢালিয়া মাটি চাপা দেওয়া হয়। এই প্রথাকে 'ঝুম চাষ বা ইংরাজীতে Milpa Agriculture বলে। পরে শস্য হইলে ও পাকিলে কাটিয়া লওয়া হয় এবং সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে পূর্ব প্রণালীতে শস্য রোপন করা হয়। কোন কোন স্থলে অবশ্য উন্নত ধরনের চাষ আবাদও বর্তমানে হইতেছে।

রবার এ অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ইহা পূর্বে অধিকাংশই বনজাত দ্রব্য হিসাবেই সংগৃহীত হইত। বর্তমানে উন্নত ধরনের কৃষি-পদ্ধতিতে ইহার চাষ প্রসার লাভ করিয়াছে এবং আবাদী রবারের উৎপাদন বন্য রবার উৎপাদন অপেক্ষা অনেক বেশী। অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান, কলা, ভুট্টা, তাল, কোকো, চা, ইক্ষু, আনারস, কফি, মসলা, সিঙ্কোনা, সাগু, নারিকেল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

Q 5 Describe and account for the characteristics of climate of the region where evergreen forests are the prevailing natural vegetation. (C U. Inter. 1958).

(চির সবুজ বনভূমি যে অঞ্চলের প্রধানতঃ স্বাভাবিক উদ্ভিদ সে অঞ্চলের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর এবং উক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণ নির্ণয় কর।)

Ans. **নিরক্ষীয় অঞ্চলেই প্রধানতঃ চির-সবুজ বনের স্বাভাবিক উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়। এ অঞ্চল দীর্ঘকাণ্ডযুক্ত ডালপালা সমন্বিত বৃক্ষরাশি দ্বারা আচ্ছন্ন।**

এ অঞ্চলের জলবায়ুর প্রকৃতিই এ অঞ্চলের এরূপ উদ্ভিদ সংস্থানের জন্য দায়ী। নিম্নে উক্ত জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য প্রদত্ত হইল :

See for the rest of the answer Q. 4 (জলবায়ুর অংশ)

Q 6. Explain why :

a) In the Mediterranean region most of the rains fall in winter months.

(b) Human life in the Equatorial region has not made much progress in economic sphere.

(c) In polar region, people are nomads.

(d) River valleys of monsoon region are the most densely populated areas of the World. (H. S, 1960).

কারণ নির্ণয় কর ঃ

(ক) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশীরভাগ শীতকালে হয়।

(খ) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিরক্ষীয় অঞ্চলের মানবজীবন বিশেষ উন্নত নহে।

(গ) হিমমণ্ডলে লোকেরা যাযাবর।

(ঘ) মৌসুমী অঞ্চলের নদী উপত্যকাগুলিতে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী লোক বাস করে।)

A s (ক) গ্রীষ্ম এবং শীতকাল যথাক্রমে সূর্যের উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়নের সময়। সূর্যের এই উভয়বিধ আয়নের ফলে কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির নিকটবর্তী নিম্নচাপ বলয় সূর্যের আপাতগতির ফলে কিছুটা উত্তরে এবং দক্ষিণে সরিয়া যায়। ফলে ৩০ ও ৪৫ অক্ষাংশে অবস্থিত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহের এমন এক পরিবর্তন ঘটে যাহার ফলে গ্রীষ্মকালে শুষ্ক আয়ন বায়ুর (Trade winds) এবং শীতকালে জলকণাবাহী পশ্চিমাবায়ুর (Westerlies) প্রভাব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আসিয়া পড়ে। গ্রীষ্মকালে শুষ্ক আয়ন বায়ু স্থল ভাগ হইতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয় বলিয়া জলকণাবিহীন এবং উক্ত বায়ুর প্রভাবে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয় না কিন্তু শীতকালে সমুদ্র হইতে আগত বায়ু স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। উক্ত বায়ু জলকণাপূর্ণ থাকে। ফলে এই বায়ুর প্রভাবে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়।

(খ) নিরক্ষীয় অঞ্চলে উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত উভয়ই খুব বেশী। অত্যধিক বৃষ্টি-

পাতের জন্য ইহা ঘন বনে আচ্ছন্ন। এই বনাচ্ছন্ন অঞ্চল প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং নানাবিধ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বেষ্টিত। এজন্য নিরক্ষীয় অঞ্চল অস্বাস্থ্যকর এবং নানাপ্রকার রোগের উৎস। ইহা ছাড়া অত্যধিক ভূমিক্ষয়, বন্যজন্তুর ও পোকা-মাকড়ের উৎপাত, অনুন্নত ও হিংস্র প্রকৃতির আদিম অধিবাসী, অত্যধিক আগাছার উৎপাদন, গৃহপালিত পশুর অভাব, যাতায়াতের অসুবিধা, বিরল বসতি ও শ্রমিকের অভাব প্রভৃতি কারণে অর্থনৈতিকক্ষেত্রে মানুষ এখানে বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছে না।

(গ) হিমমণ্ডল বরফাবৃত। শৈবাল, গুল্ম ও ছোট ছোট ফুলের গাছ ভিন্ন অন্য কোন উদ্ভিদ এখানে জন্মে না। এজন্য এখানে স্থায়িভাবে বসবাস করিয়া কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব নহে। তবে এ অঞ্চলে বল্গা হরিণ, স্লেজ কুকুর, শ্বেত ভল্লুক, মেরু শৃগাল, মেরু খরগোস প্রভৃতি জন্তু এবং জলে সিল, তিমি, সিন্ধুঘোটক প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এ অঞ্চলের অধিবাসীদের খাদ্যের অন্বেষণে ইতঃস্ততঃ বিচরণ, পশুশিকার, পশুপালন প্রভৃতি যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়।

(ঘ) উত্তরের জন্য জনসংখ্যার অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

*** Q. 7. What is a monsoon climate? Which countries of Asia experience this climate? Describe the characteristic vegetation of one such country. (C. U. Inter. 1959)**

(মৌসুমী জলবায়ু কাহাকে বলে? এশিয়ার কোন কোন দেশে এই জলবায়ু দেখিতে পাওয়া যায়। এ অঞ্চলের একটি দেশের উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।)

Ans. মৌসুমী শব্দটি আরবী ভাষার "মৌশীম" শব্দ হইতে উদ্ভূত। "মৌশীম" শব্দের অর্থ, মরসুম বা ঋতু। ঋতু বিশেষে স্থানীয় কারণবশতঃ উষ্ণমণ্ডলে নিয়ত (আয়ন) বায়ুর গতি পরিবর্তিত হইয়া সাময়িক বায়ু প্রবাহিত হওয়ার ফলে যে জলবায়ুর সৃষ্টি হয় তাহাকে মৌসুমী বায়ু বলে।

এই জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং শুষ্ক ও নাতিশীতোষ্ণ শীতকাল।

শীতকালে উত্তর-গোলার্ধের মৌসুমী অঞ্চল উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ুর অন্তর্গত থাকে। সাধারণ নিয়মে ইহাই এ অঞ্চলের বায়ুপ্রবাহ। কিন্তু গ্রীষ্মকালে সূর্যের

উত্তরায়ণের ফলে পৃথিবীর তাপ ও চাপ মণ্ডলের পরিবর্তন ঘটে। তখন এই অঞ্চলে সূর্য্যকিরণ অধিকতর লম্বভাবে পড়ায় মহাদেশীয় ভূমিভাগ, জলভাগ অপেক্ষা বেশী উত্তপ্ত হয়। ফলে এই উত্তপ্ত ভূমিভাগে নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়। তখন উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু চলাচল এ অঞ্চলে বন্ধ থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ুর গতি তখন এই



নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রসারিত হয়। এই বায়ুপ্রবাহ নিরক্ষরেখা অতিক্রম করিয়া ফেরেল সূত্র অনুসারে গতি পরিবর্তন করে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুরূপে সমুদ্র হইতে স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ গোলার্ধের গ্রীষ্মকালেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেখানে গ্রীষ্মকালে উত্তর-পশ্চিম বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। আয়ন বায়ুর এই বিক্ষিপ্ত ও বিপর্য্যস্ত বায়ু-প্রবাহকে **মৌসুমী বায়ু** বলে। এই মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের উৎপত্তি, গতি ও প্রকৃতি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে শীতকালে এই বায়ু মহাদেশীয় স্থলভাগের উচ্চচাপ বলয় হইতে নিম্নচাপ বিশিষ্ট জলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে এই বায়ুতে জলকণা থাকে না। কিন্তু গ্রীষ্মকালে উচ্চচাপ বিশিষ্ট সমুদ্র হইতে প্রচুর জলকণা লইয়া নিম্নচাপ বিশিষ্ট মহাদেশীয় স্থলভাগের দিকে ধাবিত হয়। ফলে গ্রীষ্মকালে মৌসুমী অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাতযুক্ত স্থান চেরাপুঞ্জী এই মৌসুমী অঞ্চলেই অবস্থিত। তবে বৃষ্টিপাত বায়ুপ্রবাহের গতি ও পর্বতমালার অবস্থানের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। এজন্য বৃষ্টি বিরল অঞ্চলও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

মৌসুমী অঞ্চলে গড় উষ্ণতা গ্রীষ্মকালে ৮০°-১০০° ফা. এবং শীতকালে ৫৫°-৭৫°

ফা এবং বৃষ্টিপাত ৮০"—১০"। এশিয়া মহাদেশের ভারত, ব্রহ্ম, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, দক্ষিণ চীন প্রভৃতি অঞ্চলে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে ভারতে মৌসুমী বায়ুব প্রভাব সর্বাধিক। বৃষ্টিপাতেব তাবতম্য অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্ভিদ সংস্থানও নিম্নলিখিত বিভিন্নরূপ দেখিতে পাওযা যায়।

(ক) ৮০ **ইঞ্চির অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল**ঃ নিরক্ষীয় অঞ্চলেব মত এখানে চিরহবিৎ বৃক্ষেব বন দেখিতে পাওয়া যায কৃষিজ উৎপন্ন দব্যের মধ্যে ধান, পাট, চা ও ইক্ষু প্রধান। ভাবতের পশ্চিম উপকূলে, হিমালযেব নিম্নাংশে ও আসামে এরূপ বৃষ্টিপাত ও উদ্ভিদ সংস্থান দেখিতে পাওযা যায়।

(খ ৪০ **ইঞ্চি হইতে ৮০ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের অঞ্চল**ঃ এ অঞ্চলে শাল, সেগুন, চন্দন প্রভৃতি বৃক্ষেব বন দেখিতে পাওযা যায। ইহাবা পামোচী বৃক্ষ। ধান ভূট্টা ইক্ষু, তৈলবীজ প্রভৃতি ইহাব কৃষিজাত দ্রব্য। পশ্চিমবঙ্গে আসামে, বিহারে, মধ্যপ্রদেশে, উডিষ্যায, মহারাষ্ট্রের কতকাংশে মহীশূবে এরূপ উদ্ভিদ ও বৃষ্টিপাত দেখিতে পা য়া যায।

গ) ২০ **ইঞ্চি হইতে ৪০ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের অঞ্চল**ঃ এ সমস্ত অঞ্চলে তৃণভূমি ও সামান্য বন দেখিতে পাওযা যায়। বাজবা জোযার, গম কার্পাস, তৈলবীজ প্রভৃতি ইহাব কৃষিজাত দ্রব্য। উত্তরপ্রদেশ পাঞ্জাব অন্ধ্রেব ও মাদ্রাজে কতকাংশ ইহাব অন্তর্গত।

ঘ) ২০ **ইঞ্চির অনধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল**ঃ ইহা মরুভূমি সদৃশ। তৃণ-গুল্মই ইহার স্বাভাবিক উদ্ভিদ। কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে বাজবা ও জোযাব উল্লেখ-যোগ্য রাজস্থানের অধিকাংশ ইহাব অন্ত ত।

Q 10. What are the characteristics of the Mediterranean type of climate? Mention briefly the economic activity of man in such climate. Pre-C. U. 1961.

ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য কি? এরূপ জলবায়ুতে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ কর।)

Ans: মহাদেশগুলির পশ্চিম দিকে ৩০° হইতে ৪৫ অক্ষাংশের মধ্যে যে একপ্রকার জলবায়ু দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু আখ্যা দেওয়া হয়। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্সের দক্ষিণাংশ, ইতালি,

বল্কান রাষ্ট্রসমূহ, তুরস্ক, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, উত্তর আফ্রিকার মিশর, আলজেরিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে এরূপ জলবায়ু দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহার এরূপ নামকরণ



পৃথিবী· ভূমধ্য সাগরীয় জলবায়ুর দেশ

হইয়াছে। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল ছাড়া উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যচিলি দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ও অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ প্রভৃতি অঞ্চলেও এরূপ জলবায়ু দেখিতে পাওয়া যায়।

ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

(১) শীতকালে বৃষ্টিপাত এবং গ্রীষ্মকাল বৃষ্টিহীন। এজন্য ইহার শীতকাল আর্দ্র ও নাতিশীতোষ্ণ এবং গ্রীষ্মকাল শুষ্ক ও উষ্ণ। এ অঞ্চল শীতকালে পশ্চিমা বায়ু বলয়ে এবং গ্রীষ্মকালে আয়ন বায়ুর অন্তর্গত হয় বলিয়া এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

(২) গ্রীষ্মকালের উত্তাপ ৮০ ফা ও শীতকালের উত্তাপ ৫০ ফা হয়। ইহার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১০" হইতে ৪০"।

(৩) গ্রীষ্মকালে সূর্যের উত্তরায়ণ হইলে সূর্য্য যখন কর্কট ক্রান্তির নিকটবর্তী হয় তখন পৃথিবীর বায়ু চাপবলয়গুলি উত্তর দিকে সরিয়া যায়। ইহার ফলে এই অঞ্চলের উপর দিয়া যে আয়নবায়ু প্রবাহিত হয় উহা মহাদেশের উপর দিয়া আসে বলিয়া তাহাতে জলীয় বাষ্প থাকে না। এ জন্য এ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয় না।

(৪) শীতকালে সূর্যের দক্ষিণায়ন হইলে সূর্য্য যখন মকর ক্রান্তির নিকটবর্তী হয় তখন পৃথিবীর বায়ু চাপবলয়গুলি দক্ষিণে সরিয়া যায়। ইহার ফলে যে পশ্চিমা বায়ু এই অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় উহা জলভাগ হইতে স্থলভাগের দিকে ধাবিত

হয়। এজন্য ইহা প্রচুর জলীয় বাষ্প বহন করে। ফলে ইহার জন্য শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়।

এ অঞ্চলের মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা জলবায়ুর প্রকৃতি ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ সংস্থানের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। দীর্ঘ শুষ্ক গ্রীষ্মকালের উত্তাপ সহনশীল প্রাকৃতিক উদ্ভিদ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গাছগুলির কোনটার পাতা তৈলাক্ত, কোনটার কণ্টকাবৃত, কোনটার ছাল মোটা এবং কোনটার শিকড় খুব লম্বা। গাছের এই অবস্থাগুলি গ্রীষ্মের শুষ্কতার হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার উপযোগী। চেষ্টনাট, সিডার, ওক, কর্কওক, তুঁতগাছ, জলপাইগাছ ছাড়া কমলা লেবু, বাদাম, আঙ্গুর, পীচ, ন্যাসপাতি, খুবানি, আখরোট ডুমুর, আপেল প্রভৃতি ফলের চাষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া অশ্ব, ছাগ, মেষ, শূকর, গরু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ অঞ্চলের স্পেন ও পর্তুগালের মেরণো মেষ জগদ্বিখ্যাত। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে গম ও যব উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া ধান, ভূট্টা ও কার্পাসও কিছু জন্মিয়া থাকে।

এখানকার জলবায়ু মনোরম। ভূমির উৎপাদিকা শক্তিও নেহাৎ মন্দ নয়। এজন্য অনেক লোক কৃষিকার্য প্রধানতঃ ফলের চাষ কার্য্যে নিযুক্ত। লোকবসতিও ঘন। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সর্বত্র আঙ্গুর ও জলপাই প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এজন্য মদ্য ও সাবান শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্স, পর্তুগাল, ইতালি, স্পেন ও কালিফোর্ণিয়া প্রভৃতি দেশ এ বিষয়ে অগ্রণী। এখানে অনেক তুঁতগাছ জন্মে বলিয়া রেশম শিল্পও সমধিক প্রসিদ্ধ। ইতালি ও ফ্রান্সের এ বিষয়ে খ্যাতি আছে। অনায়াসে নানা প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয় বলিয়া অধিবাসিগণ অলস ও আরামপ্রিয়। এজন্য রেশম, মদ্য, সাবান, চিনি প্রভৃতি শিল্প ছাড়া অন্যান্য বৃহদাকার শিল্প ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

জলবায়ু মনোরম বলিয়া অনেক লোক এখানে বেড়াইতে আসে। সূর্য্য করোজ্জ্বল জলবায়ুর জন্য চলচ্চিত্র শিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। এ বিষয়ে ইতালি, ফ্রান্স ও কালিফোর্ণিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

•Q. 11 Compare and contrast the Monsoon and Mediterranean lands in respect of their general climatic conditions, natural vegetations and economic developments. (B. U. Entrance 1962).

মৌসুমী ও ভূমসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও অর্থ নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে পার্থক্য নির্ণয় কর।)

Ans মৌসুমী ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে নিম্নলিখিত উপায়ে পার্থক্য নির্ণয় করা যাইতে পারে :

মৌসুমী অঞ্চল	ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল
১। ইহা মহাদেশগুলির দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাংশে এবং কোন কোন মহাদেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত।	১। ইহা মহাদেশগুলির পশ্চিমাংশে অবস্থিত।
২। ইহা ৫ হইতে ২৫ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত।	২। ইহা ৩০ হইতে ৪৫° অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত।
৩। ইহা ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত।	৩। ইহা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত।
৪। ভারত, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, দক্ষিণ চীন, ফিলিপাইন, মধ্যআমেরিকা, ভেনেজুয়েলা, কলম্বিয়া, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রাজিলের পূর্বতীর, আবিসিনিয়ার পূর্বাংশ, পূর্ব আফ্রিকার তীরভূমি, মাদাগাস্কার, কুইনসল্যাণ্ড, উত্তর টেরিটোরি ও দক্ষিণ নিউগিনিতে এরূপ জলবায়ু দেখিতে পাওয়া যায়।	৪। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, কালিফোর্ণিয়া চিলি, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় এরূপ জলবায়ু দেখিতে পাওয়া যায়।
৫। ইহা আয়ন বায়ুবলয়ের অন্তর্গত, কিন্তু ঋতুভেদে এই বায়ুর দিক পরিবর্তন হয়।	৫। ইহা শীতকালে পশ্চিমা এবং গ্রীষ্মকালে আয়ন বায়ুবলয়ের অন্তর্গত হয় এবং ঋতুভেদে এই বায়ুর দিক পরিবর্তন হয় না।
৬। এখানে মৌসুমী-বায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয়।	৬। এখানে পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়।
৭। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০″—৮০″।	৭। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০″—৪০″।
৮। এখানে গ্রীষ্মের উত্তাপ ৮০°—৯০ ফাঃ এবং শীতের উত্তাপ প্রায় ৬০ ফাঃ।	৮। এখানে গ্রীষ্মের উত্তাপ ৭০°—৭৫° ফাঃ এবং শীতের উত্তাপ প্রায় ৫০° ফাঃ।

মৌসুমী অঞ্চল	ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল
৯। এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কলা, আনারস, আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, লেবু প্রভৃতি ফল, শাল, সেগুন, চন্দন, বাঁশ, বেত, তাল, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ এবং ধান, পাট, চা, ইক্ষু, গম, কফি, ভুট্টা, বাজরা, তৈলবীজ প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য।	৯। এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কমলালেবু, আঙ্গুর, পিচ, ন্যাসপাতি, খুবানি, আখরোট, ডুমুর, জলপাই, বাদাম, আপেল, প্রভৃতি ফল, সিডার, ওক, কর্কওক, চেষ্টনাট, তুঁতগাছ, ইকলিপটাস প্রভৃতি বৃক্ষ, এবং গম, যব, ভুট্টা, তামাক ও কিছু ধান কৃষিজাত দ্রব্য।
১০। ইহা মুখ্যতঃ কৃষিপ্রধান। বর্তমানে শিল্পে অগ্রগতি লাভ করিতেছে।	১০। এখানে কৃষি ও শিল্প উভয়ের উন্নতি অনেকদিন হইতে মোটামুটি দেখিতে পাওয়া যায়।
১১। এখানে ঘনবসতির জন্য সমস্যা দেখা দিয়াছে। এজন্য এখানকার অধিবাসীদের অনেকেই দরিদ্র।	১১। এখানে ঘন বসতির জন্য কোন সমস্যা এখনও সেরূপ দেখা দেয় নাই। এজন্য এখানকার অধিবাসীদের অনেকেই সেরূপ দরিদ্র নয়।
১২। ইহার কোন কোন স্থান প্রাচীন ভারতীয় ও চীন সভ্যতার লীলাভূমি।	১২। ইহার কোন কোন স্থান প্রাচীন গ্রীক, রোম প্রভৃতি সভ্যতার লীলাভূমি।

Q. 12. Give a brief account of the Natural Regions of India.

(ভারতের প্রাকৃতিক অঞ্চলের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও)।

Or,

Divide India into Natural Regions. Describe the climate, products and industries of each of them. (C. U. Inter. 1938)

(প্রাকৃতিক অঞ্চল হিসাবে ভারতকে বিভক্ত কর। প্রত্যেক বিভাগের জলবায়ু, উৎপন্ন দ্রব্য ও শিল্প বর্ণনা কর।)

Ans. জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ এবং মানুষের বসবাস ও জীবিকা অর্জনের সাদৃশ্যকে ভিত্তি করিয়া পৃথিবীকে কতকগুলি অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে। ঐরূপ

প্রত্যেক অঞ্চলকে একটি প্রাকৃতিক অঞ্চল (Natural Region) বলে। যেমন, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, মৌসুমী অঞ্চল প্রভৃতি। অনুরূপে প্রত্যেক দেশকেও বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা চলে। ভারতের প্রাকৃতিক অঞ্চল বলিতে আমরা অনুরূপ বিভাগকেই বুঝি। ভারতের বিচিত্র ভূপ্রকৃতির জন্য উহার প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলি (Natural Regions ভূপ্রকৃতি বিভাগের (Physical Divisions) প্রায় সমতুল্য। এজন্য ইহার ভূপ্রকৃতি বিভাগগুলিকে জলবায়ু হিসাবে আরও কয়েকটি অংশে বিভক্ত করিয়া প্রাকৃতিক অঞ্চলের বিভাগ সম্পূর্ণ করা হয়। নিম্নে উহাদের পরিচয় দেওয়া হইল :

১। **উত্তরের হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল :** উত্তরের হিমালয়পর্বত এবং উহা শাখা প্রশাখা লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। ইহা কতকগুলি পর্বতশৃঙ্গ, মালভূমি ও উপত্যকার সমষ্টি। কাশ্মীর হইতে আসাম পর্য্যন্ত পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ১৫০০ মাইল দৈর্ঘ্য এবং উত্তর দক্ষিণে ১৫০ হইতে ২৫০ মাইল বিস্তৃতি লইয়া ভারতের উত্তর দিকের সমস্ত অংশ ইহার অন্তর্গত। এই বিভাগকে নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করে চলে :

(ক) লাডাক অঞ্চল : ইহা কাশ্মীরের উত্তর-পূর্ব অংশ। ইহা তিব্বত মালভূমির একাংশ। এ অঞ্চলের জলবায়ু খুব শীতল। ইহা শীতকালে বরফাচ্ছন্ন থাকে এবং গ্রীষ্মকালে ইহার কোন কোন স্থান বরফমুক্ত হয়। ঘাস, নানাজাতীয় গাছের কাঠ, ছাগ ও মেষ লোম ইত্যাদি এ অঞ্চলের উৎপন্নদ্রব্য। কম্বল প্রস্তুত ও কাষ্ঠ সংগ্রহ ইহার প্রধান শিল্প। পার্বত্য অঞ্চলও তীব্রশীতল বলিয়া এ অঞ্চলে লোকবসতি খুব কম, যানবাহন অনুন্নত এবং কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য বিষয়ে ইহা খুব অনগ্রসর।

(খ) **পশ্চিম হিমালয়অঞ্চল :** কাশ্মীর হইতে নেপালের পশ্চিম ভাগ পর্য্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। এ অঞ্চলের জলবায়ু শুষ্ক ও শীতল। বৃষ্টিপাত কম। উচ্চশৃঙ্গগুলি বরফাবৃত। সরল বর্গীয় বৃক্ষের কাঠ, তার্পিন, রজন, আপেল, বাদাম, কুল প্রভৃতি ফল, অল্প পরিমাণ ধান, জোয়ার, বাজরা, ভূটা, গম, ছাগ ও মেষলোম, রেশম প্রভৃতি এ অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্য। রেশম শিল্প এবং শাল, কার্পেট, কম্বল প্রভৃতি পশমজাত কুটীর শিল্প এখানে উল্লেখযোগ্য। ভবিষ্যতে কাগজ, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি শিল্পস্থাপনের সম্ভাবনা আছে।

(গ) **পূর্বহিমালয় অঞ্চল :** নেপাল হইতে আসাম পর্য্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। এ অঞ্চলের জলবায়ু আর্দ্র কিন্তু উচ্চতার জন্য উত্তাপ বেশী নয়। এখানে গ্রীষ্মকালে প্রচুর বারিপাত হয়। নানাপ্রকার বৃক্ষের কাঠ, চা, সিঙ্কোনা, ধান, আখ

রেশম, তামাক, কমলালেবু প্রভৃতি ইহার উৎপন্নদ্রব্য। চায়ের বাক্স, রেলের স্লিপার নির্মাণ, এণ্ডি ও মুগার কাপড় প্রস্তুত প্রভৃতি শিল্প কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে। এজন্য এখানে লোকবসতি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে।

২। **পূর্বদিকের পার্বত্য অঞ্চল :** আসামের নাগা, লুসাই, পাটকোই প্রভৃতি পাহাড় লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলের জলবায়ু আর্দ্র ও নাতিশীতোষ্ণ। পাহাড়গুলি বেশী উচ্চ নহে বলিয়া এরূপ জলবায়ু দৃষ্ট হয়। তবে বারিপাত প্রচুর হইয়া থাকে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কাঠ, চা, তামাক, কমলালেবু, ধান, আনারস, আখ, রেশম, চনাপাথর, কয়লা ও খনিজ তৈল উল্লেখযোগ্য। এ অঞ্চলের ডিগবয় ও নাহারকাঠিয়ার খনিজতৈল বিখ্যাত। তৈলশোধন, এণ্ডি ও মুগা প্রস্তুত, কাষ্ঠ চেড়াই, চায়ের বাক্স প্রস্তুত, রেলের স্লিপার প্রস্তুত প্রভৃতি শিল্প উল্লেখযোগ্য। এ অঞ্চলের শিল্প সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ আছে এবং লোকবসতিও অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চল অপেক্ষা বেশী দেখা যায়।

৩। **শতদ্রু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমভূমি :** উত্তর ভারতের সমগ্রসমভূমি এই অঞ্চলের অন্তর্গত। ইহা পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০০০ মাইল এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রস্থে ২০০ হইতে ২৫০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিভাগকে নিম্নলিখিত **প্রাকৃতিক অঞ্চলে** ভাগ করা চলে :

(ক) **শতদ্রু উপত্যকা :** এই অঞ্চল পূর্বপাঞ্জাবের অন্তর্গত। এ অঞ্চলের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন—শীতে শীত বেশী এবং গ্রীষ্মে উত্তাপ বেশী। বৃষ্টিপাত সামান্য (২০″-৩০′), তবে ভূমি উর্বর। এজন্য জলসেচ প্রয়োজন হয়। অরণ্যের দেবদারু কাঠ ও মেষলোম এবং গম, যব, কার্পাস, বাজরা, তামাক, আখ, ভূট্টা, ধান, চা, তৈলবীজ, ডাল প্রভৃতি এখানকার উৎপদ্রব্য। রেশম, পশম, চামড়া, ইক্ষু, কার্পাস, তৈল নিষ্কাসন প্রভৃতি শিল্প এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যতে এ অঞ্চল কৃষি ও শিল্পে অধিক উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

(খ) **উচ্চগাঙ্গেয় সমভূমি :** উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত। জলবায়ু এখানে চরমভাবাপন্ন, তবে শতদ্রু উপত্যকা অপেক্ষা তীব্রতা কম। বৃষ্টিপাত ২৫″-৪০″। ভূমি উর্ব্বর কিন্তু জলসেচ প্রয়োজন। গম, আখ জোয়ার, বাজরা, ধান, ভূট্টা কার্পাস, ইক্ষু, ডাল, আফিম, সাবাইঘাস, চা প্রভৃতি উৎপন্নদ্রব্য। কার্পাস, ইক্ষু, চামড়া, রাসায়নিক দ্রব্য, দুগ্ধজাত দ্রব্য, কাঁচ, কাগজ দিয়াশলাই প্রভৃতি শিল্প উল্লেখযোগ্য।

(গ) **মধ্যগাঙ্গেয় সমভূমি :** এলাহাবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র উত্তর বিহার এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানকার জলবায়ু অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবাপন্ন।

শীত ও গ্রীষ্মের পার্থক্য খুব বেশী নহে। গড় বৃষ্টিপাত ৪০"-৭০"। স্থানে স্থানে জলসেচ দ্বারা কৃষিকার্য হইয়া থাকে। ধান, গম, যব, বাজরা, জোয়ার, তৈলবীজ, কার্পাস, ভূট্টা, তামাক, ডাল, আফিং, নীল, আম, লিচু প্রভৃতি উৎপন্নদ্রব্য। কার্পাস ইক্ষু, তৈল নিষ্কাসন, রেশম, কেওলীন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শিল্প।

(ঘ) **নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি:** বিহারের পূর্ব্বদিক ও পশ্চিমবঙ্গ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানকার জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন ও আর্দ্র। শীত ও গ্রীষ্মের উত্তাপের পার্থক্য কম। বৃষ্টিপাত গড়ে ৭০"র অধিক। ভূমি উর্বর। ধান, পাট, ইক্ষু, জোয়ার, বাজরা, তৈলবীজ, কার্পাস, চা, রেশম, কয়লা প্রভৃতি ইহার উৎপন্নদ্রব্য। ইক্ষু, কার্পাস, কাগজ, দিয়াশলাই, রাসায়নিক দ্রব্য, চীনামাটির বাসন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শিল্প।

(ঙ) **ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা:** আসামের ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চল ইহার অন্তর্গত। ইহা প্রায় ৫০০ মাইল দীর্ঘ ও ৫০ মাইল প্রস্থ। এখানকার জলবায়ু নাতিউষ্ণ ও আর্দ্র এবং কিছুটা অস্বাস্থ্যকর। নদীর উভয় তীরবর্ত্তী স্থান পতিত জলাভূমিতে পরিপূর্ণ। কিছুটা দূরে জমি চাষের উপযুক্ত। বৃষ্টিপাত ৮০"এর অধিক। ধান, পাট, তৈলবীজ, চা, কমলালেবু, আনারস, তাল, রবার, সিঙ্কোনা, তামাক, মুগা, এণ্ডি উৎপন্ন দ্রব্য। ইহাছাড়া শাল, সেগুন, শিশু, জারুল প্রভৃতি বৃক্ষের কাঠ, বাঁশ, বেত প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্য। রেশম, কাঠ চেরাই, চায়ের বাক্স প্রস্তুত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শিল্প।

৪। **রাজপুতনা ও থর মরুভূমি:** উত্তর ভারতের সমভূমির পশ্চিম সীমায় এই অঞ্চল অবস্থিত। ইহার উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু বিধৌত সমভূমি এবং দক্ষিণ-পূর্বে আরাবল্লী পর্ব্বত অবস্থিত। ইহা শুষ্ক বালুকাময় স্থান। এজন্য জলবায়ু চরম ভাবাপন্ন। দিনের গড় উত্তাপ ৯০ ফাঃ, এবং রাত্রিতে ৩২° ফাঃ পর্য্যন্ত হয়। স্থানে স্থানে সময়ে সময়ে তুষারপাত হয়। বৃষ্টিপাত বৎসরে ১০"র নীচে; ভূমিভাগ অনুর্বর। নদী নালার অভাব হেতু জল সেচনের সুবিধা খুব কম। এজন্য কৃষিকার্যের সুযোগ-সুবিধা ভাল নাই। অধিবাসীদের অধিকাংশ মেষপালক এবং যাযাবর। আর উট প্রধান ভারবাহী জন্তু। কাজেই সামান্য পরিমাণে বাজরা, জোয়ার, গম, ভূট্টা, এবং উট, মেষলোম, জিপাসাম ও কয়লা এ অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। উট ও মেষলোমের কার্পেট, কম্বল প্রস্তুত করা প্রধান শিল্প।

৫। **রাজপুতনা ও মধ্যভারতের উচ্চভূমি:** আরাবল্লী পর্বত ও উহার উত্তর-পূর্ব অংশ, রাজস্থানের দক্ষিণের পর্বত, পূর্বের উপত্যকাভূমি এবং পশ্চিমের নর্মদা উপত্যকাভূমি লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। ইহার জলবায়ু শুষ্ক ও চরমভাবাপন্ন। তবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সাধারণতঃ ১০" হইতে ৪০"র মধ্যে। জলসেচের বিশেষ

সুবিধা নাই। কৃষিকার্য্য ও বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। কেবল মাত্র অনেক মেষ ও ছাগল পালিত হয়। এজন্য সামান্য জোয়ার, গম, তুলা, ছোলা, এবং মেষ ও ছাগ-লোম, তাঁমা, অভ্র, সীসা, দস্তা প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্য। স্থানীয় কাঁচা মাল থাকায় পশম ও কার্পাস শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।



৬। দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ঃ উত্তরে বিন্ধ্য, সাতপুরা, মহাকাল, মহাদেব প্রভৃতি পর্বত-শ্রেণী, দক্ষিণে নীলগিরি, আনামালাই, কার্ণামাম পর্বতশ্রেণী, পশ্চিমে পশ্চিম ঘাট পর্বতশ্রেণী, পূর্বে পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণী লইয়া যে সমগ্র ভূভাগ গঠিত উহা এই অঞ্চলের অন্তর্গত। উহাকে গুজরাট, মালব, ছোট নাগপুরের মালভূমি, কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল ইত্যাদি প্রাকৃতিক অঞ্চলে সাধারণতঃ ভাগ করা হয় তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

(ক) **কৃষ্ণ-মৃত্তিকা অঞ্চল ঃ** নর্মদা নদীর দক্ষিণে গুজরাট সহ বোম্বাইয়ের অধিকাংশ, মালব মালভূমি ও অন্ধ্রের কিয়দংশ এই বিভাগের অন্তর্গত। অধিকাংশ মালভূমি বলিয়া জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন। গ্রীষ্মের তীব্রতা নাই। বৃষ্টিপাত ৪০ ইঞ্চির কম। ইহার মৃত্তিকা বাসাল্ট লাভা দ্বারা গঠিত। ইহার জলধারণ ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। এজন্য এ অঞ্চলের প্রায় ১৩০০০ বর্গমাইল পরিমিত স্থানে তুলার চাষ হইয়া থাকে। সুতরাং তুলাই এ অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ইহা ছাড়া ধান, গম, বাজরা, জোয়ার, ভুট্টা, আফিম, চীনাবাদাম, তৈলবীজ প্রভৃতি কৃষিজ, অনেক গরু, ভেড়া, মহিষ প্রতিপালিত হয় বলিয়া পশুজাত, অরণ্যজাত শাল, সেগুন প্রভৃতি

কাঠ, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, তামা, গ্রাফাইট প্রভৃতি খনিজ উৎপন্ন দ্রব্য। কার্পাস বস্ত্র উৎপাদন এ অঞ্চলের প্রধান শিল্প। সোলাপুর, গুলবর্গা, আকোলা, অমরাবতী, পুণা, নাগপুর প্রভৃতি ইহার উল্লেখযোগ্য স্থান ও শিল্পকেন্দ্র।

(খ) **উত্তর-পূর্ব মালভূমি**ঃ ছোট নাগপুরের মালভূমি সহ বিহারের দক্ষিণ ভাগ, মধ্যভারতের উচ্চভূমির পূর্বাংশ, পূর্বঘাটের উত্তরাংশ এবং মহানদী ও গোদাবরীর উপত্যকা সহ উড়িষ্যার উত্তর অংশ এই বিভাগের অন্তর্গত। এ অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ ও নাতি আর্দ্র। অভ্যন্তরে উচ্চতার জন্য গ্রীষ্মের প্রখরতা নাই। জলবায়ু মোটের উপর স্বাস্থ্যকর। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হওয়ার সময় অনেক সময় এ অঞ্চলে ঘূর্ণি ঝড় দেখা যায়। বৃষ্টিপাত ৪০"—৬০"। এই মালভূমি অরণ্য সম্পদে সমৃদ্ধ। এজন্য অরণ্যজাত শাল, সেগুন প্রভৃতি কাঠ, লাক্ষা, রেশম কীট, দীঘির সাহায্যে জলসেচের সুবিধা আছে বলিয়া নদী উপত্যকায় উর্বর ভূমিতে ধান, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, তৈলবীজ, তামাক, আখ, ডাল, পাট এবং খনিজাত কয়লা, লৌহ, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, তামা, চুনা পাথর, ডলোমাইট প্রভৃতি ইহার উৎপন্ন দ্রব্য। লাক্ষা, লৌহ ও ইস্পাত, ইক্ষু, সিমেন্ট, সার প্রভৃতি ইহার উল্লেখযোগ্য শিল্প। জামসেদপুর, ডালমিয়া নগর, সিন্ধ্রী, ধানবাদ, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্দ্র।

(গ) **দক্ষিণ দাক্ষিণাত্য**ঃ বর্তমান মহীশূর রাজ্যের দাক্ষিণাংশ, উপকূলের সমভূমি ভিন্ন মাদ্রাজের পশ্চিমাংশ এবং অন্ধ্রের উত্তর-পশ্চিমাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। উষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত বলিয়া ইহার জলবায়ু মোটের উপর মৃদু উষ্ণ প্রধান। উচ্চভূমিতে সমুদ্র সান্নিধ্য হেতু শীতোষ্ণতার প্রখরতা নাই। পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার বৃষ্টিছায়া অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫"—৪০" এর বেশী নয়। ইহা ভারতের অন্যতম দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চল। তবে নদী উপত্যকাগুলি উর্বর এবং দীঘির সাহায্যে জলসেচনের ব্যবস্থাও আছে বলিয়া ধান, কার্পাস, জোয়ার, ইক্ষু, চীনাবাদাম, গম, বাজরা প্রভৃতি কৃষিজ, নীলগিরি অঞ্চলে চা, কফি, সিঙ্কোনা, অরণ্য অঞ্চলের শাল, সেগুন, চন্দন ও আবলুস কাঠ, গোলমরিচ, এলাচ, দারুচিনি এবং লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, স্বর্ণ, ক্রোমাইট প্রভৃতি খনিজ পদার্থ এ অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্য। পর্বতের শুষ্ক অঞ্চলে অনেক মেষ ও গবাদি জন্তু প্রতিপালিত হয়। ইহার বিভিন্নস্থানে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের সুবিধা আছে। লৌহ, কার্পাস, রেশম, বিমানপোত, সাবান, চন্দন তৈল, সিমেন্ট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শিল্প। মহীশূর, বাঙ্গালোর, বেলারি, কুর্নুল ও হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি শিল্প প্রধান অঞ্চল।

৭। **উপকূলবর্তী সমভূমি** ঃ এই সমভূমিকে পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে বিভক্ত করা চলে।

(ক) **পশ্চিম উপকূল :** উত্তর-দক্ষিণে কচ্ছ হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত সমভূমি পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ও আরব সাগরের মধ্যে এই অঞ্চল অবস্থিত। ইহার উত্তরের অংশ বোম্বাই হইতে গোয়াপর্যন্ত কঙ্কন উপকূল এবং গোয়ার দক্ষিণের অংশ মালাবার উপকূল নামে পরিচিত। উত্তরের অনুর্বর বন্ধুর ও বৃষ্টিহীন কচ্ছ কাথিয়াড় ও গুজরাট অঞ্চল ভিন্ন সমগ্র অংশের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। সমুদ্র সান্নিধ্য হেতু শীত-গ্রীষ্মের পার্থক্য খুব কম। বৃষ্টিপাত ৮০"এর উপরে। সমভূমিতে ধান, কলা, আম, নারিকেল, সুপারী, পর্বতের ঢালু অংশে সেগুন, চন্দন, আবলুস প্রভৃতি কাঠ, রবার সিঙ্কোনা, এলাচ, গোলমরিচ, কোন কোন স্থলে ইক্ষু, গম, তুলা উৎপন্ন দ্রব্য। নারিকেলের ছোবড়া ও শাস, মৎস্য, বাজরা, কার্পাস, লবণ, পশম, রেশম, ইক্ষু, প্রভৃতি শিল্প উল্লেখযোগ্য। কান্দলা, বোম্বাই, কালিকট, ত্রিবান্দ্রম কোচিন, আলেপ্পী, কুইলন প্রভৃতি এ অঞ্চলের বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র।

(খ) **পূর্ব উপকূল :** কুমারিকা হইতে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দর বন এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত পূর্বঘাট পর্বতমালা ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যে এ অঞ্চল অবস্থিত। দক্ষিণে কুমারিকা ও উত্তরে কৃষ্ণানদী পর্যন্ত এই উপকূলের নাম কর্ণাট উপকূল এবং কৃষ্ণা হইতে মহানদী পর্যন্ত উপকূলের নাম উত্তর সার্কাস বা অন্ধ্র-উড়িষ্যা উপকূল নামে পরিচিত। সমুদ্র সান্নিধ্য হেতু ইহার জলবায়ু সমভাবাপন্ন। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি কম। শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি হয়। গড় বৃষ্টিপাত ৪০"র মত। নদী উপত্যকাগুলি খুব উর্বর। খাল ও দীঘির সাহায্যে জলসেচনের সুবিধা আছে। ধান, জোয়ার, বাজরা, চীনাবাদাম, তামাক, তৈলবীজ, নারিকেল, ইক্ষু, অভ্র লবণ, ম্যাঙ্গানিজ কয়লা, বনভূমির কাঠ প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্য। মৎস্য, লবণ, জাহাজ নির্মাণ, কার্পাস সিগারেট, চুরুট, নারিকেলের শাস ও ছোবড়া, শঙ্খ ও মুক্তা সংগ্রহ প্রভৃতি শিল্প উল্লেখযোগ্য। মাদ্রাজ, পণ্ডিচেরী, তুতিকোরিণ, মাদুরা, বিশাখাপত্তনম, কলিকাতা প্রভৃতি শিল্প প্রধান কেন্দ্র।

চতুর্থ অধ্যায়

কৃষি

(Agriculture)

Q. I. Discuss the important factors necessary for the success of agriculture.

(কৃষির সাফল্যের জন্য যে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি দরকার তাহার আলোচনা কর।)

Ans : যে বিষয়গুলির উপর কৃষিকার্য্যের সাফল্য নির্ভর করে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওয়া হইল :

১। মাটি (Soil) : মাটির প্রকৃতির উপর বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন নির্ভর করে। কারণ কোনও বিশেষ ধরণের মাটি বিশেষ রকম কৃষিজাতদ্রব্য উৎপাদনের উপযোগী। মোটের উপর মাটি উর্বর হওয়া প্রয়োজন। অনুর্বর মাটিতে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। তবে বিভিন্ন প্রকার মাটির উর্বরতাশক্তি বিভিন্ন। যেমন, বালুমাটিতে প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ বালুর অংশ থাকে এবং এজন্য ইহার জলধারণ ক্ষমতা থাকে না। ফলে ইহাতে আলু বা অন্যান্য মূলজাতীয় দ্রব্য ছাড়া অন্য ফসল উৎপন্ন হইতে পারে না। কাদা মাটিতে শতকরা ৩০ ভাগের উপর কাদা থাকে। এজন্য ইহাতে জল আটকাইয়া থাকিতে পারে। ফলে ধান, পাট, প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। দোয়াশ মাটিতে ধান, ইক্ষু, গম, ভুট্টা প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারে। উর্বরতার দিক দিয়া পাললিক মাটিই শ্রেষ্ঠ। এজন্য কৃষিকার্য্য এরূপ মাটিবিশিষ্টস্থানেই অধিক বিস্তার লাভ করিবার সুযোগ পায় এবং ধান, পাট, ইক্ষু, গম, ভুট্টা প্রভৃতি শস্য উৎপাদনে প্রসিদ্ধ লাভ করিতে দেখা যায়। সুতরাং মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী যে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন নির্ভর করে একথা বলা চলে।

২। জলবায়ু (Climate) : বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু, বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপাদনের উপযোগী। উষ্ণ জলবায়ুতে ধান, বাজরা, জোয়ার, পাট, কলা, আনারস, চা, কফি, ইক্ষু প্রভৃতি, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে গম, যব, বীট, শণ, আঙ্গুর, আপেল, আলু প্রভৃতি এবং অতি শীতল স্থানে রাই, ওট প্রভৃতি ভিন্ন অন্য ফসল ভাল জন্মে না। অবশ্য বিজ্ঞানের উন্নতিতে মানুষ জলবায়ুর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে

এবং জলসেচন, সারপ্রয়োগ প্রভৃতির দ্বারা প্রতিকূল জলবায়ুতে অনেক ফসল উৎপন্ন করিতেছে। কিন্তু ফসল উৎপাদন ব্যাপারে মানুষ সম্পূর্ণ জলবায়ুর প্রভাবমুক্ত হইতে পারে নাই। মানুষ এখনও নিরক্ষীয় জলবায়ুতে গুট উৎপাদনে সক্ষম হয় নাই। জলবায়ু কৃষিকার্য্যের সম্ভাবনাও স্থির করে। তুন্দ্রা অঞ্চলে এখনও কৃষিকার্য আরম্ভ হইতে পারে নাই। যে সমস্ত স্থানে উত্তাপ অন্ততঃ ৫২ ফাঃ তথায় কৃষিকার্য্য ভালভাবে চলিতে পারে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অন্ততঃ ১০" এবং উষ্ণমণ্ডলে অন্ততঃ ২০" বৃষ্টিপাত কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজন। ইহার কম হইলে জলসেচন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে।

৩। **ভূ-প্রকৃতি (Physical features);** ভূ-প্রকৃতি নানাভাবে কৃষির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। পার্বত্য অঞ্চলের বন্ধুরতা, অনুর্বর-মাটি, কঠোর জলবায়ু, সমতলভূমির স্বল্পতা এবং যাতায়াতের অসুবিধা কৃষিকার্য্যের প্রসার লাভ করিতে বাধা সৃষ্টি করে। মালভূমিও অনুরূপ ভাবে নানাপ্রকার বাধা সৃষ্টি করে। মরুভূমি বালুময় ও জলহীন বলিয়া কৃষিকার্যের অনুপযুক্ত। মাটি ও জলবায়ু অত্যধিক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না করিলে সমভূমিই কৃষিকার্য্যের আদর্শস্থল।

৪। **জলসেচন (Irrigation):** যে স্থানে মাটি ও জলবায়ু অনুকূল অথচ বৃষ্টিপাত স্বল্প ও অনিশ্চিত সে স্থানে জলসেচন দ্বারা কৃষিকার্য্য চলিতে পারে। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে জলসেচন কৃষির পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। পাঞ্জাবে জলসেচনের ব্যবস্থা না হইলে উহা কখনই কৃষি সমৃদ্ধ হইতে পারিত না। নীল ও সিন্ধুনদের অববাহিকা অঞ্চলেও এইভাবেই কৃষিকার্য্য প্রসার লাভ করিয়াছে।

৫। **শ্রমিক (Labour):** যেখানে অন্যান্য অবস্থা অনুকূল সেখানে শ্রমিকের অভাবে কৃষিকার্য্য সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে না। কারণ শস্য বপন, রোপন, তত্ত্বাবধান, কর্তন ও গোলাজাত করা বা অন্যস্থলে প্রেরণ করার জন্য প্রচুর সুলভ শ্রমিক প্রয়োজন। মৌসুমী অঞ্চলে শ্রমিকের প্রাচুর্য্যের জন্যই কৃষিকার্য্য ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে।

৬। **বাজার (Market):** কৃষিকার্যের সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বা বাজার না থাকিলে কৃষিকার্য্য প্রসার লাভ করিতে পারে না। সুতরাং ফসলের চাহিদাও কৃষির সাফল্যের জন্য প্রয়োজন।

৭। **পরিবহন (Transport):** পরিবহনের সুযোগ-সুবিধা থাকিলে কৃষিকার্য্যের উপযোগী কোনও অঞ্চলে সে অঞ্চলের প্রয়োজনাতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন হইতে পারে এবং এইভাবে কৃষি প্রসার লাভ করিতে পারে। রেলপথে ও জলপথে যাতায়াত

ব্যবস্থার সম্যক উন্নতির ফলে কানাডা, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বিশ্বের বাজারের জন্য উহাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত গম উৎপন্ন করিতে পারিতেছে।

(৮) **অন্যান্য অবস্থা** (Other Conditions) : কৃষকদের প্রয়োজনীয় লাঙ্গল, গরু, যন্ত্রপাতি, সার, ভালবীজ প্রভৃতির সহজলভ্যতার উপরও কৃষিকার্য্যের সাফল্য নির্ভর করে। ভারতে কৃষিকার্য্যের সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক সুবিধা আছে, কিন্তু এই সমস্ত সুবিধা কৃষকগণ প্রয়োজনমত পায় না বলিয়া অধিকসংখ্যক লোক কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও প্রতি একরে আশানুরূপ ফসল উৎপন্ন করিতে পারিতেছে না এবং এজন্য দারিদ্র হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে না।

Q. 2. Describe the different types of soil and show the influence of soil on agriculture.

(বিভিন্ন প্রকার মাটির বিবরণ দাও এবং কৃষির উপর মাটির প্রভাব বর্ণনা কর।)

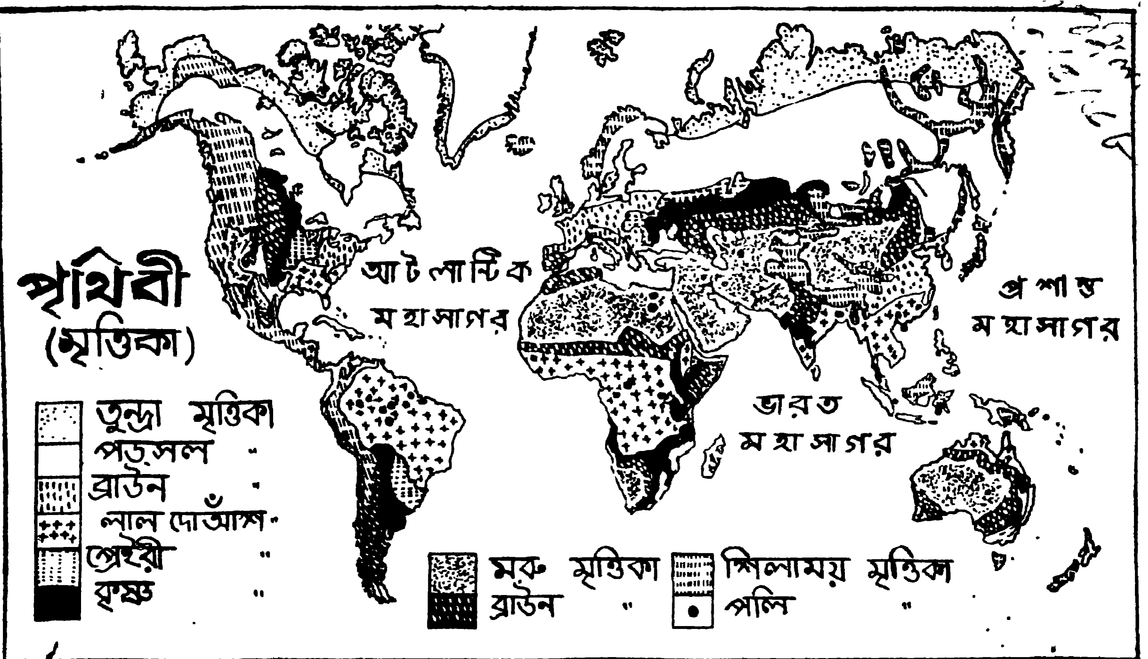
Ans.—উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি যেমন কৃষিকার্য্যকে নিয়ন্ত্রণ করে মাটিও তেমনই কৃষি কার্য্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। মাটির উৎপাদিকা শক্তির উপর কৃষিকার্য্যের সাফল্য নির্ভর করে। বৃষ্টি, রৌদ্র, জলস্রোত, বায়ুপ্রবাহ, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে শিলা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পৃথিবী পৃষ্ঠের উপরে যে স্তর সৃষ্টি হয় উহাকে **মাটি** (Soil) বলে। অতি ক্ষুদ্র খনিজ পদার্থ, শিলাচূর্ণ, উদ্ভিদ ও পশুজাত পদার্থ, রাসায়নিক পদার্থ, বায়ু, অতি ক্ষুদ্র জীবাণু প্রভৃতি মাটিতে সংমিশ্রিত অবস্থায় থাকে এবং কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত ভাল মাটিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্দ্রতা, উষ্ণতা, বায়ু, জৈবপদার্থ ও জীবাণু থাকা প্রয়োজন। মাটির কণার আকৃতি ও বর্ণের উপরও কৃষিকার্য্যের সফলতা নির্ভর করে। মাটিকে রাসায়নিক, গঠনগত ও বর্ণের দিক দিয়া বিচার করিলে মাটির গুণাগুণ সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান জন্মে। তদনুযায়ী মাটির নিম্নরূপ শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে।

(১) **রাসায়নিক দিক (Chemical Side)** :—মাটিতে পটাসিয়াম, ক্যাল-সিয়াম, নাইট্রেট্, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। কিন্তু ইহাদের সংমিশ্রন সকল মাটিতে একরূপ নয়। বিভিন্নরূপ জলবায়ুতে উহার তারতম্য ঘটে। **পাললিক মাটি** (Alluvial Soil) রাসায়নিক ও জৈব পদার্থ মিশ্রিত একটি উৎকৃষ্ট উর্বর মাটি। ইহা নদী অববাহিকা ও বদ্বীপ অঞ্চলে

দৃষ্ট হয়। গঙ্গার অববাহিকা ও বদ্বীপ অঞ্চল এরূপ পাললিক মাটি দ্বারা গঠিত। এ অঞ্চলে পরিমিত বৃষ্টিপাতের দরুণ রাসায়নিক গুণ বিশেষ নষ্ট হয় না। ধান, গম, ইক্ষু, পাট প্রভৃতি এ মাটিতে ভাল জন্মিয়া থাকে কিন্তু বিষুরেখার নিকটবর্তী অঞ্চলে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য মাটির উর্বরতা কমিয়া যায়। মাটির এরূপ পরিবর্তনকে Laterisation বলে। ইহার ফলে অনুর্বর ল্যাটেরাইট মাটির (Laterite soil) সৃষ্টি হয়। ভারতের দাক্ষিণাত্যে ও ব্রাজিলে এরূপ মাটি দেখিতে পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত বেশী লাল হইলে ইহা ততটা অনুর্বর নহে। চা, কফি, চীনাবাদাম, বাঁজরা, জোয়ার ইহাতে ভাল জন্মিয়া থাকে। শীত প্রধান দেশে জৈব পদার্থ মাটির উপরের স্তরে এবং খনিজ পদার্থ নীচুস্তরে জমা থাকে। ইহার ফলে উপরের স্তরে বালুর ভাগ বৃদ্ধির পায়। এরূপ পরিবর্তনকে (Podsolisation) বলে। Podsol উক্ত অঞ্চলের অরণ্যাঞ্চলের মাটি এবং ওট উৎপাদনের উপযোগী। মাটি আবার চূণ সঞ্চয়ী (Lime Accumulating) এবং চূণ সঞ্চয়হীন (Non-lime Accumulating) হিসাবেও ভাগ করা হয়। চূণ সঞ্চয়ী মাটি ক্ষারধর্মী (Alkaline) এবং বিভিন্ন প্রকার শস্য উৎপাদনের উপযুক্ত। চূণসঞ্চয়হীন মাটি অম্লধর্মী (Acidic) এবং অনেক শস্যের পক্ষে ক্ষতিকর। ইহাতে চূণ মিশ্রিত করিলে অনেকটা দোষমুক্ত হয়। লৌহ ও এ্যালুমিনিয়াম প্রধান মাটিকে পেডলফার (Pedolfer) এবং চূণ প্রধান মাটিকে পেডক্যাল (Pedocal) বলে।

২। গঠনগত দিক (Texture) —মাটির কণার আকার ও সংস্থানের উপর উহার গঠনগত পার্থক্য দেখা যায়। এই গঠনগত পার্থক্য হিসাবে মাটিকে নিম্ন লিখিতভাবে ভাগ করা যায় : (ক) এঁটেল মাটি (Clayey soil) : ইহাতে জল অপ্রবেশ্য ও ইহা বায়ুশূন্য এবং শুষ্ক হইলে কঠিন। ফলে কৃষিকার্য্য কষ্টসাধ্য। (খ) বেলে মাটি (Sandy Soil) : ইহাতে বালির ভাগ শতকরা ৬০ অংশ এবং ইহা জল ধারণ করিতে পারে না। ফলে কৃষিকার্য্যের পক্ষে খুব উপযুক্ত নহে। (গ) দোয়াশ মাটি (Loamy Soil) : ইহাতে কাদা ও বালি প্রায় সমভাবে মিশ্রিত থাকে এবং নানা প্রকার শস্য উৎপাদনের পক্ষে উপযোগী।

(৩) **বাহিত মাটি (Transported Soil) :**—মাটির গঠনের রীতি অনুযায়ীও উহার বিভাগ চলে। পাললিক মাটি (Alluvial soil) নদীবাহিত মাটি। কিন্তু লোয়েস (Loess) বায়ুতাড়িত মাটি, ইহা শুষ্ক হইলেও উর্বর এবং জলসেচন পাইলে ইহাতে গম, যব, জোয়ার, সয়াবীন প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। চীনের হোয়াংহো নদীর তীরবর্তী লোয়েস মাটি প্রসিদ্ধ।


পৃথিবী
(মৃত্তিকা)
আটলান্টিক মহাসাগর
প্রশান্ত মহাসাগর
ভারত মহাসাগর
তুন্দ্রা মৃত্তিকা
পড্‌সল "
ব্রাউন "
লাল দোআঁশ "
প্রেইরী "
কৃষ্ণ "
মরু মৃত্তিকা
ব্রাউন "
শিলাময় মৃত্তিকা
পলি "

(৪) **বর্ণগত বিভাগ (Division by Colour)** :—এরূপ বিভাগ অনুযায়ী মাটিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা চলে :

(ক) শীতল জলবায়ু অঞ্চলের **গভীর বাদামী** (Dark Brown) রংয়ের পডসল ; (খ) অরণ্যাঞ্চলের মোটামুটি উর্বর ধূসর বাদামী (Grey Brown) মাটি ; ইহাও পডসল জাতীয়। (গ) পর্ণমোচী অরণ্যাঞ্চলের হলুদ-লাল (Yellow Reddish) মাটি ; (ঘ) উষ্ণমণ্ডলের লাল অনুর্বর ল্যাটেরাইট (Laterite) মাটি ; (ঙ) তৃণভূমি অঞ্চলের কাল (Black) উর্বর সার্নোজেম (Chernozems) মাটি। ইহা আগ্নেয় ও পাললিক উভয় জাতীয় হইতে পারে। ইহা সূক্ষ্ম দানাযুক্ত বলিয়া জলধারণক্ষম এবং উর্বর। গম, তূলা প্রভৃতি উৎপাদনের পক্ষে ইহা বেশ ভাল। দাক্ষিণাত্য, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র এরূপ মাটির জন্য উল্লেখযোগ্য। (চ) অল্পবৃষ্টি অঞ্চলের শুষ্ক পিঙ্গলবর্ণ (Chestnut Brown) মাটি।

ইহা ছাড়া ইউরোপের উত্তরভাগে অনেকস্থলে হিমবাহ (Glacial) মাটি দেখা যায়। হিমবাহ অধ্যুষিত অঞ্চলে এই মাটি দৃষ্ট হয়। হিমবাহ বাহিত মাটির অন্য নাম **মোরেন** (Moraine) মাটি। এ মাটি প্রস্তর ও বালুকা প্রধান এবং অতিমাত্রায় সার ভিন্ন ইহাতে কৃষিকার্য্য চলে না। এ মাটির প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য রাই, আলু, বীট, শণ ইত্যাদি।

মোটের উপর মাটির উর্বরতার উপর কৃষির সাফল্য নির্ভর করে। আবার মাটির উর্বরতা নির্ভর করে জৈব পদার্থ, জল, বায়ু, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির অবস্থিতি, জলধারণ ক্ষমতা বা জল নিকাশের উপযুক্ততা, দৃঢ়তা অর্থাৎ সহজে যাহাতে ফাটিয়া না যায় এবং সহজ চাষ ক্ষমতার উপর। উর্বরতা বিচার করিয়া চাষের জমি, বাসের জমি, অরণ্যভূমি ও পশুচারণ প্রভৃতি নির্বাচন করিয়া কাজে অগ্রসর হইলে জমির সদ্ব্যবহার হইতে পারে এবং মানুষের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। ৭৭ পৃষ্ঠার মানচিত্রে মাটির পরিচয় প্রদত্ত হইল।

Q. 3. Give a short account of the differeut kinds of soil of India,

(ভারতের বিভিন্ন প্রকার মাটির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও)

Ans: গুণাগুণ ভেদে ভারতে নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকারের মাটি দেখিতে পাওয়া যায় :

(১) **পলি মাটি (Alluvial Soil)** : নদীবাহিত মাটিকে পলি মাটি বলে। এই মাটি রাসায়নিক গুণযুক্ত, সূক্ষ্ম ও বেশ উর্বর। ইহাতে ধান, পাট, ইক্ষু, গম,

ভুট্টা, তুলা প্রভৃতি ভাল উৎপন্ন হইতে পারে। ভারতের নদী উপত্যকা ও বদ্বীপ অঞ্চলে এই মাটি দেখিতে পাওয়া যায়।

(২ কাল মাটি (Black Soil) : রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়ায় আগ্নেয়গিরি নিঃসৃত লাভা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এই মাটির সৃষ্টি হইয়াছে। এই মাটি শক্ত, জলধারণক্ষম ও রাসায়নিকগুণবিশিষ্ট এবং উর্বর। তুলাই এ মাটির আদর্শ ফসল। এজন্য ইহাকে Black Cotton Soilও বলা হয়। তুলা ছাড়া গম, তিসি, জোয়ার ও বাজরাও ইহাতে উৎপন্ন হয়। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র ও মাদ্রাজে এই মাটি দেখিতে পাওয়া যায়।

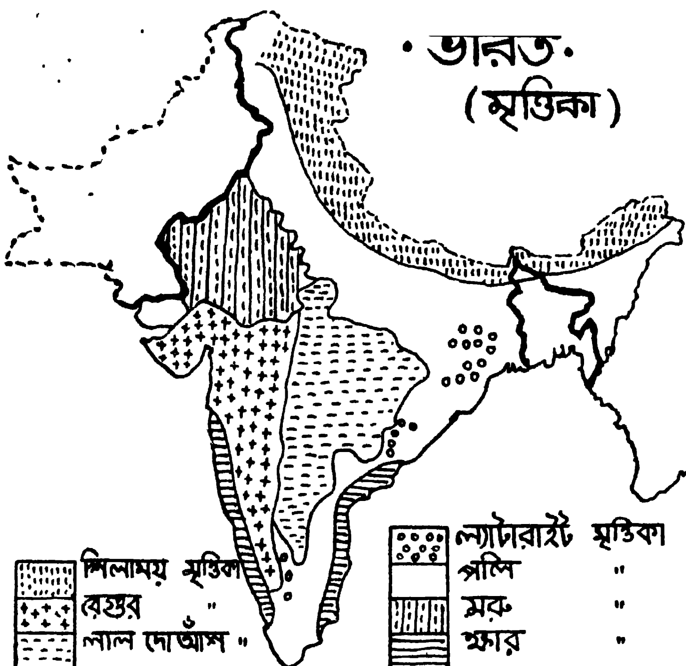
(৩) বালুকা সংযুক্ত লাল রংয়ের আঁঠাল মাটি (Laterite Soil) : এই মাটির মধ্যে গাঢ় লাল রংয়েরগুলি উর্বর এবং ফিকে লাল রংয়েরগুলি অনুর্বর। উর্বর অংশে গম, তৈলবীজ, তুলা প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারে। পূর্ব ও পশ্চিম ঘাট পর্বতের উপত্যকায়, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের কোন কোন স্থানে এ মাটি দেখিতে পাওয়া যায়।

(৪) লাল মাটি (Red Loams) : এই মাটিতে লৌহের ভাগ বেশী এবং জৈবপদার্থের পরিমাণ কম থাকে। ইহার জলধারণক্ষমতাও কম এবং উর্বরতাও সর্বত্র একপ্রকার নহে। ফলে ইহার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধানই এ মাটির প্রধান ফসল। ইহা ছাড়া ইক্ষু, তুলা, চীনাবাদাম প্রভৃতিও উৎপন্ন হয়। মাদ্রাজ, মহীশূর, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বিহারের ছোটনাগপুর ও পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় এই মাটি দৃষ্ট হয়।

(৫) কফি মাটি (Coffee Soil) : ইহা উদ্ভিদখাদ্য পুষ্ট দোঁয়াশমাটি এবং কফি উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ গুণযুক্ত বলিয়া উহার ঐরূপ নামাকরণ হইয়াছে। নীলগিরি ও পশ্চিমঘাট পর্বতের ঢালু অংশে এই মাটি দেখিতে পাওয়া যায়।

(৬) পার্বত্য মাটি (Mountain Soil : হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট মাটি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে হিমরেখার নীচে জলীয় বাষ্প সংরক্ষণ ক্ষমতাযুক্ত হিমবাহ (Glacial) মাটি দেখিতে পাওয়া যায়। উহার নীচে হিমবাহ হইতে পরিত্যক্ত চলন্ত শিলা (Moraines) বিভিন্ন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাকে Boulder Clay বলে। ইহার নীচে সাধারণতঃ অনুর্বর পডসল (Podsol) মাটি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে সরলবর্গীয় বৃক্ষের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। গাছপালা ও আলু ছাড়া ইহাতে অন্য কিছু উৎপন্ন করা কঠিন। ইহার নীচে কোন কোন স্থলে উপত্যকা অংশে পলিমাটি,

অপসৃত মাটি, (Transported Soil) এবং **অবশিষ্ট মাটি** (Residual Soil) দেখিতে পাওয়া যায়। মাটির বিভিন্নতার জন্য উৎপন্ন দ্রব্যও বিভিন্ন প্রকার হয়।



(৭) **উপকূলীয় মাটি (Littoral Soil) :** সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানে এবং নদী-বদ্বীপ অঞ্চলে এই মাটি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কর্দমাক্ত ও লবণাক্ত কিন্তু উর্বর। নানাপ্রকার গাছপালাও এ মাটিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুন্দরবনের মাটি এ জাতীয়।

(৮) **মরুভূমির মাটি (Desert Soil) :** এই মাটি বালুকাময়। ইহা উর্বর কিন্তু শুষ্ক। 'জন্য জলসেচ ভিন্ন এখানে কৃষিকার্য্য সফলতা লাভ করিতে পারে না। রাজপুতনার থর মরুভূমিতে এরূপ মাটির আধিক্য। উপরের মানচিত্রে ভারতের মাটির সংস্থান দেখান হইল।

Q. 4. Discuss the problem of soil erosion. What are the causes of soil erosion? How can it be remedied?

(ভূমিক্ষয় সমস্যা আলোচনা কর। ভূমিক্ষয়ের কারণ কি? উহা কি উপায়ে প্রতিকার করা যাইতে পারে?)

Ans : নানা প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক উপায়ে পৃথিবীপৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। কতক পরিবর্তন আকস্মিক, আর কতক পরিবর্তন ধীরে ধীরে লোকের দৃষ্টির অগোচরে সংঘটিত হইতেছে। পৃথিবীপৃষ্ঠের এই পরিবর্তনের ফলে ভূমিক্ষয়ও সংঘটিত হইতেছে। ভূমিক্ষয় কৃষিকার্যের পরম শত্রু। ইহা ভূমির উর্বরতা হ্রাস করে। ফলে ভূমি কৃষির পক্ষে অকেজো হইয়া পড়ে। এই ঘটনা পৃথিবীর সবদেশেই সংঘটিত হইতেছে। কোনও স্থানে উহা প্রবলাকার ধারণ করে, আবার কোন স্থানে উহার কার্য্য ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। একদা পরিমাপ করিয়া দেখান হইয়াছে যে যুক্তরাষ্ট্রে মিসৌরীর কৃষিজমির ৭ইঞ্চি পরিমিত মাটি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অপসারিত হইয়াছে, কিন্তু তৃণাচ্ছাদিত অঞ্চলে সেই ৭ ইঞ্চি পরিমিত মাটি অপসারিত হইতে, ৩৫৪৭ বৎসর লাগিয়াছে।

ভূমিক্ষয়ের কারণ নানাবিধ। কতকগুলি প্রাকৃতিক এবং কতকগুলি অপ্রাকৃতিক বা মানুষের সৃষ্টি। প্রাকৃতিক কারণগুলির মধ্যে রৌদ্র, বায়ু, বৃষ্টি, নদী, হিমবাহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অপ্রাকৃতিক কারণগুলির মধ্যে অরণ্যনাশ, তৃণভূমিতে অত্যধিক পশুচারণ, অবৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি, রাস্তা ও রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতি। ক্রমাগত একই জমিতে কৃষিকার্য্য চলিতে থাকিলেও ভূমিক্ষয় হয় এবং জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। অবশ্য শস্য উৎপাদনের জন্য যে মাটির উর্বরতা হ্রাস পায় তাহা সর্বত্র একরূপ নহে। চীনে ও মিশরে বহু বৎসর যাবৎ একই জমিতে চাষ আবাদ চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু উহার উর্বরতা প্রায় ঠিকই আছে। আবার তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকা এককালে খুবই শস্যশ্যামল ছিল। বর্তমানে উহা মরুপ্রকৃতি। সুতরাং যে সমস্ত স্থানে ভূমিক্ষয় এবং জমির উর্বতা হ্রাস অনায়াসে প্রাপ্ত হয় তথায় উপযুক্ত ব্যবস্থা দ্বারা ভূমিক্ষয় নিবারণ করিয়া জমির উর্বতা বজায় রাখা কৃষিকার্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্য অত্যাবশ্যক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অবশ্য ভূমিক্ষয় নিবারণের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য : (১) বনভূমির সংরক্ষণ ও উৎকর্ষসাধন, (২) তৃণ উৎপাদন, (৩) মৃত্তিকা আচ্ছাদনকারী শস্য উৎপাদন, (৪) বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভূমিকর্ষণ, (৫) বাঁধ দিয়া নালাগুলি আটকান ইত্যাদি।

Q. 5. Describe the geographical conditions favourable for the cultivation of Paddy. What are the various uses to which this commodity is put ? (C. U. Pre. 1961.)

(ধান উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থাগুলি বর্ণনা কর। ধান কি কি কাজে লাগে ?)

Ans : ধান উৎপাদনের জন্য নিম্নলিখিত ভৌগোলিক অবস্থাগুলি বিশেষ প্রয়োজন :

(১) ইহা ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলের ফসল। এজন্য ইহার উৎপাদনের জন্য প্রচুর উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। বীজবপন হইতে ফসল পাকিবার সময় পর্যন্ত ইহার সাধারণতঃ ৩।৪ মাস সময় লাগে। ধান গাছ বৃদ্ধির সময় উত্তাপের প্রয়োজন ৭০°—৭৫ ফাঃ এবং বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন ৪৫ হইতে ৮০"। ধান পাকিবার সময় শুষ্ক আবহাওয়ার প্রয়োজন। অন্ততঃ ৬৮ ফাঃ উত্তাপ না হইলে ধানের অঙ্কুর বাহির হয় না।

(২) নদী উপত্যকা, বদ্বীপ ও নিম্নউপকূলভাগ ধান চাষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। পর্বতের ধাপে ধাপেও ধান চাষ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সমস্ত স্থানে ইহার আবাদ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করিতে পারে না। সমতল ভূমিই ধান চাষের আদর্শস্থল।

(৩) ধান গাছ বৃদ্ধির সময় জমিতে জল দাঁড়াইলে ফলন ভাল হয়।

(৪) ধান চাষের পক্ষে পলল বা কাদাযুক্ত দোঁয়াশ মাটি সর্বাপেক্ষা ভাল। দোঁয়াশ মাটির সহিত কাদা থাকিলে জল সহজে সরিয়া যাইতে পারে না। ধান গাছের গোড়ার এই আর্দ্রতা উহার সতেজ হওয়ার উপযোগী।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভৌগোলিক অবস্থা অনুযায়ী প্রায় ১১০০ রকমের ধানের চাষ হইয়া থাকে। সুতরাং উপরিউক্ত অবস্থা যে সব ধানের পক্ষে সমভাবে প্রয়োজ্য একথা বলা চলে না। ধানকে দুইভাগ করিলে প্রথমতঃ উহাকে বলা চলে পার্বত্য অঞ্চলের ধান এবং দ্বিতীয়তঃ সমভূমি অঞ্চলের ধান। উপরিউক্ত অবস্থাগুলি সমভূমির ধানের পক্ষে বেশী প্রযোজ্য। আবার আমাদের দেশে সমভূমির ধানকে আউস, আমন ও বোরো এই তিনশ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এই বিভাগ অনুযায়ী উপরিউক্ত অবস্থাগুলি আমন ধানের পক্ষেই বেশী সুবিধাজনক। ইহা বর্ষাকালে চাষ হয় এবং হেমন্তকালে কর্তন হয়। আউস ধান খুব তাড়াতাড়ি ফলে। ইহা গ্রীষ্মের প্রারম্ভে বৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবাদ করা হয় এবং বর্ষাকালে কাটা হয়। আউস ধানের জন্য প্রথম দিকে কম এবং আমন ধানের জন্য প্রথম দিকে বেশী বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। বোরো ধান শীতকালে খুব নীচু জমিতে বা নদীর জলসন্নিকটে কাদামাটিতে

আবাদ করা হয় এবং গ্রীষ্মের প্রারম্ভে কাটা হয়। অন্যান্য ধানের তুলনায় আমন ধানের আবাদ সর্বাধিক। এজন্য ধানের ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে আমন ধান চাষের অনুকূল অবস্থার উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়।

(৫) ধান চাষের অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থা ছাড়া রোপণ, বপন, তত্ত্বাবধান কর্তন, মাড়াই করার পর গোলাজাত ও অন্যত্র চালানের জন্য প্রচুর, সুলভ শ্রমিক দরকার। মৌসুমী অঞ্চলে সুলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য্য হেতু এখানেই ধানের আবাদ সর্বাধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

(৬) উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাতের অভাব হইলে জলসেচ প্রয়োজন। তাহা ছাড়া ভাল ফলনের জন্য জমিতে সার প্রয়োগ, ভাল বীজ সংগ্রহ, উন্নত প্রণালীর কৃষি ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রয়োজন।

ধানের ব্যবহার নানাপ্রকার ঃ

(১) ধান হইতে চাউল প্রস্তুত হয়। চাউল পৃথিবীর অর্ধেক লোকের প্রধান খাদ্য।

(২) ইহা হইতে মুড়ি, চিড়া, খই, পিষ্টক ইত্যাদি নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়।

(৩) চাউল শ্বেতসার ও মদ্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

(৪) ধানের খড় বা বিচালি গরু-মহিষের প্রধান খাদ্য। উহা ঘরের ছাউনি দেওয়ার জন্যও ব্যবহৃত হয়।

(৫) চটি, টুপী ও ঐ জাতীয় নানাপ্রকার জিনিসও খড় হইতে প্রস্তুত হয়।

(৬) ধানের খোসা বা তুষ গদি প্রস্তুত করিতে এবং খড়, তুষ প্রভৃতি মোড়াইয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়।

(৭) চাউল পরিষ্কার করার সময় যে কুঁড়া বাহির হয় উহাও পশুর পুষ্টিকর খাদ্য।

(৮) ভাতের মারও গৃহপালিত পশুর খাদ্য এবং বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে ও ধোলাইয়ে ব্যবহৃত হয়।

(৯) ধানের খোসা সিমেন্টের সহিত মিশ্রিত করিয়া শব্দনিরোধক দেওয়াল প্রস্তুত করা হয়।

Q. 6. Give a brief account of the world distribution of Rice (Paddy) and its international trade with special reference to India

(ভারতের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া পৃথিবীর ধানের বণ্টন ও উহার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিবরণ দাও।)

Ans : প্রধান প্রধান ধান উৎপাদক দেশগুলি এশিয়া মহাদেশের মৌসুমী

অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চলে মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পৃথিবীর নিম্নলিখিত দেশগুলি ধান উৎপাদনে উখেল্লযোগ্য :

(১) এশিয়া মহাদেশে

(ক) চীন—ইহাই ধান উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। চীনের অধিকাংশ ধান ইয়াংসি ও সিকিয়াং নদীর অববাহিকা অঞ্চলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।



পৃথিবীর ধান্য উৎপাদক অঞ্চল সমূহ

(খ) ভারত ইহার স্থান দ্বিতীয়। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, অন্ধ্র ও বিহার রাজ্যে ব্যাপকভাবে ধানের চাষ হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও কেরালা রাজ্যেও ধানের চাষ মোটামুটি হইয়া থাকে। পাঞ্জাবে সেচের সাহায্যে ধান উৎপন্ন হয়। অন্যান্য রাজ্য এবং পার্বত্য অঞ্চলেও ধানের চাষ হয়, তবে উহার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। ১৯৬১—৬২ সালে ভারতে প্রায় ৫ কোটি ১৩ লক্ষ টন উৎপন্ন হয়। ধান উৎপাদনে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অবস্থা মোটামুটি নিম্নরূপ দেখিতে পাওয়া যায় :

পশ্চিমবঙ্গ	৪৫ লক্ষ টন	আসাম	১৬ লক্ষ টন
অন্ধ্র	৩০ ” ”	মহারাষ্ট্র	১৪ ” ”
মধ্যপ্রদেশ	২৯ ” ”	মহীশূর	১১ ” ”
বিহার	২৬ ” ”	কেরালা	·৯ ” ”
মাদ্রাজ	২৫ ” ”	পাঞ্জাব	·২ ” ”
উত্তরপ্রদেশ	২৪ ” ”	রাজস্থান	·৮৬ ” ”

(গ) জাপান—ইহার মধ্যভাগের হনসু দ্বীপ ও দক্ষিণাংশ ধান উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য।

(ঘ) পাকিস্তান—পূর্ব পাকিস্তানের সমতল ভূমির সর্বত্রই ধান চাষ হয়। ইহা ছাড়া পশ্চিম পাকিস্থানের সিন্ধু নদীর বদ্বীপে সেচের সাহায্যে ধান উৎপাদন হইয়া থাকে।

(ঙ) ইন্দোনেশিয়া—ইহার জাভা ও সুমাত্রাদ্বীপ ধান উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য।

(চ) থাইল্যাণ্ড—ইহার মেনাম নদীর বদ্বীপ ধান উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য।

(ছ) ব্রহ্মদেশ—ইহার চিন্দুইন, সালইউন ও ইরাবতী নদীর বদ্বীপ অঞ্চল ও আরাকানের উপকূল ভাগ ধান উৎপাদনে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(জ) ইন্দোচীন—ইহার মেকং, কাম্বোডিয়া ও লোহিত নদীর বদ্বীপ অঞ্চল।

(ঝ) ইহা ছাড়া ফিলিপাইনের লুজন দ্বীপ, কোরিয়ার দক্ষিণ অংশ, মালয়, ফরমোজা প্রভৃতি অঞ্চলেও ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ধান উৎপাদনের অবস্থা নিম্নরূপ দেখিতে পাওয়া যায়:

(৯৬১-৬২)

পৃথিবীর মোট উৎপাদন ২৩ কোটি ৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন।

চীন	৮ কোটি	৫০	লক্ষ	টন	ইন্দোনেশিয়া	১ কোটি	৩৫	লক্ষ	টন
ভারত	৫ "	১৩	"	"	থাইল্যাণ্ড		৭৭	"	"
জাপান	১ "	৬১	"	"	ব্রহ্মদেশ		৬৯	"	"
পাকিস্তান	১ "	৬০	"	"	ভিয়েৎনাম		৪৮	"	"

ফিলিপাইন (১৯৫৮) ৩২ লক্ষ টন

এশিয়ার বাহিরে:

(২) ইউরোপ—এই মহাদেশের ইতালির পো নদীর অববাহিকা, স্পেনের এব্রো নদীর অববাহিকা, যুগোশ্লাভিয়ার নিম্নভূমি ও রাশিয়ার দক্ষিণে ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(৩) উত্তর আমেরিকা—এই মহাদেশের মিসিসিপি নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চল এবং কালিফোর্ণিয়া, টেক্সাস, মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ধান উৎপন্ন হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন প্রায় ২৫ লক্ষ টন (১৯৬০)।

(৪) দক্ষিণ আমেরিকা—এই মহাদেশের ব্রাজিলের উপকূল, (উৎপাদন ৩৮ লক্ষ টন ১৯৫৮ ব্রিটিশ গিয়ানা ও পেরুতে কিছু ধান উৎপন্ন হইতেছে।

(৫) আফ্রিকা—এই মহাদেশের নীল নদের ব-দ্বীপ ও সিয়ারা লিয়নে ধান জন্মিয়া থাকে।

(৬) অস্ট্রেলিয়ার মারে-ডার্লিং নদীর অববাহিকায় কিছু ধান উৎপন্ন হয়।

ধানের ফলনের পরিমাণ দেখিয়া উহার উৎপাদনের উৎকর্ষ বুঝিতে পারা যায় না। ভারত ধান উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেও উহার প্রতি একরে উৎপাদন অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। ভারতে প্রতি একরে গড়ে ১২ মণ ধান উৎপন্ন হয় কিন্তু জাপানে, চীনে, ইতালি ও স্পেনে প্রতি একরে গড়ে প্রায় ৩৫।৪০ মন ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। পৃথিবীর গড় একর প্রতি উৎপাদন প্রায় ১৮ মণ। সাধারণতঃ উচ্চতর অক্ষাংশে অবস্থিত দেশগুলির ধানের ফলন প্রতি একরে বেশী দেখিতে পাওয়া যায় যদিও উক্ত অঞ্চলে ধানের জমির পরিমাণ কম।

চাউলের আন্তর্জাতিক ব্যবসা—

সাধারণতঃ মোট উৎপাদনের শতকরা ৭।৮ ভাগ চাউল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। চীন, ভারত, পাকিস্তান, জাপান ও ইন্দোনেশিয়াব উৎপাদন বেশী হইলেও ঘনবসতি বলিয়া চাহিদা বেশী। ফলে এ সকল দেশ হইতে খুব কমই চাউল রপ্তানি হইয়া থাকে। প্রধান রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে বিরল বসতিপূর্ণ ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহারাই রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ৯০ ভাগের উপর দখল করিয়া আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও কিছু চাউল রপ্তানি করে। প্রধান আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে ভারত, সিংহল, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। চাউল রপ্তানি বন্দরগুলির মধ্যে ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন, বেসিন, মৌলমিন ও আকিয়াব, থাইল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কক, ইন্দোচীনের সাইগন ও হাইফং এবং আমদানি বন্দরগুলির মধ্যে জাপানের কোবে ও ইয়োকোহামা, সিংহলের কলম্বো, ভারতের মাদ্রাজ ও কলিকাতা, পাকিস্তানের চট্টগ্রাম ও করাচী, ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

Q. 7. What are the conditions favourable for the cultivation of Rice? Mention the regions in India where Rice is grown. Give an idea of the world trade in this commodity.

(C. U. Pre. 1963)

Ans : See Qs. 5 and 6 above.

Q 8. Describe the geographical conditions necessary for the cultivation of wheat. Give an account of its world distribution. (C. U. Inter. 1957)

(গম চাষের প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা কর এবং পৃথিবীব্যাপী উহার বণ্টনের বিবরণ দাও।

Or

What are the conditions favourable for the cultivation of wheat? Give an idea of the world trade in this commodity. (Pre. C. U. 1962)

গম চাষের জন্য কি কি অবস্থা প্রয়োজন? উহার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিবরণ দাও।

Ans: ১। প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক অবস্থা (Geographical conditions necessary)

গম উৎপাদনের জন্য নিম্নলিখিত ভৌগোলিক অবস্থা প্রয়োজন:

(১ গম নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফসল।

(২) ইহার উৎপাদনের জন্য ৪০° ফা হইতে ৬০ ফা. উত্তাপ এবং ১৫' হইতে ৪০' বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। ইহা উৎপাদনের জন্য অন্ততঃ তিনমাস কাল গড় উত্তাপ ৬০ ফা। হইলে ভাল হয়। কারণ ১১০ টী তুহিন মুক্ত দিবস ইহার আবাদের জন্য পাওয়া প্রয়োজন। বৃষ্টিপাতও অপেক্ষাকৃত শীতপ্রধান স্থানে ১৫"—৩০" হইলে চলে এবং অপেক্ষাকৃত উষ্ণস্থানে ২০"—৪০" প্রয়োজন।

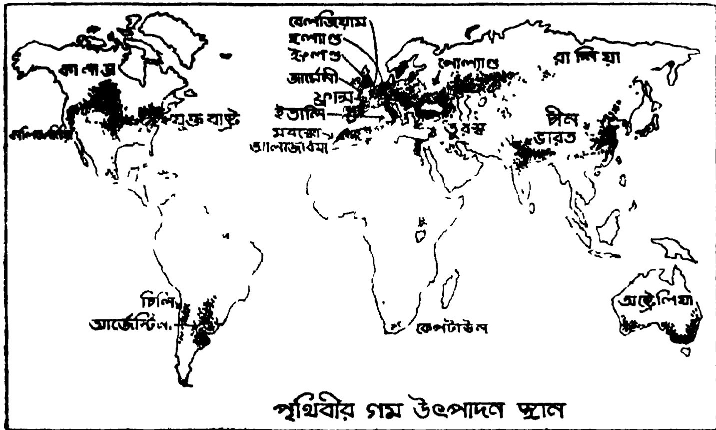
(৩) প্রধান প্রধান গম উৎপাদক অঞ্চল সাধারণতঃ ৩৫'—৫৫' অক্ষাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমি ও ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু গম উৎপাদনের আদর্শস্থল।

(৪) ইহাতে বীজবপন ও অঙ্কুরোদগম হইতে শস্য কর্তন সময় পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপ আবহাওয়ার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। বীজ বপন ও প্রথম অঙ্কুর হওয়ার সময় আর্দ্র ও শীতল আবহাওয়া, অঙ্কুর বৃদ্ধির সময় সামান্য শুষ্কতা ও উষ্ণতা, ফল পাকিবার পূর্বে সামান্য বৃষ্টিপাত এবং শস্য কাটিবার সময় বৃষ্টিহীন শুষ্ক আবহাওয়া গম চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল।

(৫) নরম কাদামাটি, কালমাটি (Charnozem) কিংবা ভারী দোঁয়াশ মাটি

গমের চাষের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। জমিতে জলনিকাশের ব্যবস্থা থাকা চাই। এজন্য কিঞ্চিৎ ঢালু সমতল ভূমি হইলে আবাদ ভাল হয়।

(৬) ইহা ছাড়া বৃষ্টিপাতের অভাব ঘটিলে জলসেচ ব্যবস্থা চাই। পৃথিবীর অনেক স্থানে যেমন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার যন্ত্রপাতির সাহায্যে ব্যাপকভাবে গম চাষ হইতেছে। কিন্তু ভারতের মত দেশে যেখানে কৃষিযন্ত্রের ব্যবহার কম সেখানে রোপন, তত্ত্বাবধান ও কর্তন প্রভৃতির জন্য সুলভ শ্রমিক প্রচুর প্রয়োজন। ইহা ছাড়া জমিতে সার প্রয়োগ, ভাল বীজ সংগ্রহ প্রভৃতিও গম চাষের উৎকর্ষের জন্য প্রয়োজন।



পৃথিবীর গম উৎপাদন স্থান

২। গম উৎপাদক অঞ্চল (Areas of Production):

পৃথিবীর নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলি গম উৎপাদনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য:

(১) উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ প্রেইরি সমভূমি, মিসিসিপি নদীর অববাহিকা ও কালিফোর্নিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, কানাডার ম্যানিটোবা, স্যাসকাচুয়ান ও আলবার্টার প্রেইরি অঞ্চল। মেক্সিকোতেও সামান্য পরিমাণ উৎপন্ন হয়।

(২) দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনার পাম্পাস সমভূমি অঞ্চল ও চিলির ভূমধ্যসগরীয় অঞ্চল।

(৩) আফ্রিকার নীল নদের নিম্ন অববাহিকা, ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুবিশিষ্ট মরক্কো, আলজেরিয়া, টিউনিসিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন অঞ্চল এবং ভেল্ড মালভূমি।

(৪) ইউরোপের রাশিয়ার ইউক্রেন, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড, উত্তর ইতালি, ফ্রান্সের সমভূমি, জার্মানী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ইংলণ্ড।

(৫) এশিয়ার ভারতের গঙ্গার উচ্চ অববাহিকা, পাকিস্তানের সিন্ধুর অববাহিকা, তুরস্ক, উত্তর চীন, জাপান ও মাঞ্চুরিয়া।

(৬) অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বের ভিক্টোরিয়া ও নিউ সাউথ ওয়েলসের ডাউনস সমভূমি এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল।

নিম্নে পৃথিবীর গম উৎপাদনের অবস্থা দেওয়া হইল :

(১৯৬১-৬২)

রাশিয়া	৬ ৩৭	কোটি টন	ভারত	১.৬	কোটি টন
যুক্তরাষ্ট্র	৩ ৬৭	„ „	ইতালি	.৮৪	„ „
চীন	৩.১৩	„ „	তুরস্ক	৭৯	„ „
কানাডা	১ ১৩	„ „	অষ্ট্রেলিয়া	.৭৪	„ „
ফ্রান্স	১ ১০	„ „	আর্জেন্টিনা	.৫৮	„ „

পৃথিবীর মোট উৎপাদন ২৪ ৩৭ কোটি টন।

৩। গমের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade) :

সমগ্র গম উৎপাদনের প্রায় ১৫ শতাংশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রবেশ করে। বর্তমানে অবশ্য গম রপ্তানি বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হইতেছে। প্রধান রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র (৪২%), কানাডা (২৩%), অষ্ট্রেলিয়া (৩%) এবং আর্জেন্টিনা ১০%) প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাশিয়াও বর্তমানে কিছু গম রপ্তানি করিতেছে। প্রধান আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, ভারত, জাপান প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর প্রধান প্রধান গম রপ্তানি বন্দরগুলির মধ্যে কানাডার মন্ট্রিল, হ্যালিফাক্স, চার্চিল, ফোর্ট উইলিয়াম ও ভাঙ্কুবার, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক ও বোষ্টন, অষ্ট্রেলিয়ার সিডনি, এডিলেড, মেলবোর্ণ, রাশিয়ার ওডেসা, আর্জেন্টিনার বুয়েনাস আয়ারস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আমদানি বন্দরগুলির মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনের লিভারপুল, লণ্ডন ও গ্লাসগো, জার্মেনীর হামবুর্গ, বেলজিয়ামের আন্তয়ার্প, হল্যাণ্ডের রটারডাম, ফ্রান্সের বোর্ডো, চারবুর্গ, হাভার, মার্সেলিস, ইতালির নেপলস্, জেনেভা ভারতের বোম্বাই, কলিকাতা, জাপানের টোকিও, ইয়োকোহামা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

Q. 9. what are the uses of Wheat? (গম কি কি কাজে লাগে?)

Ans: গমের ব্যবহার নিম্নরূপ ঃ

(১) ইহা মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য। উষ্ণ মণ্ডলে যেমন চাউল, নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে, তেমন গমই প্রধান খাদ্য। খাদ্যশস্য হিসাবে চাউল অপেক্ষা গম অধিক পুষ্টিকর। ইহাতে প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট উভয়ই খাদ্যের পুষ্টিকারিতা রক্ষা করিয়া আছে।

(২) ইহা আটা, ময়দা, সুজি প্রভৃতিতে পরিবর্তন করিয়া ব্যবহার করা হয়।

(৩) ইহা পাউরুটি, বিস্কুট, পিষ্টক, সেমাই প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেও ব্যবহৃত হয়।

(৪) ইহা হইতে শ্বেতসার, গ্লুকোজ, মাড ও আঠাও প্রস্তুত হয়।

(৫) ইহার খড় গরু-মহিষের খাদ্য এবং আস্তাবলের আচ্ছাদন হিসাবেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৬) বোর্ড ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর ও মোড়কের জন্য কাগজ প্রস্তুত করিতেও ইহার খড় ব্যবহার করা চলে।

(৭) চেয়ারে বসিবার আসন এবং হাল্কা অথচ শক্ত টুপী প্রস্তুত করিতেও গমের খড় প্রয়োজন হয়।

Q. 10. In what respects does winter wheat differ from spring wheat? What are the regions where the two varieties are cultivated? By what methods and practices is the cultivation of wheat being extended in the drier and eolder regions?

(বসন্তকালীন ও শীতকালীন গমের মধ্যে পার্থক্য কি? কোন্ কোন্ অঞ্চলে দুই প্রকার গমেরই আবাদ হয়। কি উপায়ে শুষ্কতর ও শীতলতর স্থানে গমের আবাদ বৃদ্ধি পাইতেছে?)

Ans: ঋতুভেদে আবাদ ও কর্তনের জন্য গমকে বসন্তকালীন ও শীতকালীন এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। বীজের প্রকৃতির বিভিন্নতা হিসাবে ইহাকে এভাবে ভাগ করা হয় না। একই বীজ ক্রমান্বয়ে ব্যবহারের ফলে বসন্তকালীনকে শীতকালীনে এবং শীতকালীনকে বসন্তকালীনে রূপান্তর করা চলে। যে গম বসন্তকালে বপন করিয়া গ্রীষ্মের শেষে কর্তন করা হয় তাহাকে বসন্তকালীন গম বলে। আবার যে গম শরৎকালে বপন করিয়া গ্রীষ্মকালে কর্তন করা হয় তাহাকে

শীতকালীন গম বলে। অধিক শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বসন্তকালীন গম বপন করা হয়। শীতকালে ঐসমস্ত স্থানে তুষারপাত হয় এবং মাটির নীচের জলও কখনও কখনও তুষারে পরিণত হয়। ফলে শরৎকালের শেষে বপন করিলে উহার বীজ নষ্ট হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শীতকালীন গম উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বপন করা হয়। এ অঞ্চলের শীতকালে গমের জমি তুষারমুক্ত থাকে এবং ঐ শীতকাল গমের আবাদ ও বৃদ্ধির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিয়া থাকে।

আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, ভারত ও পাকিস্থানে শীতকালীন গম উৎপন্ন হয়। কানাডায় কেবলমাত্র গ্রীষ্মকালীন গম উৎপন্ন হয়। কিন্তু রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রে উভয় প্রকার গমই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শুষ্কতর স্থানে জলসেচ, সার প্রয়োগ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গমের আবাদ বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহা ছাড়া শুষ্ক কৃষি (dry farming) পদ্ধতির এবং যে বীজ উত্তাপ সহ্য করিতে পারে এরূপ বীজের সাহায্যেও শুষ্কতর অঞ্চলে গমের চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে।

যে বীজ অল্পসময়ের মধ্যে গমের গাছে ফসল ফলাইতে পারে সেই ধরণের বীজ লইয়া শীতলতর স্থানে গমের চাষ হইতেছে। ইহা ছাড়া কৃষিযন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর (Vernalisation process) সাহায্যে এবং যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে অনেক শীতলতর স্থানে গমের চাষ হয়। কানাডা ও রাশিয়া এইভাবে ৯০ দিনের মধ্যে গম উৎপাদনে সক্ষম হইয়াছে। এখানে কোন কোন স্থানে বিশেষত উত্তরের দিকে বসন্তের শেষে বীজ বপন করিয়া শরতের প্রারম্ভে ফসল কাটা হইয়া থাকে।

Q. 11. Give a short account oi the wheat production in India

(ভারতে গম উৎপাদনের একটি বিবরণ দাও)

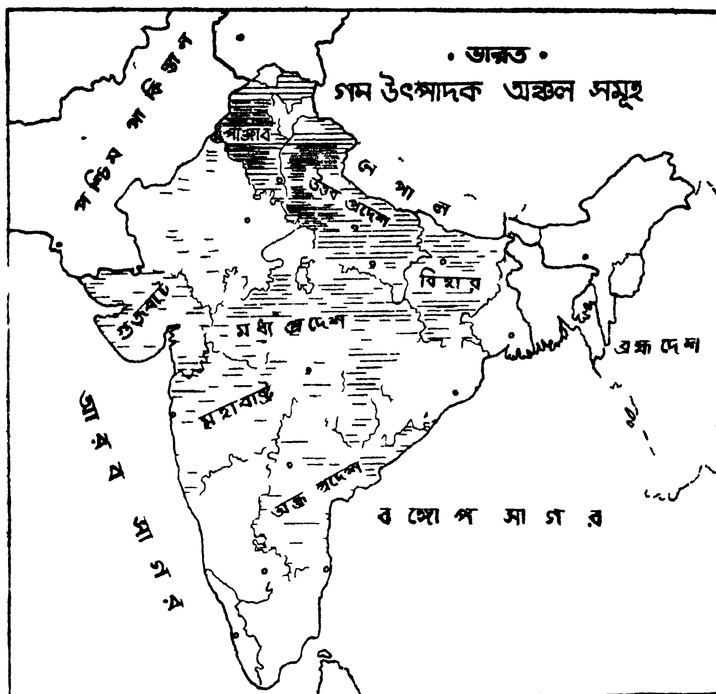
Or

Mention the regions in the Indian union where wheat is grown (Pre—C. U. 1962).

(ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গম উৎপাদক অঞ্চলগুলির নাম উল্লেখ কর)

Ans : গম ভারতের একটি প্রধান খাদ্যশস্য। খাদ্যশস্য হিসাবে উত্তর ভারতেই ইহার প্রাধান্য বেশী। তবে আজকাল চাউলের অভাব বেশী অনুভূত হওয়ায় ভারতের সর্বত্র খাদ্য হিসাবে গমের প্রচলন বাড়িয়া গিয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে গমের ভিতরই চাউল অপেক্ষা খাদ্যপ্রাণ বেশী এবং ফলে ইহা অধিকতর পুষ্টিকর।

গম নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফসল। ভারতেও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেই ইহার চাষ বেশী প্রসার লাভ করিয়াছে এবং এজন্য গমের চাষে উত্তর ভারতই সমধিক উল্লেখযোগ্য। এখানে গমের উপযোগী শুষ্ক ও শীতল আবহাওয়া বর্তমান। বৃষ্টিপাতও



২০'—৪০ এর মধ্যে। যেখানে বৃষ্টিপাত কম অনুভূত হয় সেখানে জলসেচের ব্যবস্থা আছে। শীতের সামান্য বৃষ্টিপাত ইহার উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি করিয়া থাকে।

উত্তর ভারতে গম চাষের উপযোগী গঙ্গার ও অন্যান্য নদীর অববাহিকা দোঁয়াশ পলিমাটি গঠিত। গম চাষে ভারত উল্লেখযোগ্য হইলেও প্রতি একরে ফলন এখনও আশারূপ বৃদ্ধি পায় নাই। গমের ফলন বৃদ্ধির জন্য দিল্লীর 'পুষাতে' একটি গবেষণাগার আছে। এই গবেষণাগারের চেষ্টায় ফসল অনেকটা বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন

ভারতে প্রতি একরে গম উৎপাদন মাত্র ৬০০ পাউণ্ড। অথচ প্রতি একরে উহার উৎপাদন হল্যাণ্ডে ৩০০০ পাঃ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১১৫০ পাঃ, অস্ট্রেলিয়ায় ১০০০ পাঃ চীনে ৯৫০ পাউণ্ড এবং রাশিয়ায় ৮৫০ পাউণ্ড।

ভারতে গমের উৎপাদন প্রায় ১ কোটি ৬ লক্ষ টন (১৯৬১-৬২)। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উহার উৎপাদন মোটামুটি নিম্নরূপ :

উত্তরপ্রদেশ	৩০ লক্ষ টন	মহীশূর	৮১ হাজার টন
পাঞ্জাব	১৭ ” ”	জম্মু ও কাশ্মীর	৭৪ ” ”
মধ্যপ্রদেশ	১৪ ” ”	পশ্চিমবঙ্গ	৪৩ ” ”
রাজস্থান	৯ ” ”	অন্ধ্র	১০ ” ”
মহারাষ্ট্র	৭ ” ”	উড়িষ্যা	৩ ” ”
বিহার	৪ ” ”	আসাম	১ ” ”

মাদ্রাজ ১ হাজার টন

গম উৎপাদনে ভারত এখনও স্বয়ং সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। প্রতি বৎসর যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া হইতে ভারত গম আমদানি করিতেছে। ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ৫ বৎসর জন্য যে চুক্তি হইয়াছে তাহাতে ভারতে প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ টন খাদ্য শস্য আমদানির ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু উক্ত খাদ্যশস্যের মধ্যে অধিকাংশই গম। বোম্বাই ভারতের প্রধান গম আমদানি বন্দর।

Q, 12. Give an idea of the geographical conditions under which rice and wheat are cultivated in different parts of India. What are the measures adopted that have resulted in an improvement of rice and wheat production in the country ?

(যে সমস্ত ভৌগোলিক অবস্থার জন্য ভারতের বিভিন্ন অংশে ধান ও গম জন্মে তাহার একটী বিবরণ দাও। ধান ও গম উৎপাদনের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে যাহার ফলে উহাদের উৎপাদনে উন্নতি দেখা যাইতেছে ?)

Ans : ধান ও গম ভারতের সর্বপ্রধান খাদ্যশস্য। ভারতে উহাদের উৎপাদন নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে :

১। ধান

(ক) ভারতের অনেক অঞ্চল ধান চাষের উপযোগী। কারণ ধান মৌসুমী অঞ্চলের ফসল এবং ভারত মৌসুমী অঞ্চলের অন্তর্গত। কিন্তু ভারতের সর্বত্র মৌসুমী

জলবায়ু ও বৃষ্টিপাতের প্রভাব সমভাবে বণ্টিত হয় না। এজন্য ভারতের সর্বত্রই ধান চাষের উপযুক্ত নহে। যে সমস্ত অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ ৪৫ ইঞ্চির কম নহে এবং উত্তাপও ৭০-৮০° ফাঃ সে সমস্ত অঞ্চলেই ধান চাষের উপযুক্ত জলবায়ু বর্তমান বলিয়া ধরা হয়।

(খ) শুধুমাত্র জলবায়ু অনুকূল হইলেই ধান চাষ সাফল্য লাভ করিতে পারে না। উহার জন্য উপযুক্ত মাটিও চাই। নদীর উপত্যকা ও বদ্বীপের পলিমাটিই ইহার উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যে সমস্ত নদীর উপত্যকায় প্লাবনের বা বন্যার ফলে নূতন পলি সঞ্চিত হয় তথায় অধিক পরিমাণে ধান জন্মিয়া থাকে।

(গ) পাহাড়ের গালে ধাপ তৈয়ারী (terrace) করিয়া অথবা জুম চাষ করিয়াও ভারতে ধান উৎপন্ন হয়। তবে ইহার উৎপাদন খুব কম।

(ঘ) ধান গাছ বৃদ্ধির সময় মাঠে জল দাড়ান দরকার। এজন্য জমির চারিদিকে কিছুটা উচু করিয়া বাঁধ বা আইল তৈয়ারী করিয়া দিতে হয়। অত্যধিক জল জমিয়া ধানের চারা যাহাতে ডুবিয়া না যায় তজ্জন্য প্রয়োজনমত জল নিকাশের ব্যবস্থাও থাকা প্রয়োজন।

(ঙ) যেখানে বৃষ্টিপাত অনিয়মিত বা কম সেখানে জলসেচ ভিন্ন ধান ভাল হয় না।

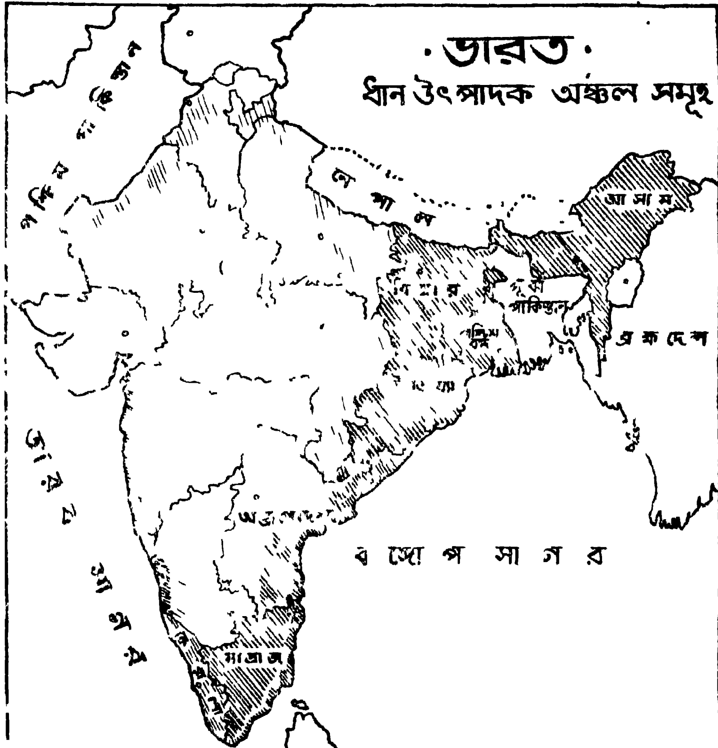
(চ) উপযুক্ত সুলভ শ্রমিক সরবরাহও ধান চাষের পক্ষে অত্যাবশ্যক। শ্রমিক সরবরাহের তারতম্যের জন্য নিম্নলিখিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে চাষ আবাদ হইয়া থাকে :

(১) **ছড়ান পদ্ধতি** (Broadcast Method)—যেখানে শ্রমিকের সরবরাহ কম সেখানে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে জমি ভালভাবে চাষ করিয়া বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। বীজের পরিমাণ ইহাতে বেশী লাগে এবং ফলনও খুব বেশী হয় না।

(২) **বপন পদ্ধতি** (Drilling Method)—যেখানে শ্রমিকের অপেক্ষাকৃত বেশী অভাব সেখানে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে জমি উপযুক্তভাবে তৈয়ারী করার পর বীজ ছড়ানোর পরিবর্তে বীজ লাগাইয়া দেওয়া হয়।

(৩) **রোপন পদ্ধতি** (Transplantation Method —এই পদ্ধতিতে প্রথমতঃ অল্পপরিমাণ জমিতে বীজ ছড়াইয়া ধানের চারা প্রস্তুত করা হয়। উক্ত চারা অন্ততঃ ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা হইলে উহা তুলিয়া লইয়া জলপূর্ণ ও কাদামাটিপূর্ণ চাষের জমিতে এক বা একাধিক চারা একত্র করিয়া সারিবদ্ধভাবে লাগাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে প্রচুর শ্রমিক প্রয়োজন হয়, কিন্তু বীজ কম লাগে এবং ফলনও অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা বেশী হয়। এই প্রণালীতেই ভারতের অধিকাংশ ধান চাষ হইয়া থাকে।

(ছ) ভারতে প্রধানতঃ তিনশ্রেণীর ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং এই বিভিন্ন শ্রেণী ধানের জন্য বৃষ্টিপাত ও চাষের জমিও বিভিন্ন হইতে পারে। নিম্নে উহাদের পরিচয় দেওয়া হইল :



(১) আমন ধান—এই প্রকার ধানই ভারতে বেশী উৎপন্ন হইয়া থাকে। বর্ষাকালে ইহার চাষ হয় এবং হেমন্তকালে উহা কাটা হয়। চাষের সময় ইহাতে মাঠে জলের প্রয়োজন এবং শস্য কাটার সময় জমি ও আবহাওয়া শুষ্ক প্রয়োজন।

(২) আউশ ধান—ইহা গ্রীষ্মের প্রারম্ভে অল্প বৃষ্টিপাত হইলেই আবাদ করা

হয়। বৃদ্ধির সময় মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত বা জলসেচ প্রয়োজন। ইহা বর্ষাকালে বা শরৎকালে কাটা হয়। পরিমাণের দিক দিয়া আমনের পরই ইহার স্থান।

(৩) **বোরো ধান**—ইহা শীতকালে নীচু জলাজমিতে আবাদ করা হয় এবং গ্রীষ্মের প্রারম্ভে কাটা হয়। যে জমি আউশ বা আমন ধানের উপযুক্ত নয় সেখানে বোরো ধান আবাদ হইয়া থাকে। তবে ইহার পরিমাণ খুব কম।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, আসাম, উড়িষ্যা, বিহার ও মধ্যপ্রদেশই ধান উৎপাদনে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া মহারাষ্ট্র, কেরালা, মহীশূর ও উত্তরপ্রদেশে প্রচুর ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। পাঞ্জাব এবং জম্মু ও কাশ্মীরেও কিছু ধান জন্মে। (ধান উৎপাদনের বিস্তৃত বিবরণ Q 6, এ দ্রষ্টব্য)

ভারতে প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপন্ন হইলেও ইহা প্রয়োজন মিটাইতে পারে না। এজন্য বিদেশ হইতে চাউল আমদানি করিতে হয়। অন্যান্য কারণের মধ্যে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রতি একরে ফলন কমই এজন্য দায়ী। সুতরাং ভারতে ফলন বৃদ্ধির জন্য জলসেচ, বন্যানিরোধ, সার প্রয়োগ, উত্তম বীজ বপন, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষ-আবাদ, পতিত জমি উদ্ধার প্রভৃতির চেষ্টা চলিতেছে।

২। (গমের উৎপাদন সম্বন্ধে Q. ১০. দ্রষ্টব্য)।

গমের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ধানের মত বিভিন্ন অবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। ইহা ছাড়া উভয়ের জন্য গবেষণাগারও স্থাপিত হইয়াছে। উপরিউক্ত চেষ্টার ফলে আমাদের উৎপাদনে যে কতকটা উন্নতি দেখা দিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

বহুমুখী নদী উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হইলে আমাদের কৃষিজাত দ্রব্যের জন্য পরনির্ভরতা চলিয়া যাইবে ইহা আশা করা যায়।

Q. 12. Compare and contrast the physical and economic factors associated with the production of rice and wheat. Mention the chief countries and ports engaged in the foreign trade of these commodities.

(ধান ও গম চাষ সম্পর্কিত প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলির তুলনা কর। এই শস্যগুলির বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত প্রধান দেশ ও বন্দরগুলির উল্লেখ কর।)

Ans: ধান ও গমের তুলনামূলক বিচার নিম্নলিখিত উপায়ে করা যাইতে পারে।

ধান

ক। প্রাকৃতিক অবস্থা

(১) ক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল।

(২) ৭০ —৮০° ফাঃ উত্তাপ প্রয়োজন।

(৩) ৪০ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টিপাত হওয়া প্রয়োজন।

(৪) ৪০" ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাত হইলে জলসেচ প্রয়োজন।

(৫) নদী-উপত্যকা বা বদ্বীপের পলি-মাটিতে ভাল জন্মে।

(৬ মৌসুমী জলবায়ুতে ভাল জন্মে।

খ। অর্থনৈতিক অবস্থা

(১) যন্ত্রের ব্যবহার কম। এজন্য প্রচুর সুলভ শ্রমিক প্রয়োজন।

(২) ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে বেশী জন্মিয়া থাকে।

গ। উৎপাদক অঞ্চল ও বহির্বাণিজ্য

(১) চীন, ভারত, ব্রহ্ম, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি উৎপাদনে সমধিক প্রসিদ্ধ।

(২) শতকরা ৭ ভাগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে।

(৩) যে দেশ বহুল উৎপাদন করে সে দেশও আমদানি করে।

গম

ক। প্রাকৃতিক অবস্থা

(১) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফসল।

(২) ৫৫°—৬৫° ফাঃ উত্তাপ প্রয়োজন।

(৩) ২০"—৪০" ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হওয়া প্রয়োজন।

(৪) ২০" ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাত হইলে জলসেচ প্রয়োজন।

(৫) ঢালু দোয়াশ মাটিযুক্ত সমভূমিতে ভাল জন্মে।

(৬) ভূমধ্যসাগরীয় ও নাতিশীতোষ্ণ মহাদেশীয় জলবায়ুতে ভাল জন্মে।

খ। অর্থনৈতিক অবস্থা

(১) যন্ত্রের ব্যবহার বেশী। এজন্য শ্রমিকের সংখ্যা কম হইলে চলে।

(২) বিরল বসতিপূর্ণ স্থানে বেশী জন্মিয়া থাকে।

গ। উৎপাদক অঞ্চল ও বহির্বাণিজ্য

(১) রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স প্রভৃতি উৎপাদনে সমধিক প্রসিদ্ধ।

(২) শতকরা ১৫ ভাগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে।

(৩) যে দেশ বহুল উৎপাদন করে সে দেশ রপ্তানি করে।

ধান	গম
(৪) যে দেশে কম উৎপন্ন হয় সে দেশ রপ্তানি করে।	(৪) যে দেশে কম উৎপন্ন হয় সে দেশ আমদানি করে।
(৫) রপ্তানিযোগ্য কম উৎপাদক দেশগুলির বিরল বসতি।	(৫) রপ্তানিযোগ্য বহুল উৎপাদক দেশগুলির বিরল বসতি।
(৬) ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীন প্রধান রপ্তানিকারক দেশ।	(৬) যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আর্জেণ্টিনা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রধান রপ্তানিকারক দেশ।
(৭) ভারত, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া ও জাপান প্রধান আমদানিকারক দেশ।	(৭) যুক্তরাজ্য, জার্মেনী, ইতালী, বেলজিয়াম, ভারত ও হল্যাণ্ড প্রধান আমদানিকারক দেশ।
ঘ। বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত বন্দর	ঘ। বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত বন্দর
(১) রেঙ্গুন, বেসিন, আকিয়াব, সাইগন ও ব্যাঙ্কক প্রধান রপ্তানি বন্দর।	(১) বুয়োনোসআয়ারস, মণ্ট্রিল, হ্যালিফ্যাক্স, ভাঙ্কুবার, সিডনি, মেলবোর্ণ, বোষ্টন, নিউইয়র্ক প্রভৃতি প্রধান রপ্তানি বন্দর।
(২) কলিকাতা, মাদ্রাজ, কলম্বো ও ইয়োকোহামা প্রধান আমদানি বন্দর।	(২) লণ্ডন, লিভারপুর, গ্লাসগো, আমষ্টারডাম, হামবুর্গ, কলিকাতা বোম্বাই, টোকিও ও ইয়োকো-হামা প্রধান আমদানি বন্দর।

Q 13. What climate and physical conditions are necessary for the production of jute?

(পাট উৎপাদনের জন্য কিরূপ জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থা প্রয়োজন ?)

Ans : পাট উৎপাদনের জন্য নিম্নলিখিত জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থা প্রয়োজন :

(১) পাট উষ্ণ মৌসুমী অঞ্চলের ফসল। সুতরাং ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু পাট চাষের পক্ষে উপযোগী।

(২ ইহার উৎপাদনের জন্য প্রচুর উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। উত্তাপের পরিমাণ ৮০° ফাঃ—১০০° ফা এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৮০"—১০০" হওয়া উচিত। আবহাওয়ার আপেক্ষিক আর্দ্রতা যত বেশী হইবে ততই পাটের চারা বৃদ্ধির পক্ষে সুবিধা হইবে। পাটগাছ কাটার সময় উহার উচ্চতা ১০।১২ ফুট হইলে ভাল হয়। উহাই পাট গাছের সাধারণ উচ্চতা বলিয়া ধরা হয়।

(৩) বীজ বপন এবং অঙ্কুরোদগমের সময় বৃষ্টিপাত অল্প হইলে চলে। বরং বেশী বৃষ্টি এই সময় ক্ষতিকর। কিন্তু গাছ বৃদ্ধির সহিত বৃষ্টির মাত্রাও বৃদ্ধি পাওয়া অত্যাবশ্যক। গাছ কিছুটা বড় হইলে জমি বর্ষার জলে প্লাবিত থাকিলে ভাল হয়।

পাট কাটার সময়ও মাঠে জল থাকিলে কোন ক্ষতি নাই। বরং উহা সুবিধাজনক। পাট কাটার পর পাটের গাছ হইতে আঁশ ছাড়ানের জন্য উহাকে কিছুদিন জলে ভিজাইয়া পচাইয়া লইতে হয়। পাট কাটার সময় পাটের জমিতে জল থাকিলে নিকটবর্তী ডোবা বা জলাশয়ে উহা ভিজানের জন্য সহজে লইয়া যাওয়া যায়।

(৪) পাট ভিজানের মত উপযুক্ত ডোবা বা জলাশয় থাকাও পাট চাষের পক্ষে প্রয়োজন।

(৫) পাট চাষের ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়। এজন্য নদীর ধারের নরম ও উর্বর পলিমাটি ইহার চাষের জন্য অত্যাবশ্যক। কারণ নদীর বন্যার সহিত প্রতি বৎসর যে পলিমাটি নদীর ধারের জমিতে সঞ্চিত হয় উহাতে জমির উর্বরতা বজায় থাকে। অন্যথায় জমিতে সারপ্রয়োগ করিতে হয়।

(৬) যদিও উচ্চভূমিতে পাট চাষ হইয়া থাকে, নিম্ন সমতলক্ষেত্র যেখানে জল জমিতে পারে সে সমস্ত ক্ষেত্রই পাট চাষের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অনুকূল।

(৭) পাটের জমির চাষ-আবাদ, তত্ত্বাবধান, পাটগাছ হইতে আঁশ ছাড়ান, উহা শুকান প্রভৃতি কাজে প্রচুর সুলভ ও কষ্টসহিষ্ণু শ্রমিকও প্রয়োজন। পাট গাছের কাণ্ড হইতে উহার আঁশ পাওয়া যায় বলিয়া উহাকে বল্কল তন্তু (bast fibre) বলে।

Q. 14. Describe the jute growing areas of the world and its international trade. How is it that jute is grown mostly in India and Pakistan ?

(পাট উৎপাদক অঞ্চল ও উহার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বর্ণনা কর। ভারত ও পাকিস্তানে অধিকাংশ পাট হয় কেন ?)

Ans : পাট উৎপাদনে ভারত ও পাকিস্তান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের

পাট প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি, আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ও কাছাড়, বিহারের পুর্ণিয়া, উড়িষ্যার কটক, উত্তর-প্রদেশ, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া মাদ্রাজেও কিছু উৎপন্ন হয়।

পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানেই পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্বপাকিস্তানের ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, পাবনা, বগুড়া ও রাজসাহী জেলাতেই বেশী পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভারত ইউনিয়নে পাট উৎপাদন সাধারণতঃ নিম্নরূপ : (বেল ১=৪০০ পাঃ)

পশ্চিমবঙ্গ	২৬	লক্ষ	গাঁট	উড়িষ্যা	২'৫	লক্ষ	গাঁট
আসাম	১২	"	"	উত্তরপ্রদেশ	'৭০	"	"
বিহার	৬	"	"	ত্রিপুরা	৪৬	"	"

পৃথিবীতে পাটের মোট উৎপাদন (১৯৬০-৬১) প্রায় ২৫ লক্ষ টন। উহার মধ্যে পাকিস্তানে উৎপন্ন হয় প্রায় ১০·২১ লক্ষ টন এবং ভারতে উৎপন্ন হয় প্রায় ৭·৩১ লক্ষ টন। সুতরাং ভারত ও পাকিস্তান মিলিয়া পৃথিবীর শতকরা ৭০ ভাগের বেশী পাট উৎপন্ন করিয়া থাকে। ভারত ও পাকিস্তানের বাহিরে যে সমস্ত দেশে সামান্য পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয় তাহাদের মধ্যে ব্রেজিল, বেলজিয়াম কঙ্গো, ফরমোসা, মালয়, সিংহল, চীন, শ্যাম, ইন্দোচীন, মিশর, মেক্সিকো, পারাগুয়ে, নেপাল প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ব্রেজিল উহার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ৫০ হাজার টন পাট উৎপন্ন করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। উক্ত পরিকল্পনা সাফল্য-লাভ করিলে ব্রেজিলের আর বাহির হইতে পাট আমদানির প্রয়োজন হইবে না।

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারত ও পাকিস্তানেই সর্বাধিক পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার কারণ এখানে পাট চাষের অনুকূল অবস্থা (অনুকূল অবস্থা দ্রষ্টব্য-Q 13-) সর্বাপেক্ষা বেশী মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। পাট ক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল হইলেও ইহার চাষ গঙ্গা নদীর বদ্বীপ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। পাটের উৎকর্ষ ও উৎপাদনের পরিমাণ একাধারে যেমন চাষের জমির উপর নির্ভর করে অন্যপক্ষে আবার উহার গাছ হইতে আঁশ ছাড়ানোর উপরও নির্ভর করে। চাষের জমি প্রস্তুতের উপযুক্ত শ্রমিক হয়ত অনেক দেশেই মিলিয়া থাকে। কিন্তু আঁশ ছাড়ানোর উপযুক্ত শ্রমিকের অভাব অনেক দেশেই দেখা যায়। কারণ আঁশ ছাড়াইতে হইলে কোমর পর্য্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া কাজ করিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আঁশের ময়লা জলে ধুইয়া লইতে হয়। এইভাবে ধৌত করার উপর পাটের উৎকর্ষ নির্ভর করে। সুতরাং এরূপ জলে দাঁড়াইয়া কাজ করার মত কষ্টসহিষ্ণু, দক্ষ ও সুলভ শ্রমিকের সংখ্যা ভারত ও পাকিস্তান ছাড়া অন্য দেশে বিরল। পাকিস্তান আবার ভারত অপেক্ষা এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর। পাকিস্তানে জলের ও এরূপ শ্রমিকের প্রাচুর্য্য উভয়ই বেশী। এজন্য পাকিস্তানের পাট ভারত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহা ছাড়া পাট প্রধানতঃ যে কাজে লাগে সে কাজ চালানোর জন্য পাট অপেক্ষা সস্তা তন্তু এখনও দেখিতে পাওয়া যায় না। পাটশিল্পও অধিকাংশ ভারতে অবস্থিত। পাটের তন্তুর সুলভতা এবং উহার শিল্পোন্নতি পাট চাষে অনুপ্রেরণা দিয়া আসিতেছে। অর্থকরী ফসল হিসাবে ইহা দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর একমাত্র সম্বল। তাই তাহারা অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়াও এই ফসল উৎপন্ন করিয়া আসিতেছে এবং পৃথিবীর বাজারে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া আসিতেছে। উপরি-উক্ত কারণেই ভারত ও পাকিস্তানে এত অধিক পাট উৎপন্ন হইতেছে।

পাকিস্তান পাটের প্রধান রপ্তানিকারক দেশ। ইহার চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর দিয়া প্রচুর কাঁচা পাট বিদেশে রপ্তানী হয়। ভারতও কলিকাতা বন্দর দিয়া

কিছু পাট বিদেশে রপ্তানী করিতেছে। আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জার্মানী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইটালী, জাপান অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভারত সামান্য পাট বিদেশে রপ্তানী করিলেও প্রচুর পাট পাকিস্তান হইতে আমদানি করিয়া থাকে।

Q. 15. What the uses of Jute? What are the substiutes for Jute? Name them with sources of their supply.

(পাট-কি কি কাজে ব্যবহৃত হয়? পাটের পরিবর্তে কি ব্যবহার করা চলে? উহাদের উৎপত্তিস্থানসহ নাম উল্লেখ কর।)

Ans: পাটের ব্যবহার নিম্নলিখিতরূপ দেখিতে পাওয়া যায়:

(১) পাটকে 'পাইকারী ব্যবসায়ের বাদামী কাগজ' (Erown Paper of the wholesalc Trade) বলা হয়। পাট হইতে চট ও থলে প্রস্তুত হয়। তুলা, পশম, কাপড় প্রভৃতি মোড়াইয়ের জন্য চট ব্যবহৃত হয় এবং ধান, চাউল, আটা, গম, চিনি, লবণ প্রভৃতি থলিয়া ভর্তি করিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে চালান দেওয়া হয়। এরূপ কাজ পাটের থলে বা চটের দ্বারাই অপেক্ষাকৃত সস্তায় চলিয়া আসিতেছে। এজন্য ব্যবসা-ক্ষেত্রে ইহার আদর খুব বেশী।

(২) ইহার দ্বারা নানাপ্রকার দড়ি, দড়া, সুতালি, পর্দা, ত্রিপল, গালিচা, আসন প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৩) পাট সহজেই রং করা যায়। এজন্য ইহা কৃত্রিম রেশম (Rayon), পাটের রেশম, সেলুলেজ দ্রব্য, লিনোলিয়াম, ক্যানভাস প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেও ব্যবহৃত হইতেছে।

(৪) বিদ্যুৎ শিল্পেও ইহা 'অপরিচালক পদার্থ' (insulator) হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

(৫) ইহার পরিত্যক্ত অংশগুলিও কাগজ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীর একটি অংশে এতটা পাট উৎপন্ন হয় বলিয়া এবং তাহার উপরই পৃথিবীর অধিকাংশ দেশকে নির্ভর করিতে হয় বলিয়া ইহার 'পরিবর্ত জিনিস' (substitutes) আবিষ্কারের চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে এবং বিভিন্ন প্রকার জিনিস ইহার পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতেছে। নিম্নে উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল:

(১) যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় শস্য সংগ্রহের জন্য **Grain Elevator** ব্যবহৃত হইতেছে এবং উক্ত Elevator হইতেই সরাসরি জাহাজে শস্য প্রেরণ করা হইতেছে।

(২) আটা, সিমেণ্ট প্রভৃতি পাঠানোর জন্য কাগজের থলেও যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় ব্যবহৃত হইতেছে।

(৩) যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ও ইউরোপের অনেক দেশে কাষ্ঠমণ্ড দ্বারা প্রস্তুত সূতা বিদ্যুৎশিল্পে 'অপরিচালক পদার্থ' হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

(৪) মেস্তা (Mesta), রাশিয়ান শন, শিশল ও মানিলা শন (Hemp) এবং অতসী ও (Flax) পাটের পরিবর্তে অনেকস্থলে ব্যবহৃত হয়। রাশিয়াতে, ফিলিপাইনে ও চীনে ইহার ব্যবহার বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে (বিশেষতঃ অন্ধ্রে) মেস্তা চাষ ইদানিং সাফল্যলাভ করিয়াছে।

(৫) জাভায় রোজেলা (Rosolla) নামক একপ্রকার পাটের মত জিনিস উৎপন্ন হয়।

(৬) দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালে একপ্রকার বন্যজাত গাছ নাম stokroos গমের থলে প্রস্তুতে ব্যবহৃত হইতেছে।

(৭) দক্ষিণ রোডেশিয়ায় কলাগাছের তন্তু হইতেও শস্য ভর্তির থলে প্রস্তুত হইতেছে।

উপরিউক্ত জিনিসগুলি পাটের প্রতিযোগী। কিন্তু উহাদের মূল্য পাট অপেক্ষা এখনও বেশী। সুতরাং পাট ও পাটজাত দ্রব্যের যাহাতে মূল্য আরও কম হয় এবং উৎকর্ষ সাধন হয় তাহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি থাকিলে পাটের পক্ষে উহার প্রতিযোগীর ভয় থাকিবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

Q. 16. Describe the geographical conditions required for the cultivation of cotton. What countries export raw cotton and to what destination? (C. U. Inter, 1940, 42, 50, 51) Give an account of its world distribution (C. U. Inter, 1957)

(কার্পাস চাষের জন্য কিরূপ ভৌগোলিক অবস্থা প্রয়োজন? কোন কোন্ দেশ ইহা রপ্তানি করে এবং কোন্ কোন্ দেশে? পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ইহার উৎপাদন বর্ণনা কর।)

Or

Why is the cultivation of cotton mainly restricted to certain regions of the world? Are these also the regions where cotton goods are manufactured? (Pre-C. U. 1962)

(কার্পাস চাষ প্রধানতঃ কতকগুলি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ কেন? উক্ত অঞ্চলগুলি কি কার্পাস দ্রব্যও প্রস্তুত করে ?)

Ans : কার্পাস বা তুলা চাষের জন্য ভৌগোলিক অবস্থা নিম্নলিখিতরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় :

(১) ইহা ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল হইলেও ইহার জন্য অত্যধিক উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত প্রয়োজন নাই।

(২) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০ ইঞ্চির বেশী কোনক্রমেই প্রয়োজন নাই। সাধারণত ৩০"-৪০" বৃষ্টিপাত কার্পাস চাষের জন্য প্রয়োজন।

(৩) জল সেচের ব্যবস্থা থাকিলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০" হইলে চলে। মরুময় মিশরে সামান্য বৃষ্টিপাত হইলেও জলসেচের সাহায্যে ভাল কার্পাস জন্মিয়া থাকে। রাশিয়ার মরুতুল্য মধ্য এশিয়াতেও জলসেচের সাহায্যে কার্পাস চাষ হইয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৩' —৪০' বৃষ্টি বলয়ের মধ্যেই কার্পাস ভাল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(৪) উত্তাপের পরিমাণ ৬০—৮০ ফা হইলে চলে। তুষারপাত কার্পাস চাষের পক্ষে অনিষ্টকর। যে সব দেশে তুষারপাত হয় তথায় কার্পাস চাষ করিতে হইলে অন্ততঃ একটানা ২০০ তুষারমুক্ত দিবস চাই।

(৫) কার্পাস গাছ বৃদ্ধির সময় পরিমিত বৃষ্টিপাতযুক্ত উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া প্রয়োজন। আবার অত্যধিক গরম আবহাওয়া হইলে তূলা ঝরিয়া পড়িতে পারে।

(৬) সামুদ্রিক বায়ু বিশেষ প্রয়োজন না হইলেও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কার্পাস উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল।

(৭) ইহার চাষের জন্য জলধারণক্ষম উর্বর দোয়াশ মাটি ভাল। জমির আর্দ্রতাই কার্পাসের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। কারণ কাপাস জমির আর্দ্রতাই চায়, কিন্তু আবহাওয়ার আর্দ্রতা চায় না। ভারতের আগ্নেয়গিরি-সৃষ্ট কৃষ্ণ মৃত্তিকা কার্পাস চাষের খুব উপযোগী। কারণ প্রথমত এ মাটি কার্পাস গাছের খাদ্য নানা ধাতব পদার্থে সমৃদ্ধ এবং দ্বিতীয়তঃ ইহা অত্যন্ত জলধারণক্ষম। এখানে বৃষ্টিপাতও ৪০ ইঞ্চির বেশী নহে। মাটিতে সামান্য লবণ ও চুণ থাকিলে কার্পাস গাছ সহজে পুষ্টিলাভ করে।

(৮) জমির আর্দ্রতা প্রয়োজন হইলেও উপযুক্ত জলনিকাশের বন্দোবস্ত চাই।

(৯) উপরি উক্ত ভৌগোলিক অবস্থা ছাড়া ইহার চাষ, তত্ত্বাবধান ও তুলা

সংগ্রহের জন্য সুলভ শ্রমিক প্রয়োজন। তুলার এক প্রকার পোকা (Boll-weevil) দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এজন্য ফসল রক্ষার জন্য কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া জমির উর্বরতা বজায় রাখার জন্য সার প্রয়োজন হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্য এশিয়ায় ভিন্ন কার্পাস চাষে যন্ত্রপাতির ব্যবহার খুব কম।

(১০) একমাত্র রাশিয়া (৪৭ অক্ষাংশ) ছাড়া প্রায় সর্বত্রই কার্পাস চাষ ৪৩″ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৩০″ দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরিউক্ত অবস্থাগুলির আধিক্যহেতু কার্পাস উৎপাদকদের মধ্যে নিম্নলিখিত দেশগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু উহারা প্রত্যেকেই কার্পাসদ্রব্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য নহে।

মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র—এই দেশ কার্পাস ও কার্পাসদ্রব্য উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম। ইহার দক্ষিণ পূর্বভাগে টেক্সাস, মিসিসিপি, আলবামা, টেনেসি, আরকানসাস, লুইসানিয়া, জর্জিয়া ও ক্যারোলিনা রাজ্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। মধ্য ও পশ্চিমদিকেও জলসেচের সাহায্যে কার্পাস উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে পোকার উপদ্রব বেশী বলিয়া কার্পাস ক্ষেত্র মধ্য ও পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতেছে।



পৃথিবীর তুলা উৎপাদন স্থান

চীন—ইহা কার্পাস উৎপাদনে দ্বিতীয়। ইহার অধিকাংশ আবাদ ইয়াংসি ও হোয়াংহো নদীর অববাহিকা ও উত্তরের সমভূমিতে সীমাবদ্ধ। চীনে কার্পাসদ্রব্যও উৎপন্ন হয়।

রাশিয়া—ইহা কার্পাস উৎপাদনে তৃতীয় কিন্তু কার্পাসদ্রব্য উৎপাদনে দ্বিতীয়। ইহার ইউক্রেণ, তাজাক, উজবেক ও তুর্কোমান অঞ্চলে কার্পাস উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভারত—ইহা কার্পাস উৎপাদনে চতুর্থ কিন্তু কার্পাসদ্রব্য উৎপাদনে তৃতীয়। ভারতের গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্য-প্রদেশ, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, মহীশূর ও উত্তরপ্রদেশ কার্পাস উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য।

মিশর—ইহার স্থান পঞ্চম। মিশরের নীল নদের অববাহিকায় কার্পাস চাষ হইয়া থাকে। ইহা কার্পাসদ্রব্যও কিছু উৎপাদন করে।

ইহা ছাড়া ব্রেজিল (পূর্বভাগের মালভূমি), পেরু, আর্জেন্টিনা, টাঙ্গানিকা, উগাণ্ডা, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা, মেক্সিকো, সুদান, পাকিস্তান (সিন্ধু উপত্যকা) কোরিয়া, তুরস্ক, ইরান, ইরাক ও অস্ট্রেলিয়ার কুইনস্ল্যাণ্ড কিছু তুলা উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহারা কার্পাসদ্রব্য খুব কম উৎপাদন করিয়া থাকে।

নিম্নে কার্পাস উৎপাদনের পরিমাণ দেওয়া হইল :

(১৯৬১-৬২)

পৃথিবীর মোট উৎপাদন প্রায় ৪'৭৩ কোটি গাঁইট

যুক্তরাষ্ট্র	১ ৪৩ কোটি গাঁইট	মিশর	১৬ লক্ষ গাঁইট
চীন	৭২ লক্ষ "	মেক্সিকো	১৯ " "
রাশিয়া	৭০ " "	ব্রেজিল	২২ " "
ভারত	৪৩ " "	পাকিস্তান	১৪ " "

কার্পাস রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও মিশর সমধিক প্রসিদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্র রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় অর্ধেক দখল করিয়া আছে। অন্যান্য রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে মেক্সিকো, ব্রেজিল, পেরু, সুদান, উগাণ্ডা, পাকিস্তান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভারত সামান্য কার্পাস রপ্তানি করিলেও উহা আমদানিকারক দেশ হিসাবেই উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে গ্রেট্ ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালি, জাপান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহারা কার্পাসদ্রব্য উৎপাদনেও সমধিক প্রসিদ্ধ। ব্রিটেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলি যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, সুদান, উগাণ্ডা, ব্রেজিল ও পাকিস্তান হইতে, ভারত—যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, সুদান উগাণ্ডা ও পাকিস্তান হইতে, জাপান—যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, ভারত ও পেরু হইতে প্রধানতঃ কার্পাস আমদানি করিয়া থাকে।

কার্পাস রপ্তানি বন্দর গুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ আর্লিয়েন্স, স্তাভানা ও গ্যাল-ভাষ্টন, মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া, পাকিস্তানের করাচী, ব্রেজিলের স্তালভেডর ও রায়ডিজেনেরো সমধিক প্রসিদ্ধ।

কার্পাস আমদানি বন্দরের মধ্যে ব্রিটেনের লিভারপুর, সাউদামটন, গ্লাসগো ও লণ্ডন, ভারতের বোম্বাই ও কলিকাতা, জাপানের টোকিও, ইয়োকোহামা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

Q. 17. Into how many classes is cotton divided? Give a short account of the chief sources of the principal varieties of cotton (C. U. Inter, 1936)

(কার্পাসকে কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়? কোন্ শ্রেণী কোথা হইতে পাওয়া যায় তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।)

Ans: আঁশের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী কার্পাসকে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ঃ

(১) **দীর্ঘ আঁশযুক্ত কার্পাস** (Long staple cotton): এই শ্রেণীর কার্পাসের আঁশের দৈর্ঘ্য ১½" হইতে ২½"। এই শ্রেণী আবার নিম্নলিখিত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ঃ

(ক) **সাগর দ্বীপীয়** (Sea Island): ইহা সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ আঁশযুক্ত (২") তুলা। ইহার আঁশ খুব মিহি, রেশমের আভাযুক্ত, মসৃন, কোমল অথচ শক্ত। এজন্য ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট তুলা বলিয়া পরিগণিত। ইহাকে অনায়াসে রেশমের সহিত মিশান চলে। ইহার দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্রাদি অপেক্ষাকৃত দামী। সুতরাং সাধারণ-লোকের পক্ষে ইহার ব্যবহার ব্যয়বাহুল্য। প্যারাসুট ও সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদ-প্রস্তুত করিতেই ইহার বেশী ব্যবহার হয়। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ক্যারোলিনা, ফ্লোরিডা ও জর্জিয়ার সন্নিকটে দ্বীপগুলিতে প্রথমে ইহার উৎপাদন সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া উহার ঐ প্রকার নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু পোকার (Boll weevil) উপদ্রবের জন্য উহার উৎপাদন ঐ সমস্ত অঞ্চলে অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইহা এখন প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (বিশেষতঃ পোর্টোরিকোতে) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(খ) **মিশরীয়** (Egyptian): ইহাও দীর্ঘ আঁশ (১¾") এবং উৎকর্ষের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাতেও রেশমী আভা আছে এবং রেশমের সহিত সহজে মিশ্রিত হইতে পারে। ইহাও কোমল ও শক্ত। ভাল 'ফিনিসের,' (Finish) জন্য ইহা আদৃত। সাগরদ্বীপীয় কার্পাস অপেক্ষা ইহা সস্তাও। ইহা প্রধানতঃ মিশরের নীলনদের অববাহিকায় জলসেচের সাহায্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, (কালিফোর্ণিয়া), পেরু, উগাণ্ডা, টাঙ্গানিকা, ব্রেজিল ও পাকিস্থানে কিছুটা করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(২) মধ্যম আঁশযুক্ত কার্পাস (Medium staple cotton); ইহার আঁশের দৈর্ঘ্য ১" হইতে ১২"। ইহাকে **উচ্চভূমির** (upland) **কার্পাসও** বলে। ইহা মিহি, সাদা ও শক্ত, কিন্তু রেশমী আভাশূন্য। এ জাতীয় কার্পাসই বেশী উৎপন্ন হয় ও ব্যবহৃত হয়। ইহা যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদীর অববাহিকায় বেশী জন্মে। তাহা ছাড়া ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা, রাশিয়া, ভারত, পাকিস্তান, চীন, সুদান, উগাণ্ডা ও টাঙ্গানিকায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(৩) ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত কার্পাস (Short staple cotton): ইহার আঁশের দৈর্ঘ্য ১'র কম। পেরুদেশে বেশী হয় বলিয়া ইহার অন্য নাম **পেরুদেশীয়** (Peruvian)। ইহা কর্কশ ও মোটা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী। ভারতেও বেশী উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে **ভারতীয়** (Indian) কার্পাসও বলা হয়। ইহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর কার্পাস। মোটা কাপড় প্রস্তুত করার উপযোগী। জাপানে অবশ্য ভাল তূলার সহিত এই শ্রেণীর তূলা মিশ্রিত করিয়া ভাল কাপড়ও তৈয়ারী হয়। ভারত ও পেরু ছাড়া ইহা ব্রেজিল ও চীনে উৎপন্ন হয়।

Q. 18 What are the uses of Cotton? (কার্পাস কি কি কাজে ব্যবহৃত হয়?)

Ans: কার্পাসের ব্যবহার নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে:

(১) কার্পাস আমাদের পরিধেয় বস্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কার্পাস তূলাই পরিধানের বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

(২) ইহা আমাদের শয্যাদ্রব্য যেমন বালিশ, তোষক, গদি ইত্যাদি তৈয়ারী করিতেও প্রয়োজন হয়।

(৩) ডাক্তারখানায় ও হাসপাতালে রোগীদের পরিচর্য্যার জন্য ব্যাণ্ডেজ, প্যাড, ইনজেকসন প্রভৃতি কাজের জন্যও অনেক তূলা প্রয়োজন হয়।

(৪) ইহার দ্বারা সূতা, দড়ি, সতরঞ্চি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

(৫) শিল্পকারখানায় ও গৃহস্থালিতে অনেক মোছামুছির কাজেও তূলা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৬) গ্যাসের ম্যানটেল (Mantle), বিস্ফোরক দ্রব্য, কাগজ, সেলুলয়েড দ্রব্য প্রভৃতিও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(৭) সেলুলয়েড দ্রব্যের দ্বারা শিশি বোতলের মুখোস, ফটোগ্রাফের ছবি ভিজাইবার পাত্র, বিদ্যুৎ-অপরিচালক পদার্থ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(৮) কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করিতেও ইহা বিশেষ কার্য্যকরী।

(৯) তুলার বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত হয় এবং উহার খৈল জমির উত্তম সার এবং গরুর খাদ্য।

(১০) সুদৃঢ় রাস্তা প্রস্তুত করিতেও তুলা কার্য্যকরী বলিয়া পরীক্ষা চলিতেছে।

Q. 19. Give a short account of the cotton cultivation of India. How is it that its cultivation is confined to a few States ?

(ভারতে কার্পাস চাষের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ইহার চাষ কয়েকটি রাজ্যে সীমাবদ্ধ কেন ?)

Ans : ভারতে প্রধানতঃ দুই প্রকারের কার্পাস চাষ হয়—(১) মধ্যম আঁশ-যুক্ত (Medium staple) এবং (২) ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত (Short staple)। তবে মোট উৎপাদনের মধ্যে ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত কার্পাসের পরিমাণই বেশী। দীর্ঘ আঁশযুক্ত কার্পাস উৎপাদন খুবই কম।

ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত কার্পাস উৎপাদনে ভারতের লাভাজাত কৃষ্ণমৃত্তিকা (Black Soil) বিশেষ উপযোগী। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০"র নীচে। এই মৃত্তিকার জলধারণ ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। এজন্য ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত কার্পাস চাষের বিশেষ উপযোগী এবং এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে এই কার্পাস চাষও হইয়া আসিতেছে। তাই এ মৃত্তিকা 'কৃষ্ণ কার্পাস মৃত্তিকা' (Black Cotton Soil) নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। গুজরাট মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর ও অন্ধ্র এ জাতীয় কার্পাস উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য।

মধ্যম আঁশযুক্ত কার্পাস নদী উপত্যকায় পলিমাটিতে জন্মিয়া থাকে। ইহা শুষ্ক অঞ্চলের ফসল। ইহা জলসেচ ভিন্ন উৎপন্ন হওয়া কঠিন। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মাদ্রাজ এবং মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের কোন কোন অঞ্চলে ইহা জন্মিয়া থাকে।

যেখানে বৃষ্টিপাত অধিক, যেমন পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম, বা বৃষ্টিপাত কম, মাটি কার্পাসের উপযুক্ত কিন্তু জলসেচের সুবিধা নাই—সে সকল অঞ্চলে কার্পাস ভাল জন্মিতে পারে না। এই কারণে কার্পাস চাষ ভারতের কতগুলি রাজ্যে সীমাবদ্ধ। ভারতে ১৯৬১-৬২ সালে প্রায় ৪৩ লক্ষ বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল। (১ বেল = ৩৯২ পাউণ্ড)। উহার উৎপাদন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণতঃ নিম্নরূপ :

মহারাষ্ট্র ও গুজরাট	২০ লক্ষ বেল	মাদ্রাজ	৩ লক্ষ বেল
মহীশূর	৪ " "	রাজস্থান	১.৬ " "
মধ্য প্রদেশ	৪ " "	অন্ধ্র	১.৫ " "
পাঞ্জাব	৬ " "	উত্তর প্রদেশ	.২৭ " "

ভারত ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলা কিছু বিদেশে রপ্তানি করিলেও উহাকে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। ভারত, পূর্ব আফ্রিকা, মিশর, যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান হইতে তুলা আমদানি করিয়া থাকে।

ভারত তুলা উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিলেও প্রতি একরে ইহার উৎপাদন খুব কম। প্রতি একরে তুলা উৎপাদনের অবস্থা সাধারণতঃ নিম্নরূপ দেখিতে পাওয়া যায়:

মিশর	৪৫০ পাউণ্ড	পাকিস্তান	১৫০ পাউণ্ড
যুক্তরাষ্ট্র	২০০ "	ভারত	৮৫ "

Q. 20, What climatic and physical conditions are necessary for the production of sugar-cane and sugar-beet? In what parts of the world are those chiefly produced? (C. U. Inter, 1956)

(আখ ও বীট উৎপাদনের জন্য কিরূপ জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থা প্রয়োজন? পৃথিবীর কোন্ কোন্ অংশে উহারা প্রধানতঃ উৎপন্ন হয়?)

Ans: ১। আখ উৎপাদনের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থা নিম্নরূপ:

(১) ইহা ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল। এজন্য ইহা উৎপাদনের জন্য প্রচুর উত্তাপ এবং যথেষ্ট বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। উত্তাপের পরিমাণ অন্ততঃ ৭৫ ফা. এবং বৃষ্টির পরিমাণ ৫০ ইঞ্চির অধিক প্রয়োজন। সুতরাং মৌসুমী ও নিরক্ষীয় জলবায়ু ইহা উৎপাদনের পক্ষে উপযুক্ত। অত্যধিক বৃষ্টিপাত হইলে অবশ্য আখের রসের মধ্যে চিনির ভাগ কম হয়। আবহাওয়া তুষারমুক্ত হওয়া চাই।

(২) সমুদ্রবায়ু ইহার পক্ষে অত্যাবশ্যক না হইলেও ইহার প্রভাবে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আখ উৎপন্ন হয়। সুতরাং সমদ্রবায়ুও ইহার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

(৩) দোঁয়াশ পলিমাটি বা কালমাটি আখ চাষের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। জমিতে কিছু লবণ ও চূণ থাকিলে আখের চাষ অপেক্ষাকৃত ভাল হয়। আখ গাছের গোড়ায় জল জমিয়া থাকা অনিষ্টকর। এজন্য জমি জল নিকাশের উপযুক্ত হওয়া চাই।

(৪) বৃষ্টিপাত কম হইলে জলসেচের প্রয়োজন।

(৫) উপরিউক্ত জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থা ছাড়া জমিতে সার প্রয়োগ এবং আখের চাষ তত্ত্বাবধান ও কর্তনের জন্য প্রচুর সুলভ শ্রমিক প্রয়োজন। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বেশী আখের চাষের অন্যতম কারণ প্রচুর সুলভ শ্রমিক সরবরাহ।

২। বীট চাষের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থা নিম্নরূপ প্রয়োজন :

(১) ইহা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফসল। এজন্য ইহার জন্য মধ্যম রকমের উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। উত্তাপের পরিমাণ ৬০°-৬৫° ফা· এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫"-৪০" প্রয়োজন। মধ্যম রকমের বৃষ্টিপাতযুক্ত মহাদেশীয় জলবায়ুই (Continental type of Climate) বীট উৎপাদনের পক্ষে উপযুক্ত। কারণ ইহার জন্য গ্রীষ্মকালে প্রচুর সূর্য্য কিরণ, কিন্তু মৃদু উষ্ণতা এবং শীতকালে শুষ্ক ও শীতল আবহাওয়ার প্রয়োজন হয়।

(২) চুন ও বালি মিশ্রিত উর্বর দোঁয়াশ মাটি ইহা চাষের পক্ষে উপযুক্ত। জমি সমতল হওয়া বাঞ্ছনীয়,। কারণ বীটের জমি অধিকাংশস্থলে কলের লাঙ্গল দ্বারা গভীর ভাবে চাষ করা হয়।

(৩) আখ অপেক্ষা বীট চাষের জন্য অধিকতর নৈপুণ্যের প্রয়োজন। কারণ জমি উত্তমরূপে চাষ করার পর উহা হইতে ইট্, পাথরের টুকরা প্রভৃতি বাছিয়া ফেলিতে হয়। ইহাতে বীটের মূল বড় হওয়ার সুযোগ পায়। জমিতে সার দিতে হয়। এ সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে নির্বাহের জন্য যথেষ্ট নিপুণ শ্রমিক প্রয়োজন।

(৪) বৃষ্টিপাত কম হইলে জলসেচ প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

১। আখ উৎপাদক দেশ :

আখ উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে ভারত প্রথম। মোট আখ উৎপাদনের প্রায় শতকরা ২০ ভাগ উৎপন্ন হয়। ভারতে আখ উৎপাদনে উত্তর প্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, মহীশূর ও পশ্চিমবঙ্গ উল্লেখযোগ্য। তবে দক্ষিণ ভারত অপেক্ষা উত্তর ভারতেই বেশী আখ (৬০ শতাংশ) উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু একর প্রতি ফলন দক্ষিণ ভারতেই বেশী। কারণ আখ চাষের প্রাকৃতিক অবস্থা যেমন মাটি, বৃষ্টিপাত, সমুদ্রবায়ু প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতেই বেশী অনুকূল। দক্ষিণ ভারতে বেশী অনুকূল থাকা সত্ত্বেও উত্তর ভারতে ইহার উৎপাদন বেশী প্রসারলাভ করার কারণ ইহা দক্ষিণ ভারত অপেক্ষা পূর্বেই আবাদের কাজে অগ্রসর হইয়াছে। সুলভ শ্রমিক ও জলসেচের সুবিধাই এ অঞ্চলকে অগ্রাধিকার দিয়াছে। তাহা ছাড়া এ অঞ্চলের ইহাই প্রধান অর্থকরী ফসল এবং কৃষকগণ ইহার চাষ আবাদে বিশেষ আগ্রহশীল। কালক্রমে এই প্রাধান্য বজায় থাকিবে কিনা বলা কঠিন। উত্তর ভারতের মধ্যে উত্তরপ্রদেশই আখ উৎপাদনে প্রথম। উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর, গোরক্ষপুর, ফয়জাবাদ, আজমগড, বালিয়া, বিহারের দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর, চম্পারণ, সারণ, পাঞ্জাবের অমৃতসর, জলন্ধর ও রোটক এবং মাদ্রাজের কোয়েম্বাটুর, মাদুরাই প্রভৃতি জেলা আখ চাষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তর প্রদেশে

আখ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও সর্বাধিক (৮০)। আখ উৎপাদনে ভারত প্রথম স্থান অধিকার করিলেও আখের চিনি উৎপাদনে কিউবা প্রথম। পৃথিবীর ১৫ শতাংশ আখ উৎপন্ন করিলেও কিউবার চিনি উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৬০ লক্ষ টন। ভারতের চিনি উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৩০ লক্ষ টন। গুড় ও চিনি মিশিয়া অবশ্য ভারতের উৎপাদন দাঁড়ায় প্রায় ৭০ লক্ষ টন। ভারতে প্রতি একরে উৎপাদন কম, আখ শিল্প প্রতিষ্ঠামগুলি আখক্ষেত হইতে দূরে, উৎপাদন ব্যয়ও অত্যধিক এবং আখের উপজাতীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুতের অনগ্রসরতাই ইহার জন্য দায়ী। ভারতে প্রতি একরে যেখানে আখ উৎপাদন হয় ১৫ টন, হাওয়াইতে সেখানে হয় ৬২ টন, জাভায় ৫৬ টন, মিশরে ৩০ টন ও কিউবাতে ১৭ টন। আখ উৎপাদনে কিউবার স্থান দ্বিতীয় এবং ব্রেজিলের স্থান তৃতীয় (১০ শতাংশ)।



পৃথিবীর ইক্ষুচিনি উৎপাদন স্থান

উপরিউক্ত স্থানগুলি ছাড়া আর যে যে স্থানে আখ উৎপন্ন হয় তাহাদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র (দক্ষিণাংশ), মেক্সিকো, গায়েনা, আর্জেন্টিনা, ত্রিনিদাদ, হাইতি, পোর্টোরিকো, ডোমিনিকা, ভারত মহাসাগরের জাভা, মরিসস, প্রশান্ত মহাসাগরের লুজন, ফিজি, ফরমোসা, ফিলিপাইন এবং নাটাল, মাদাগাস্কার, মিশর, পাকিস্তান, চীন, অষ্ট্রেলিয়ার কুইনস্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নিম্নে কয়েকটি দেশের উৎপাদনের পরিমাণ দেওয়া হইল।

(১৯৬০)

পৃথিবীর মোট আখ উৎপাদন ৩০ ৮০ কোটি মেট্রিক টন।

ভারত	৭ ৯০ কোটি টন	ফিলিপাইন	১'২৫ কোটি টন
কিউবা	৫ ৬৮ „ „	পাকিস্তান	১ ২৪. „ „
ব্রেজিল	৪ ০০ „ „	অষ্ট্রেলিয়া	১'০২ „ „

ইন্দোনেশিয়া ৭০ লক্ষ টন

ভারতের আখ উৎপাদন সাধারণত নিম্নরূপ :

উত্তর প্রদেশ	৩০ লক্ষ টন	মাদ্রাজ	৪ লক্ষ টন
মহারাষ্ট্র ও গুজরাট	৩ „ „	বিহার	৩ „ „
পাঞ্জাব	৬ „ „	মহীশূর	৩ „ „
অন্ধ্র	৫ „ „	উড়িষ্যা	১ „ „

২। বীটের উৎপাদক অঞ্চল :

বীট উৎপাদনে রাশিয়ার স্থান প্রথম এবং যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয়। অন্যান্য উৎপাদক দেশের মধ্যে জার্মানী, ইটালি ফ্রান্স পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া, হল্যাণ্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, কানাডা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রধান প্রধান দেশে বীট উৎপাদন নিম্নলিখিতরূপ পাওয়া যায়।

(১৯৬০)

পৃথিবীর মোট বীট উৎপাদন ১৪ ৩৪ কোটি মেট্রিক টন।

রাশিয়া	৪ ৪০ কোটি টন	ইটালি	১ ১১ কোটি টন
যুক্তরাষ্ট্র	১ ৭১ „ „	ফ্রান্স	৭০ „ „
জার্মানী	১ ৭১ „ „	পোল্যাণ্ড	'৬০ „ „

Q 21. Describe briefly the uses of Sugar-cane and Sugar-beet. (আখ ও বীটের ব্যবহার সংক্ষেপে বর্ণনা কর।)

Ans : আখের ব্যবহার নিম্নরূপ :

১) ইহা হইতে গুড ও চিনি প্রস্তুত হয়। গুড ও চিনি মানুষের প্রধান মিষ্ট খাদ্যদ্রব্য চিনি ও গুড রসগোল্লা সন্দেশ, লজেন্স, বিস্কুট প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

(২) আখের রস হইতে সুরাসার (alchohol) প্রস্তুত হয়।

৩) আখের ছিবড়া পশুর খাদ্য ও উত্তম জ্বালানি।

(৪) ইহা হইতে কাগজ, কয়লা, আলকাতরা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

(৫) ইহার গায়ের শুষ্কপত্র হইতে প্যাক করার কাগজ প্রস্তুত হয়। দণ্ডের অগ্রভাগও পশুর খাদ্য।

(৬) ছিবড়ার ছাই জমির সার হিসাবে ও কাঁচ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

বীটের ব্যবহার নিম্নরূপ :

( ) ইহা হইতে চিনি প্রস্তুত হয়।

(২) বীটের মূল হইতে চিনি প্রস্তুত করার পর যে মণ্ড থাকে উহা পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

Q. 22. Describe briefly the international trade in Sugar-cane and Sugar-beet : (আখ ও বীট চিনির বৈদেশিক বাণিজ্য বর্ণনা কর)।

Ans : পৃথিবীতে আখের চিনি উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ এবং বীটের চিনি উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৩০ ভাগ। অবশিষ্ট চিনি খেজুর, তাল, আঙ্গুর, ভূট্টা, ম্যাপল প্রভৃতি গাছ হইতে সংগ্রহ হয়। নিম্নে বিভিন্ন দেশে আখের চিনি ও বীটের চিনি উৎপাদনের পরিমাণ মোটামুটি ভাবে দেওয়া হইল। উহা হইতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উহাদের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করার সুবিধা হইবে।

পৃথিবীর মোট চিনি উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৫ কোটি টন।

(আখের চিনি)

কিউবা	৬০ লক্ষ টন	ফিলিপাইন	১৩ লক্ষ টন
ব্রেজিল	৩১ ,, ,,	হাওয়াই	১০ ,, ,,
ভারত	৩০ ,, ,,	পোর্টোরিকো	৯ ,, ,,
অষ্ট্রেলিয়া	১৮ ,, ,,	ইন্দোনেশিয়া	৮ ,, ,,

যুক্তরাষ্ট্র ৪ লক্ষ টন

বীটের চিনি

রাশিয়া	৬৫ লক্ষ টন	জার্মাণী	২৫ লক্ষ টন
যুক্তরাষ্ট্র	২৬ ,, ,,	ইটালি	১১ ,, ,,

ফ্রান্স ১০ লক্ষ টন

বীটের চিনি উৎপাদন সাধারণতঃ উৎপাদক দেশগুলির প্রয়োজন মিটানোর জন্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইহার অংশ খুব কম। রাশিয়া, জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ কিছু পরিমাণ বীটের চিনি রপ্তানি করিয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই প্রধান বীটের চিনি আমদানিকারক দেশ। ইহা ছাড়া বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশও কিছু আমদানি করিয়া থাকে।



•পৃথিবীর চিনি উৎপাদন স্থান•

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আখের চিনির স্থানই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহার রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে কিউবা, জ্যামেইকা, পোর্টোরিকো, হাওয়াই, ব্রেজিল, বৃটিশ গিয়ানা, জাভা, ফিলিপাইন, ফরমোজা, মরিসাস, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে ইংল্যাণ্ড, চীন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলি উল্লেখযোগ্য। বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র প্রধানতঃ কিউবা হইতে চিনি আমদানি করিয়া থাকে। চীন ও জাপান প্রধানতঃ ফরমোসা, জাভা, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানি করিয়া থাকে।

Q. 23. Compare and contrast the conditions connected with the production and marketing of Sugar-cane and Sugar-beet.

(আখ ও বীটের উৎপাদন ও বণ্টন সম্বন্ধে তুলনামূলক বিচার কর)।

Ans : নিম্নে আখ ও বীট সম্বন্ধে তুলনামূলক বিচার করা হইল :

আখ	বীট
১। ক্রান্তীয় ও উপ-ক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল।	১। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফসল
২। উত্তাপ ৬০-৮০ ফাঃ এবং বৃষ্টিপাত ৪০"-৭০" প্রয়োজন।	২। উত্তাপ ৫৫-৭০ এবং বৃষ্টিপাত ২০"-৪০' প্রয়োজন।
৩। সমুদ্রবায়ু উপকারী।	৩। সমুদ্র বায়ু অনাবশ্যক।
৪। উৎপাদনের সময় ৯ মাস হইতে ১ বৎসর।	৪। উৎপাদনের সময় ৫।৬ মাস।
৫। একই আবাদী গাছের মূল হইতে ৩।৪ বৎসর ফসল পাওয়া যাইতে পারে	৫। প্রতি বৎসর চাষ করিতে হয়।
৬। চূর্ণ ও লবণ সংযুক্ত পলিমাটি বা দোঁয়াশ-মাটি চাষের পক্ষে উপযুক্ত।	৬। বালু মিশ্রিত উর্বর দোঁয়াজ-মাটি উপযুক্ত।
৭। জল-নিকাশের উপযুক্ত জমি চাই।	৭। মাঠের জল মূলে শোষিত হওয়া চাই।
৮। প্রচুর সুলভ শ্রমিক প্রয়োজন।	৮। প্রচুর দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন।
৯। ভারত, কিউবা, ইন্দোনেশিয়া, হাওয়াই, ব্রেজিল, চীন, পোর্টো-রিটো, মরিসাস, ফিলিপাইন, ফরমোসা, ত্রিনিদাদ প্রভৃতি উৎপাদক অঞ্চল।	৯। রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভিয়া, রুমানিয়া, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, কানাডা প্রভৃতি উৎপাদক অঞ্চল।
১০। প্রধান রপ্তানিকারক দেশ—কিউবা, জাভা, ফরমোসা, হাওয়াই, ত্রিনিদাদ, মরিসাস ও ভারত।	১০। প্রধান রপ্তানিকারক দেশ—রাশিয়া, জার্মানী, পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভিয়া।
১১। প্রধান আমদানিকারক দেশ—ইংল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও সুইডেন।	১১। প্রধান আমদানিকারক দেশ—যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ডেনমার্ক।

Q. 24. What physical and climatic conditions make Cuba the most important producer of cane sugar ? (C. U Inter, 1958)

(কি কি প্রাকৃতিক ও জলবায়ুর অবস্থার জন্য কিউবা আখের চিনি উৎপাদনে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।)

Ans আখের চিনি উৎপাদনে কিউবা পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহার উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৬০ লক্ষ টন। নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক ও জলবায়ুর অবস্থা ও অন্যান্য কারণ ইহার এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভে পরম সহায়ক :

(১) কিউবা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপ। ইহা ঘনবসতিপূর্ণ নহে। এজন্য ইহার বিস্তৃত এলাকা ব্যাপিয়া আখের চাষের সুবিধা হইয়াছে।

(২) কিউবার জলবায়ু ক্রান্তীয়। ইহার উত্তাপের পরিমাণ ৭০ ফা: এর উপরে এবং বৃষ্টিপাতও ৪০ র উপরে। এরূপ জলবায়ু আখ চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

(৩) কিউবা সমুদ্রবেষ্টিত। এজন্য আখের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সমুদ্রবায়ু পাওয়ারও কোন অসুবিধা নাই।

(৪) ভূমিভাগ আখের চাষের উপযুক্ত লবণ ও চূণ মিশ্রিত উর্বর মৃত্তিকা এবং জল নিকাশের সুবন্দোবস্তযুক্ত।

(৫) ক্রান্তীয় অঞ্চলের সুলভ শ্রমিকেরও এখানে অভাব নাই।

(৬) আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের আটলান্টিক পথের মধ্যস্থলে ইহা অবস্থিত। এজন্য চিনি বিদেশে রপ্তানি করার বিশেষ সুবিধা। নিকটবর্তী যুক্তরাষ্ট্রও কিউবার চিনি রপ্তানিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৭) যুক্তরাষ্ট্রের মূলধন ও পরিচালনাও ইহার চিনি উৎপাদনে বিশেষ সাহায্যকারী।

(৮) আখের ক্ষেত্রগুলি চিনির কারখানার সন্নিকটে অবস্থিত। এজন্য কাঁচামাল পরিবহনের ব্যয় কম।

(৯) নানাবিধ সুযোগ সুবিধার জন্য চিনির উৎপাদন ব্যয়ও কম এবং পৃথিবীর বাজারে প্রতিযোগিতা করার যোগ্যতা রাখে।

উপরিউক্ত অবস্থাগুলি বর্তমান থাকায় চিনি উৎপাদনে কিউবা সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

Q. 25. Describe the geographical conditions best suited for the cultivation of Rubber. Mention the different countries from which it is principally exported. (C U Inter, 1945, 1947, 1950).

(রবার চাষের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ভৌগোলিক অবস্থাগুলি বর্ণনা কর। যে যে দেশ প্রধানতঃ রবার রপ্তানি করে তাহাদের নাম উল্লেখ কর।)

Ans : রবার চাষের জন্য নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি বিশেষ প্রয়োজন :

(১) ইহা নিরক্ষীয় ও বৃষ্টিবহুল মৌসুমী অঞ্চলের উদ্ভিদ। এজন্য ইহার চাষের জন্য প্রচুর উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। উত্তাপের পরিমাণ ৭০—৯০ ফা: এবং বৃষ্টির পরিমাণ ৮০″—৯০″ হওয়া আবশ্যক। এই উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত সারা বৎসর প্রায় সমভাবে থাকা উচিত। শুষ্ক আবহাওয়া এমনকি এক মাস থাকিলেও চাষের পক্ষে ক্ষতিকর। আবার খুব বেশী (১০০″র) বৃষ্টিপাত হইলে বা বন্যা প্লাবিত অঞ্চল হইলে রবারের আঠা তরল হয়।

(২) যে সমস্ত স্থানে স্বাভাবিক উদ্ভিদের পাতা পচিয়া মাটির সহিত মিশ্রিত থাকিয়া জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে সেই সমস্ত স্থানই ইহা আবাদের উপযুক্ত ক্ষেত্র। পাহাড়ের ঢালে, উচ্চভূমিতে বা সমভূমিতে যেখানে জল নিকাশের ব্যবস্থা আছে সেখানেই রবার চাষ ভাল হইয়া থাকে। গাছের গোড়ায় জল জমিয়া থাকা ক্ষতিকর।

(৩) উপরিউক্ত ভৌগোলিক অবস্থা ভিন্ন সুলভ শ্রমিকও প্রয়োজন। কারণ রবারের চাষ ও রবারের রস (latex) সংগ্রহ করার জন্য প্রচুর লোক প্রয়োজন। শ্রমিকের দক্ষতাও প্রয়োজন। কারণ গাছের ছাল কাটিয়া রস সংগ্রহ করিতে হয়। এই ছাল কাটার মধ্যে নিপুণতা আছে। অন্যথায় গাছের ক্ষতি হয়।

মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, শ্যাম, সিংহল, ব্রেজিল, ভেনিজুয়েলা, কলম্বিয়া ও কঙ্গো রবার রপ্তানিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

Q. 26. Describe the production of natural Rubber in different countries of the world with special reference to India.

(পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশেষতঃ ভারতের সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া স্বাভাবিক রবার উৎপাদন বর্ণনা কর)।

Ans : প্রাকৃতিক রবার সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত : (১) বন্য রবার (Wild Rubber) এবং (২) আবাদী রবার (Plantation Rubber)। যে রবার

গাছ স্বাভাবিকভাবে বনে জন্মিয়া থাকে তাহা হইতে সংগৃহীত রবারকে বন্য রবার বলে। এরূপ রবার কঙ্গো, ব্রেজিল, নাইজেরিয়া, লাইবিরিয়া, ভেনিজুয়েলা, ইকুয়েডর বলিভিয়া, কলম্বিয়া ও মেক্সিকোতে প্রধানতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। রবার গাছ সযত্নে আবাদ করিয়া তাহা হইতে যে রবার সংগ্রহ করা হয় তাহাকে আবাদী রবার বলে। মালয়, ইন্দোনেশিয়া, সারওয়াক, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন, সিংহল, ব্রেজিল, নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া ও ভারত প্রভৃতি দেশ আবাদী রবার উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য।

পূর্বে বন্য রবারই বেশী সংগ্রহ হইত। কিন্তু বন্য রবার অস্বাস্থ্যকর ও শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম অরণ্য হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। ইহা যে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার—বলাই বাহুল্য। রবার গাছও বন্য অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে। এ অবস্থায় রবার সংগ্রহ করা ব্যয়বাহুল্যও বটে। এজন্য ক্রমে ক্রমে রবার গাছের আবাদ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বর্তমানে মোট রবার উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ আবাদী রবার। আবাদী রবার উৎপাদনে মালয় ও ইন্দোনেশিয়াই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। পৃথিবীর মোট রবার উৎপাদন প্রায় ২০ লক্ষ মেট্রিক টন। উহার মধ্যে উক্ত দুইটি দেশের উৎপাদনে পরিমাণ প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ। তবে উভয়ের



পৃথিবীর রবার উৎপাদনে স্থান

উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় সমান। প্রথম স্থান উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন বৎসরে ভাগাভাগি হইয়া আসিতেছে।

ভারতে রবার উৎপাদন খুব কম। পৃথিবীর উৎপাদনের শতকরা ২ ভাগও নয়। কেরালা, মহীশূর ও মাদ্রাজেই ইহার উৎপাদন সর্বাধিক। আসামেও সামান্য

উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার প্রতি একরে উৎপাদনও খুব কম-মাত্র ২৮৫ পাউণ্ড। ভারত সামান্ত রবার ইংলণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করিলেও প্রতি বৎসর প্রায় ৫০০০ টন রবার বিদেশ হইতে আমদানি করিয়া থাকে। ভারতে রবার উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইবে। বর্তমান উৎপাদন প্রায় ২৫০০০ টন। রবার বাগানগুলিতে প্রায় ১½ লক্ষ শ্রমিক কাজ করিতেছে। রবার কারখানাগুলি বোম্বাই, মাদ্রাজ, কেরালা ও কলিকাতায় অবস্থিত। ইহাতে প্রায় ৩৩ হাজার শ্রমিক কাজ করে। কিন্তু কারখানায় উৎপাদন আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় কম। উত্তর প্রদেশে একটি সংযোগাত্মক রবার প্রস্তুতের কারখানাও স্থাপিত হইতেছে।

Q. 27 Explain why rubber plantations have been mainly developed in South-East Asia, though the equatoral type of climate needed for rubber production prevails in many parts of the world (C. U. Inter, 1958)

(রবার উৎপাদনের উপযুক্ত নিরক্ষীয় জলবায়ু পৃথিবীর অনেকাংশে থাকিলেও উহার আবাদ প্রধানতঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উন্নত কেন তাহা ব্যাখ্যা কর।)

Or

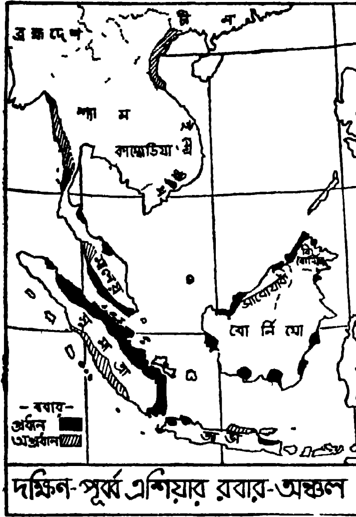
How do you explain that Rubber is grown in Malay? (Pre C. U. 1962)

মালয়ে রবার উৎপাদনের কারণ কি ?

Ans: প্রাকৃতিক রবারের শতকরা ৯০ ভাগ আবাদী রবার হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই আবাদী রবারের উৎপাদন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিশেষতঃ মালয় ও ইন্দোনেশিয়ায় বেশীর ভাগ সীমাবদ্ধ যদিও রবার উৎপাদনের প্রয়োজনীয় নিরক্ষীয় জলবায়ু আরও বিভিন্ন অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ নিম্নলিখিত উপায়ে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে।

(১) দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া ছাড়া কঙ্গো ও আমাজন অববাহিকায় নিরক্ষীয় জলবায়ু দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে রবার উৎপাদনের উপযোগী জলবায়ু বর্তমান। এজন্য বহু বন্য রবার গাছও দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে এ বন্য রবার গাছ হইতে অধিকাংশ রবার সংগ্রহ হইত। কিন্তু এ অঞ্চলের অসুবিধাও অনেক। ইহা অস্বাস্থ্যকর, দুর্গম, শ্বাপদসঙ্কুল, যানবাহনের অসুবিধাযুক্ত, বিরল বসতিপূর্ণ ও প্রধান আন্তর্জাতিক

বাণিজ্যপথ হইতে কিছুটা দূরে। ইহা ছাড়া রবার গাছগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সামান্য রবার রস সংগ্রহ করিতে অনেক স্থানে ঘুরিতে হয়। এরূপ অসুবিধাযুক্ত স্থানে এরূপ ঘোরাফেরা করা যে কিরূপ কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল ইহা সহজেই অনুমেয়। ক্রমে মানুষ প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া সুবিধাযুক্ত স্থানে রবার আবাদ করার ব্যাপারে গবেষণা আরম্ভ করিল এবং উহাতে সাফল্য লাভ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও নিকটবর্তী অন্যান্য অঞ্চলে রবার চাষ আরম্ভ করিল। ইহার ফলে বন্য রবার সংগ্রহ হ্রাস পাইতে লাগিল এবং আবাদী রবার গাছ হইতে রবার সংগ্রহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।



দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার রবার-অঞ্চল

(২) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রবার চাষে অনেক সুবিধাও দেখা দিল। ইহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথের উপর অবস্থিত। স্থানগুলি সমুদ্রবেষ্টিত ও সমুদ্র সন্নিকটে অবস্থিত বলিয়া জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ। চলাচল ব্যবস্থার উন্নতিতে বিশেষ অন্তরায় সৃষ্টি করে নাই। এ অঞ্চলে লোকবসতিও প্রচুর এবং সুলভ শ্রমিক সরবরাহেরও কোন অসুবিধা দেখা দেয় নাই। এ সমস্ত শ্রমিক চাষ আবাদ কার্যেও অভ্যস্ত।

(৩) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যখন রবার আবাদ আরম্ভ হয় তখন এ অঞ্চলে ওলন্দাজ ও ইংরেজ আধিপত্য ও অধিকার পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল। ইহাদের কর্মকুশলতা, মূলধনের প্রাচুর্য্য ও ব্যবসায় বৃদ্ধির জন্য রবার চাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

(৪) উত্তরোত্তর বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজনের জন্য রবারের চাহিদাও এখানে রবার চাষ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

Q. 28 Discuss the method of cultivation and collection of rubber and also its uses.

(রবার চাষ ও সংগ্রহ প্রণালী এবং উহার ব্যবহার বর্ণনা কর।)

Ans: রবার একপ্রকার বৃক্ষের কষায় বা নির্য্যাস। উক্ত বৃক্ষের প্রকৃত নাম কুচুক (caoutchouc) এবং আর যে কষায় হইতে ব্যবহার উপযোগী রবার পাওয়া যায় তাহার নাম কেহচু (cahutchu)। তবে আমাজন অববাহিকায় যে বৃক্ষ হইতে রবার রস সংগ্রহ হয় তাহার নাম হেভিয়া (Hevea)। রবার নির্যাসের ইংরাজী নাম ল্যাটেক্স (Latex)। ব্রেজিলের রবার বৃক্ষের নাম ব্রেজিলিয়ান হেভিয়া (Hevea Braziliansis) বলা হয়। ব্রেজিলের প্যারা বন্দর দিয়া প্রথমতঃ ইহা প্রধানতঃ রপ্তানি হইত বলিয়া ইহার অন্য নাম প্যারা রবার। এই হেভিয়া বৃক্ষ ছাড়া মধ্য-আমেরিকার পানামা, মধ্য-ব্রেজিলের সিয়েরা এবং মেক্সিক্যান গাছ হইতেও রবার পাওয়া যায়। ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ায় হেভিয়া রবার গাছের চাষই প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। বন্য রবার স্বাভাবিকভাবেই জন্মিয়া থাকে। উহার চাষ করিতে হয় না। বন্য রবার হইতে অধিক রস একযোগে বাহির করার উদ্দেশ্যে গাছের অধিক অংশ কাটা হইয়া আসিতেছে। ফলে কিছুকালের মধ্যে উক্ত বৃক্ষ মরিয়া যায়। ইহার ফলেও বহু বন্য রবার গাছ নিশ্চিহ্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং ফলে উৎপাদনও হ্রাস পাইয়াছে।

আবাদী রবারের চারা রোপণ করা হয়। উক্ত গাছ ৭।৮ বৎসরের হইলে তাহার রস সংগ্রহ আরম্ভ হয়। গাছের গায়ে ধারাল ছুরির আগা দিয়া দুই দিক হইতে দুইটি দাগ কাটিয়া V এর আকার করা হয়। দুই দাগের মিলন স্থলে 'নাল' পুতিয়া দিতে হয়। দুই দাগের উপরিভাগ খেজুর গাছের রস সংগ্রহের মত অল্প অল্প করিয়া কাটিয়া দিতে হয়। নালের মুখে একটি পাত্র রাখিতে হয় এবং উক্ত কাটা স্থান হইতে 'নাল' দিয়া আস্তে আস্তে রস আসিয়া পাত্রে জমা হয়। রবার গাছ এরূপভাবে কাটার জন্য নিপুণতার প্রয়োজন। আনাড়ি লোক দ্বারা গাছ কাটাইলে গাছের সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে। এইভাবে যে রস সংগ্রহ হয় তাহা হইতেই রবার প্রস্তুত হয় এবং বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়।

রবারের ব্যবহার নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

(১) প্রথমতঃ ইহা পেন্সিলের দাগ মুছিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। ঘষিয়া দাগ মুছিতে হইত বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে রাবার বা রবার (Rubber)।

(২) ১৮২৩ সালে একজন স্কচ, নাম ম্যাকিনটস (Mackintosh) রবার দ্বারা

বর্ষাতি (water proof) প্রস্তুত করেন। বর্ষাতির নামও তাঁহার নামানুসারে ম্যাকিনটস বলিয়া পরিচিত হইতে থাকে।

(৩) ১৮৩৯ সালে চার্লস গুডইয়ার (Charles Good Year) রবারের সহিত গন্ধক (Sulphur) মিশাইয়া ইহাকে উত্তাপে গলিযা বা শীতে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার হাত হইতে রক্ষা করেন। উক্ত প্রক্রিয়ার নাম ভালকানিজেসন (Vulcanisation) বলা হয়। এই ভালকানিজেসন অবিষ্কারের পর রবার হইতে জুতা, সাইকেল বা মোটর গাড়ীর টায়ার, টিউব প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে থাকে।

৪) ইহা ছাডা বর্তমানে রবার আবও বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন জিনিস প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইতেছে। তন্মধ্যে চিকিৎসার নানা প্রকাব যন্ত্রপাতি, খেলার জিনিসপত্র যেমন বল, পুতুল ইত্যাদি, ঝর্ণা কলম, ব্যাগ, বালিশ, দস্তানা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(৫) ইহা বিদ্যুৎরোধক বলিযা বিদ্যুৎ-শিল্পেও নানা ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Q. 29. What is Synthetic Rubber ? Is it seriously competing with natural rubber ?

(সংযোগাত্মক রবার কাহাকে বলে ? ইহা কি স্বাভাবিক রবারের সহিত প্রবল প্রতিযোগিতা করিতেছে ?

Ans · কাঠের মণ্ড, কাপডের টুকরা, কয়লা ও খনিজ তৈল উপজাত দ্রব্য ও অন্যান্য নানাপ্রকার দ্রব্যাদির যেমন এসিটোন, বেনজিন, সেলুলোজ, স্পিরিট প্রভৃতির রাসায়নিক সংযোগে কৃত্রিম উপায়ে যে রবার প্রস্তুত হয় তাহাকে সংযোগাত্মক রবার (Synthetic Rubber) বলে। এই রবার দ্বারা উৎকৃষ্ট টায়ার ও তৈলবাহী নল প্রস্তুত হয়। ইহা অন্যান্য কাজে রবারের পরিবর্ত (substitute) হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে।

সংযোগাত্মক রবার প্রথমে জার্মানী প্রথম মহাযুদ্ধের সময় প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। পরে অবশ্য কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশও ইহা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত ইহার উৎপাদনের পরিমাণ খুব বেশী ছিল না। মোট রবার উৎপাদনের ইহা শতকরা ৮ ভাগ মাত্র ছিল। স্বাভাবিক রবার উৎপাদক দেশগুলি নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত। কিন্তু রবার ভোগকারী দেশগুলির অধিকাংশই নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের দেশগুলি এই পরিনির্ভরতার হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যেই সংযোগাত্মক রবার উৎপাদনে মনোনিবেশ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার

দেশগুলি অধিকার করার পর ইউরোপ ও আমেরিকার ঐ অঞ্চল হইতে রবার সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায়। ফলে সংযোগাত্মক রবার উৎপাদনে নূতন প্রেরণা আসে এবং অব্যাহত গতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে ১৯৪৫ সালে সংযোগাত্মক রবার উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট রবার উৎপাদনের শতকরা ৮৪ ভাগ। যুদ্ধের পর অবশ্য স্বাভাবিক রবার উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উহার ব্যবহারও বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে। ১৯৬০ সালে উভয় প্রকার রবার উৎপাদন নিম্নরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বাভাবিক		সংযোগাত্মক	
ইন্দোশিয়া	৭.৪২ লক্ষ টন	পূর্বজার্মানী	৮৪ লক্ষ টন
মালয়	৬৫০ " "	পশ্চিম জার্মানী	২৪ " "
শ্যাম	১৩০ " "	যুক্তরাষ্ট্র	১৩ " "
		কানাডা	১ " "

রাশিয়াও সংযোগাত্মক রবার উৎপাদনে বিশেষ অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। রবারের চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে উভয় প্রকার রবার একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে অভাবপূরণ করিয়া আসিতেছে। সুতরাং বর্তমানে উভয়ের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলিতেছে ঠিক বলা চলে না। তবে ভবিষ্যতে উহাদের উৎপাদন ও মূল্যের উপর একে অন্যকে প্রতিযোগিতায় হটাইয়া দিতে পারিবে কিনা নির্ভর করিবে।

Q 30. What are the geographical conditions necessary for the successful cultivation of tea ? Discuss the supply and demand position of the tea in the world to-day, (C. U, Inter 1952)

সাফল্যের সহিত চায়ের আবাদ করিতে কিরূপ ভৌগোলিক অবস্থাগুলি প্রয়োজন? পৃথিবীতে চায়ের চাহিদা ও যোগানের অবস্থা আলোচনা কর।)

Ans : চায়ের আবাদের জন্য নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি প্রয়োজন :

(১) ইহা সাধারণতঃ ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল। এজন্য ইহার প্রচুর উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। উত্তাপ ৭০°—৮০° ফাঃ এবং বৃষ্টিপাত গড়ে ৮০ ইঞ্চির অধিক হইলে ভাল হয়।

(২) তুষার বা কুয়াশা ইহার উৎপাদনের পক্ষে ক্ষতিকর না হইলেও উহার উৎপাদনের হার হ্রাস করে। এজন্য রাশিয়ার দক্ষিণাংশে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই কিছু চা উৎপন্ন হইতেছে।

(৩) বৃষ্টিপাত সারাবৎসর হইলে সব সময়ই নূতন পাতা বাহির হইতে পারে এবং ইহাতে ফসলও বৃদ্ধি পায়।

(৪) জৈব উদ্ভিদ ও রাসায়নিক পদার্থে সমৃদ্ধ উর্বর দোয়াঁশ মাটি চা আবাদের উপযোগী। কিন্তু জমিতে জল নিকাশের উপযুক্ত থাকা আবশ্যক। এজন্য পাহাড়ের বা উপত্যকার ঢালু অংশ চা আবাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

(৫) উপরিউক্ত ভৌগোলিক অবস্থাগুলি ছাড়া সুলভ শ্রমিকও প্রয়োজন। চায়ের আবাদ, তত্ত্বাবধান ও পাতা তোলার জন্য এরূপ শ্রমিক দরকার। চায়ের যে পাতা তোলা হয় তাহা দুইটি পাতা সহ একটি কুড়ি। চা বাগানে এরূপ পাতা তোলার কাজে স্ত্রী-শ্রমিকও বিশেষ উপযোগী।

(৬) চাযের চারা রোপণের ৩।৪ বৎসব পর হইতে উহা পাতা তোলার উপযুক্ত হয়। এই সময়ে গাছেব বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হয় এবং উপযুক্ত পরিমাণ সারও প্রয়োগ করিতে হয। গাছ একবার পাতা তোলার উপযুক্ত হইলে একই গাছ হইতে ৩০।৪০ বৎসব পর্যন্ত পাতা তোলা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় গাছ ৩০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে চাযেব পাতা তোলা অসুবিধাজনক। এজন্য গাছের আগা কাটিযা উহার উচ্চতা রোধ করা হয়। এইভাবে ৩।৪ ফুটেব বেশী গাছকে বাড়িতে দেওয়া হয় না। সুতবাং চা আবাদ অত্যন্ত পরিশ্রম ও সতর্কতার কাজ।

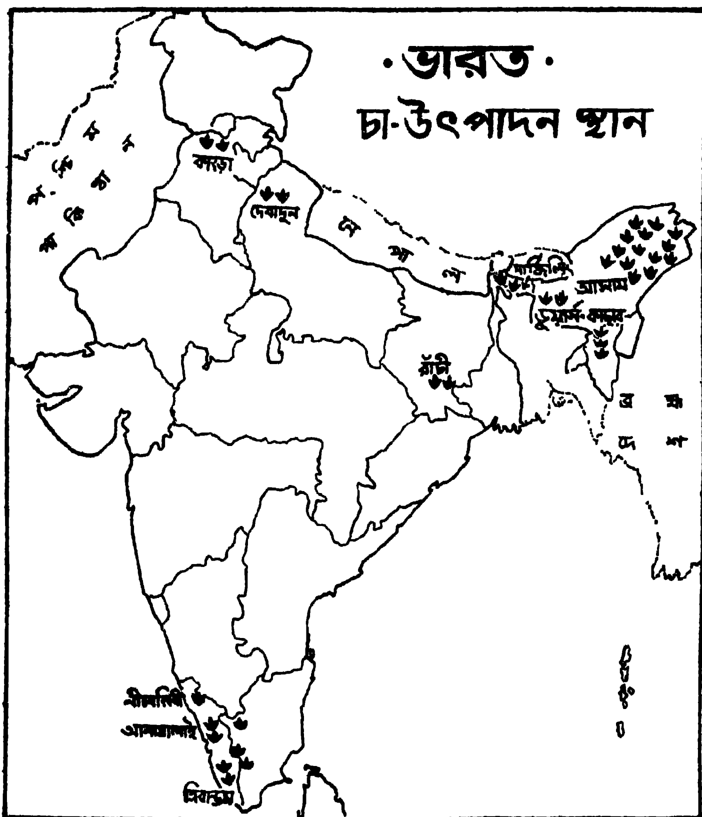
চায়ের যোগান বা উৎপাদন নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ কবা যাইতে পারে:

চা উৎপাদনে ভারত, সিংহল, চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ও পূর্ব আফ্রিকা উল্লেখযোগ্য।

ভারতের চা উৎপাদনে উত্তর ভারতের আসাম পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিং উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া উত্তর ভাবতের বিহারের রাঁচি, পুর্ণিয়া ও হাজারীবাগ, উত্তর প্রদেশের আলমোড়া ও গাড়োয়াল এবং পাঞ্জাবের কাংড়া উপত্যকায় সামান্য চা উৎপন্ন হয়। আসামেই সর্বাপেক্ষা বেশী চা উৎপন্ন হয়। চা উৎপাদনে ইহার কাছাড়, ডিব্রুগড, লক্ষিমপুর প্রভৃতি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। উত্তর ভারত মোট উৎপাদনের শতকরা ৭৫ ভাগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। তন্মধ্যে আসামের অংশ শতকবা ৫০ ভাগ। বাকী অংশ দক্ষিণ ভারতের কেরালা, মাদ্রাজ, মহীশূর ও মহারাষ্ট্রে উৎপন্ন হয়। উহাদের মধ্যে আবার নীলগিরি, আনামালাই ও কার্ডামাম পাহাড়ের ঢালেই বেশী আবাদ হইয়া থাকে।

সিংহলের চা উৎপাদন মধ্যভাগেই বেশী উৎপন্ন হয়। চীনে ইয়াংসি নদীর

দক্ষিণেই অধিকাংশ চা উৎপন্ন হয়। ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে জাভায় বেশী চা উৎপন্ন হয়। জাপানের দক্ষিণাংশেই চা বেশী জন্মে। পাকিস্তানে শ্রীহট্ট ও



চট্টগ্রাম জেলায় চায়ের আবাদ সীমাবদ্ধ। পূর্ব আফ্রিকার উল্লেখযোগ্য চা উৎপাদন অঞ্চল হইল কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঙ্গানিকা, নিয়াসাল্যাণ্ড ও নাটাল।

উপরোক্ত স্থানগুলি ছাড়া রাশিয়ার ককেসাস অঞ্চলে, ইরান ও ব্রেজিলে কিছু চা উৎপন্ন হইতেছে। চা উৎপাদনেব বিভিন্ন দেশের অবস্থা মোটামুটি নিম্নরূপঃ

(১৯৬০)

ভারত	৩১৭ লক্ষ টন	জাপান	৩৮ হাজার টন
সিংহল	১৯৭ " "	ইন্দোনেশিয়া	৪১ " "
চীন	১৫৯ " "	পাকিস্তান	৩০ " "

নিয়াসাল্যাণ্ড ১২ হাজার টন

চায়ের চাহিদা বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিম্নরূপ :

চা রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে ভারত, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, পূর্ব আফ্রিকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। চা রপ্তানিতে ভারত প্রথম, সিংহল দ্বিতীয় ও ইন্দোনেশিয়া তৃতীয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ চা ভারত রপ্তানি করে। সিংহল চা রপ্তানিতে ভারতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। পূর্ব আফ্রিকার সস্তা নিম্নশ্রেণীর চাও ভারতের প্রতিযোগী। সুতরাং চায়ের মূল্য কম ও উৎকর্ষ সাধন না হইলে ভবিষ্যতে এক্ষেত্রে ইহার বিপদেব আশঙ্কা আছে। চীনের সাধারণতঃ সবজ্ চা এবং উহার কতকটা ইষ্টক আকারে জমাইয়া তিব্বতে প্রেরিত হইয়া থাকে। সিংহলের চা উচ্চশ্রেণীর। ইহার বাগানে অনেক বৃটিশ মূলধন এবং দক্ষিণ ভারতের তামিল শ্রমিক নিয়োজিত আছে। এখানে গ্রীষ্ম ও শীত উভয় ঋতুতে বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া ফলনও ভাল হয়।



পৃথিবীর চা উৎপাদনের স্থান

প্রধান প্রধান চা আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে বৃটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মিশর, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভারতের চা অধিকাংশ এই সকল দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। ভারত, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়া

এই তিনটি দেশই আমেরিকায় চা রপ্তানি করে এবং এই তিনটি দেশের প্রচারকার্যের ফলে তথায় চায়ের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বর্তমানে আবার উক্ত মহাদেশের কাফির দিকেই ঝোক দেখা যাইতেছে। ইংলণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড ও রাশিয়াতেই চা পানীয় হিসাবে বেশী ব্যবহৃত হয়।

চা রপ্তানিকারক বন্দরগুলির মধ্যে ভারতের কলিকাতা, মাদ্রাজ ও কোচিন, সিংহলের কলম্বো, পাকিস্তানের চট্টগ্রাম ও ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা উল্লেখযোগ্য। চা আমদানি বন্দরের মধ্যে লণ্ডন, আমাষ্টার্ডাম, বোষ্টন, নিউইয়র্ক, মণ্টিল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।- লণ্ডন ও কলিকাতা চায়ের বিতরণ কেন্দ্র (distributing centre) হিসাবে খুবই নাম আছে। কোচিনও দিন দিন চা বাজার হিসাবে উন্নতি লাভ করিতেছে।

Q 31. Describe different types of tea, its preparation and uses,

(বিভিন্ন প্রকারের চা, উহার প্রস্তুতপ্রণালী ও ব্যবহার বর্ণনা কর।)

Ans. চা বিভিন্ন প্রকারের, যেমন কাল চা (Black Tea), সবুজ চা (Green Tea), ইষ্টক চা (Brick Tea), ইত্যাদি।

চা প্রস্তুত প্রণালী নিম্নরূপ :

আমরা যে চা পান করিয়া থাকি উহা চা গাছের দুইটি কচি পাতা সহ একটী কুঁড়ি। চা প্রস্তুতের জন্য চা গাছ হইতে উক্ত দুইটি কচি পাতাসহ কুঁড়িগুলি তুলিয়া লওয়া হয়। উক্ত পাতাসহ কুঁড়িগুলি উত্তাপে শুকাইয়া লওয়া হয়। এরূপ শুষ্ক চা পাতা চা ও গুড়া চা এই দুই অংশে বিভক্ত করা হয়। এরূপভাবে চা প্রস্তুত করিলে চায়ের র' কাল হয়। ইহাকে কাল চা বলা হয়। ভারত, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশ আভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারের চাহিদা মিটানোর জন্য 'কাল চা' প্রস্তুত করিয়া থাকে।

চায়ের পাতা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া যে চা প্রস্তুত করা হয় তাহাকে সবুজ চা বলে। এরূপ চা চীন, জাপান ও ফরমোজা বেশী প্রস্তুত করিয়া থাকে।

চা পাতা ইষ্টকাকারে জমান হইলে তাহাকে ইষ্টক চা বলে। এরূপ চা চীনে বেশী প্রস্তুত হয় এবং ইহা দ্বারা প্রধানতঃ তিব্বতের চাহিদা মিটান হয়। বাগান হইতে যে চা বিক্রয়ের জন্য আসে সে চা ঐ অবস্থাতে খুব কমই বিক্রয় হইয়া থাকে। দার্জিলিংএর চা গন্ধের দিক দিয়া সর্বোৎকৃষ্ট। আসামের চায়ে 'লিকার' ভাল হয়। যিনি চায়ের গন্ধ বেশী পছন্দ করেন তিনি দার্জিলিংএর চা কিনিয়া থাকেন। যিনি

চায়ের লিকার বেশী পছন্দ করেন তিনি আসামের চা কিনিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এভাবে খুব কম চাই ক্রয়-বিক্রয় হয়। বিভিন্ন বাগানের চা ব্যবসায়িগণ ক্রয় করিয়া থাকে এবং স্বাদে-গন্ধে উহা যাহাতে লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারে তজ্জন্য বিভিন্ন বাগানের চা উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রণ (Blend) করিয়া বাজারে ছাড়া হয়। এই মিশ্রণের কাজ অত্যন্ত কঠিন। ইহার উপরই চায়ের গুণাগুণ নির্ভর করে। সুতরাং ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি (Expert) দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। এরূপভাবে চা মিশ্রণে নিপুণতা লাভের জন্য লিপটন, ব্রুকবণ্ড প্রভৃতি চা ব্যবসায়ী বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

চায়ের ব্যবহার প্রধানতঃ পানীয়রূপে। ইহা মৃদু উত্তেজকের কাজ করিয়া থাকে। ইহার বীজ হইতে সাবান প্রস্তুতের তৈলও পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া চা হইতে ক্যাফিন (caffeine) নামক একপ্রকার ক্ষারদ্রব্যও প্রস্তুত হইতে পারে।

Q. 32 What are the climatic conditions which favour the growth of coffee? Mention the different countries from which they are principally exported (C U Inter, 1949)

(কফি উৎপাদনের জন্য কিরূপ জলবায়ু প্রয়োজন ? প্রধানতঃ যে সমস্ত দেশ কফি রপ্তানি করে তাহাদের নাম উল্লেখ কর।)

Ans. কফি উৎপাদনের জন্য নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি প্রযোজন :

(১) কফি ক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল। এজন্য ইহা উৎপাদনের জন্য প্রচুর উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। উত্তাপের পরিমাণ গড়ে ৭০ ফাঃ এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬০′—১০০′ হইলে ভাল হয়।

(২) বৃষ্টিপাত সারাবৎসর নিয়মিত হইলে ভাল হয। গাছের বৃদ্ধির ও উহার ফল ধরিবার সময় বৃষ্টিপাত অত্যাবশ্যক। বৃষ্টিপাত কম হইলে যেমন আরবে, জলসেচ করিতে হয।

(৩) কফি গাছ তুষারপাত সহ্য করিতে পারে না। এজন্য নিম্ন অক্ষাংশেই ইহার চাষ বেশী হয়। ক্রান্তীয় অঞ্চলের বাহিরে সমভূমিতে ইহার চাষ কিছু কিছু হইতে পারে। তবে বিষুবরেখা হইতে কফি উৎপাদন স্থান যত দূরে হইবে সমুদ্র সমতল হইতে উহার উচ্চতাও তত কম হওয়া উচিত। উষ্ণমণ্ডলে উচ্চস্থানেই কফির আবাদ বেশী। ইহার আবাদ সাধারণতঃ ২৮ উত্তর অক্ষাংশ হইতে ৩৮ দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

(৪) গাছের শৈশব অবস্থায় ইহাকে প্রখর সূর্যোত্তাপ হইতে বাঁচাইতে হয়। এজন্য কফিক্ষেতে কলাগাছ বা ভুট্টার চাষ দেখিতে পাওয়া যায়।

(৫) উপরোক্ত জলবায়ু ভিন্ন কফি উৎপাদনের জন্য লৌহমিশ্রিত উর্বর মাটি প্রয়োজন। কফিক্ষেতে সুন্দর জল নিকাশের ব্যবস্থা চাই। এজন্য পর্বতগাত্র ও ঢালু উচ্চভূমি কফি চাষের উপযুক্ত।

(৬) ইহা ছাড়া কফির চাষ, ফসল তোলা উহা শুকান ও বাজারে প্রেরণের জন্য প্রচুর সুলভ শ্রমিকও প্রয়োজন।

কফি রপ্তানি কফি উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। যে দেশ বেশী কফি উৎপাদন করে সেই দেশ বেশী কফি রপ্তানি করে।

পৃথিবীর কফি উৎপাদন নিম্নরূপ :

দক্ষিণ আমেরিকার—ব্রেজিল (সাওপালো বিশেষ প্রসিদ্ধ), গিয়ানা, ভেনিজুয়েলা, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর ও বলিভিয়া। ইহার মধ্যে ব্রেজিল কফি উৎপাদনে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মধ্য আমেরিকার—গোয়াতেমালা, সালভেডর, হণ্ডুরাস ও কোষ্টারিকা।

উত্তর আমেরিকার—মেক্সিকো।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের—জ্যামাইকা, হাইতি ও ডোমিনিয়ান রিপাবলিক উল্লেখযোগ্য।

এশিয়া মহাদেশের আরব (ইয়েমেন), ভারত (মাদ্রাজ, মহীশূর, কেরালা), সিংহল এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সুমাত্রা, জাভা ও বোর্ণিও উল্লেখযোগ্য।

আফ্রিকার কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঙ্গানিকা, ফরাসী, পশ্চিম আফ্রিকা, ঘানা, অ্যাঙ্গোলা, লাইবেরিয়া, কঙ্গো ও ইথিওপিয়া।

১৯৬১—৬২ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কফি উৎপাদন নিম্নরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

মোট উৎপাদন ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন।

ব্রেজিল	২১.৮০ লক্ষ টন	সান্‌সালভেডর	১.৯৬ লক্ষ টন
কলম্বিয়া	৪.৬৮ " "	গোয়াতেমালা	১.৯৪ " "
আইভরি কোষ্ট	১.৭৪ " "	অ্যাঙ্গোলা	১.৪৭ " "
মেক্সিকো	১.৫০ " "	উগাণ্ডা	১.৩১ " "
ইন্দোনেশিয়া	.৯২ হাজার টন	ইথিওপিয়া (১৯৫৯)	৪৮ হাজার টন

ভারত ৬৭ হাজার টন

উপরিউক্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে ব্রেজিলই কফি উৎপাদনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহা মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বেশী উৎপন্ন করে। উৎকর্ষের দিক দিয়া জ্যামাইকা, ভারত, ইন্দোনেশিয়ার কফি এবং আরবের মোচা (Mocha) কফি বিশেষ প্রসিদ্ধ। আরবের কফি প্রধানতঃ মোচা বন্দর দিয়া রপ্তানি হয় বলিয়া উহার ঐরূপ নাম হইয়াছে।

মোট উৎপাদনের শতকরা ৮৮ ভাগ কফি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। প্রধান প্রধান রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে ব্রেজিল (৫০ ভাগ), কলম্বিয়া (২০ ভাগ), ইন্দোনেশিয়া, মধ্য আমেরিকার দেশগুলি, মেক্সিকো, আফ্রিকার দেশগুলি (২০ ভাগ), ভারত, আরব ও দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশ উল্লেখযোগ্য।



পৃথিবীর কফি উৎপাদন স্থান

প্রধান প্রধান আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে বৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড বেলজিয়াম, ইটালি, সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রেই সর্বাধিক কফি আমদানি হয় এবং মোট কফি রপ্তানির ৬০ ভাগ গ্রহণ করে। ইহার পর ফ্রান্স ৭ ভাগ ও জার্মানী ৬ ভাগ গ্রহণ করে। হল্যাণ্ডও একটি বিশিষ্ট আমদানিকারক দেশ। এখানে কফি খুব জনপ্রিয় এবং মাথা পিছু বৎসরে ১১ পাউণ্ড কফি আমদানি হয়। হল্যাণ্ডের উপনিবেশগুলিতে বেশী কফি উৎপন্ন হওয়াই ইহার বিশেষ কারণ।

Q. 33. What factors influence the cultivation of tea in North East India and coffee in the Mysore plateau? Indicate the position of India in the world trade in tea (C. U Inter 1960)

(কি কি কারণ ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশে চা ও মহীশূরের মাল-ভূমিতে কফি উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে? চায়ের বিশ্ব-বাণিজ্যে ভারতের অবস্থা নির্ণয় কর।) Or,

How do you explain the following? (a) Tea is grown in the Himalaya foot hills of North Bengal and Assam, (c) Coffee is grown in the Nilgiri Hills (pre-C U. 1962)

[(ক) উত্তরবঙ্গের ও আসামের হিমালয়ের পাদদেশে চায়ের এবং (খ) নীলগিরি পর্বতে কফি উৎপাদনের কারণ কিভাবে ব্যাখ্যা করিবে?]

Ans ভারতের দুই অংশে প্রধানতঃ চা উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহা হইতেছে (১) উত্তর-পূর্ব অংশ এবং (২) দক্ষিণাংশ। উত্তর-পূর্ব অংশের মধ্যে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা। আসামের সদিয়া সীমান্ত অঞ্চল, কাছাড়, শিবসাগর, লখিমপুর, ডিব্রুগড, দারাং এবং পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চল ও দার্জিলিংএ ব্যাপকভাবে চা আবাদ হইয়া থাকে। আসাম মোট উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া পাঞ্জাবের কাংড়া উপত্যকায়, উত্তর প্রদেশের আলমোড়া, গাড়োয়াল, দেরাদুন ও কুমায়ুন জেলায় ও বিহারের হাজারিবাগ, রাঁচি, পূর্ণিয়া ও ছোটনাগপুর জেলায় কিছু চা উৎপন্ন হইয়া থাকে। উত্তর ভারতে মোট উৎপাদনের ৮০ ভাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজের নীলগিরি, কেরালা, মহীশূর ও মহারাষ্ট্রের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উচ্চাংশে চা উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপরিউক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে উত্তর-পূর্ব অংশই ভারতে চা উৎপাদনে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহার মূলে নিম্নলিখিত কারণগুলি প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে।

(১) উত্তর-পূর্ব ভারতের অনেক স্থানই পার্বত্য। এ সমস্ত পর্বতের ঢাল জল নিকাশের সুবিধাযুক্ত এবং ভূমি ভাগও খুব উর্বর। এজন্য ইহা চা আবাদের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

(২) এ অঞ্চলের জলবায়ু ক্রান্তীয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ুর কৃপায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এরূপ জলবায়ু চা আবাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

(৩) এ অঞ্চলে স্থানীয় সুলভ শ্রমিকের অভাব নাই। তা'ছাড়া বিহার, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল হইতেও অনেক শ্রমিক এখানে কাজের উদ্দেশ্যে আসিয়া থাকে। সুলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য্যও এ অঞ্চলে চায়ের আবাদ বৃদ্ধির পক্ষে একটি বড় আকর্ষণ।

(৪) জলপথে ও রেলপথে কলিকাতা বন্দর ও অন্যান্য স্থানের সহিত ইহা যুক্ত।

(৫) গোড়ার দিকে বৃটিশের মূলধন ও কর্মপ্রচেষ্টাও এখানে চা চাষ বৃদ্ধির খুব অনুকূল হইয়াছিল।

এ অঞ্চলের চা আবাদকে অন্য কোন ফসলের আবাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয় নাই। যে সমস্ত অঞ্চলে চা আবাদ বৃদ্ধি পাইয়াছে উহার অধিকাংশ বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। অন্য কোন ফসল এখানে ভাল উৎপন্ন হইত না। অন্য ফসলের তুলনায় চা আবাদে এখানকার ভূমিক্ষয়ও বেশী হয় না।

উপরিউক্ত কারণগুলির জন্য এই অঞ্চলেই চা চাষ সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দক্ষিণ ভারত আবার কফি আবাদে বিশেষ প্রসিদ্ধ। উত্তর ভারতে কফির চাষ বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। দক্ষিণ ভারতের মহীশূরে শতকরা ৬০ ভাগ, মাদ্রাজে ২৫ ভাগ, কেরালায় ১০ ভাগ ও বোম্বাইয়ের সাতারা জেলায় বাকী অংশ কফি উৎপন্ন হইয়া থাকে। দক্ষিণ-ভারতের মোট ৭০০০ কফি বাগানের মধ্যে ৪৬০০টি বাগানই মহীশূরে অবস্থিত। সুতরাং এক্ষণে মহীশূরই যে কফি আবাদে সমধিক প্রসিদ্ধ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিম্নলিখিত কারণগুলি ইহার কফি আবাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে।

(১) মহীশূর ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে উত্তাপের পরিমাণ ৬০°—৮০°-ফা। বৃষ্টিপাত ৬০"—৮০" ইঞ্চি। এরূপ আবহাওয়া কফি চাষের অনুকূল।

২) এখানকার জৈবপদার্থযুক্ত লৌহমিশ্রিত লাল মাটি কফি চাষের পক্ষে খুব উপযোগী।

(৩) এখানে সুলভ শ্রমিকের অভাব নাই।

(৪) এখানে কফি গাছকে সূর্য্যকিরণ ও প্রবল ব্যাত্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য কলাগাছ রোপণ করারও সুবিধা আছে।

(৫) এখানকার কফি বাগানের শতকরা ৭০ ভাগের মালিক ভারতীয়। মহীশূর সরকারেরর আনুকূল্য ও সাহায্যও কফি আবাদের পক্ষে সহায়ক হইয়াছে।

(৬) দক্ষিণ ভারতে চা অপেক্ষা কফির আদর বেশী। এ কারণেও এখানে কফির আবাদ বৃদ্ধি পাইয়াছে।



(৭) উচ্চ অক্ষাংশে তুষার পাতের ভয় আছে। উহা কফিগাছ মোটেই সহ্য করিতে পারে না। এজন্য চা চাষ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে কিন্তু কফি চাষ কেবল দক্ষিণ ভারতেই সীমাবদ্ধ আছে।

(৮) ইহা ছাড়া বিষুব রেখার নিকটবর্তী অঞ্চলে কফি চাষের উপযুক্ত উদ্ভিদ-যুক্ত সারবান জমিও বেশী পাওয়া যায়। এজন্যও উত্তর ভারতে কফির গাছ

বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই। কারণ দক্ষিণ ভারত উত্তর-ভারত অপেক্ষা বিষুবরেখার নিকটবর্তী।

Q. 34. Discuss the geographic bases and other conditions that are responsible for the location and development of any one of the following industries : (i) Tea Industry in Ceylon and (ii) Coffee Industry of Brazil. (C. U. Inter, 1959)

(ভৌগোলিক ও অন্যান্য যে কারণবশতঃ (ক) সিংহলের চা শিল্প ও (খ) ব্রেজিলের কফি শিল্পের পত্তন ও উন্নতি সম্ভব হইয়াছে তাহা আলোচনা কর)।

Ans. ১। সিংহলের চা শিল্প পত্তন ও উন্নতির মূলে নিম্নলিখিত ভৌগোলিক ও অন্যান্য কারণগুলি বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায় :

(ক) সিংহল চা চাষের উপযুক্ত ক্রান্তীয় জলবায়ু অধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থিত। এখানকার উত্তাপ ও সারা বৎসরব্যাপী বৃষ্টিপাত চায়ের ফলন বৃদ্ধির সহায়ক। এ অবস্থা এখানে চা চাষের প্রেরণা দিয়াছে।

(খ) এখানকার মধ্যাংশ পর্বত ও মালভূমি সমাচ্ছন্ন। এই ভূমি একাধারে চা চাষের উপযোগী উর্বরতা সম্পন্ন এবং অন্য দিকে জল নিকাশের উপযুক্ত।

(গ) দক্ষিণ ভারত হইতে সুলভ তামিল শ্রমিকও ইহার চা চাষের প্রেরণা যোগাইয়াছে। বর্তমানে অবশ্য স্থানীয় শ্রমিকও প্রচুর। ইহাতে উভয় শ্রমিকের মধ্যে রেষারেষির সৃষ্টি হইয়াছে এবং তামিল শ্রমিকদের অবস্থানে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে।

(ঘ) ইহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথের উপর অবস্থিত। এজন্য বিদেশের বাজারে কম ব্যয়ে চা পাঠাইতে পারে। কলম্বো ইহার প্রধান চা রপ্তানি বন্দর। চা উৎপাদক অঞ্চলের সহিত ইহা রেলপথে যুক্ত। আবার উহা সমুদ্রপথের প্রধান বন্দর।

(ঙ) এদেশে অন্যান্য শিল্প প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। ধান ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় কম। সুতরাং বৈদেশিক মুদ্রা আহরণে ইহাই প্রধান অর্থকরী ফসল।

উপরিউক্ত কারণগুলি সিংহলে চা শিল্পের উন্নতির সহায়ক হইয়াছে।

২। সাওপালো, রিওডিজেনেরো, মিনাস গিরেস প্রভৃতি অঞ্চল ইহার কফি আবাদের জন্য প্রসিদ্ধ। মোট কফি উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগের বেশী

ব্রেজিলে উৎপন্ন হইতেছে। কফির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও ইহার স্থান উল্লেখযোগ্য। ইহা উক্ত বাণিজ্যের শতকরা ৮০ ভাগ যোগান দিয়া থাকে। উপরিউক্ত উন্নতির মূলে নিম্নলিখিত কারণগুলি প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

(ক) ইহার জলবায়ু কফি চাষের উপযুক্ত। কারণ ইহা ক্রান্তীয় জলবায়ু অধ্যুষিত অঞ্চল। আটলান্টিক মহাসাগর হইতে আগত জলীয় বাষ্প ইহাকে কফি চাষের উপযুক্ত পরিমাণ বারিপাত দিয়া থাকে।

(খ) উদ্ভিদ্‌যুক্ত লাভাগঠিত লালমাটি দ্বারা এই অঞ্চল গঠিত। ইহা কফি চাষের উপযুক্ত মাটি।

(গ) ইটালি, নেপাল ও জাপান হইতে আগত কর্মঠ ও দক্ষ শ্রমিক এখানকার কফি আবাদে নিযুক্ত আছে।

(ঘ) ক্রান্তীয় জলবায়ু কফিকে ছায়া প্রদানকারী কলা বা অন্যান্য গাছের চাষের উপযুক্ত।

(ঙ) ইহা ব্রেজিলের প্রধান অর্থকরী ফসল। সুতরাং ইহার উন্নতিতে ব্রেজিলের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে।

(চ) ব্রেজিলের সরকার বাহাদুরও কফি চাষের উন্নতির জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহানুভূতি দেখাইয়া থাকে। এই সরকার বাজার মন্দা দেখা দিলে এবং বেশী উৎপাদন হইলে উদ্বৃত্ত ফসল কিনিয়া থাকে এবং বাজারের অবস্থার উন্নতি দেখা দিলে বিক্রয় করিয়া থাকে। এই ব্যবস্থাকে Valorisation বলা হয়।

ছ ইহার কফি বন্দরগুলিও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথের উপর অবস্থিত এবং যুক্তরাষ্ট্র ইহার প্রধান খরিদ্দার।

উপরিউক্ত অবস্থাগুলি ব্রেজিলের কফি শিল্পের উন্নতিতে পরম সহায়ক হইয়াছে।

Q. 35. Compare and contrast the cultivation, production and marketing of tea and coffee

(চা ও কফির আবাদ, উৎপাদন ও বিক্রয় সম্বন্ধে তুলনামূলক বিচার কর)।

Ans —চা ও কফির মধ্যে নিম্নলিখিত সাদৃশ্য গুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) উভয়ই মৃদু উত্তেজক পানীয়।

(২) উভয়ই প্রায় এক প্রকার মাটি ও জলবায়ুতে উৎপন্ন হয়।

(৩) উভয়ের জন্য সুলভ ও দক্ষ শ্রমিকও প্রয়োজন। কিন্তু নিম্নলিখিত পার্থক্য গুলিও ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়:

চা	কফি
১। ইহা ক্রান্তীয়, উপক্রান্তীয় এমন কি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেও জন্মিতে পারে।	১। ইহা কেবলমাত্র ক্রান্তীয় অঞ্চলেই জন্মিয়া থাকে।
২। ব্যবহারযোগ্য চা প্রস্তুত হয় পাতা ও কুঁড়ি হইতে।	২। ব্যবহারযোগ্য কফি প্রস্তুত হয় বীজ হইতে।
৩। তুষার সহ্য করিতে পারে।	৩। তুষার সহ্য করিতে পারে না।
৪। গাছের শৈশব অবস্থায় সেরূপ ছায়ার প্রয়োজন হয় না।	৪। গাছের শৈশব অবস্থায় সূর্য্যকিরণ ও প্রবল ঝ্যার্তা হইতে রক্ষা করা অত্যাবশ্যক।
৫। ইংরেজদের প্রিয় পানীয়।	৫। ওলন্দাজ ও আমেরিকানদের প্রিয় পানীয়।

Q 36 Discuss the geographical conditions under which the following agricultural crops are produced.

(a) Paddy in China and Italy

(b) Cotton in Egypt and U. S. A.

Describe their methods of cultivation. (C U. Inter 1959)

(ভৌগোলিক কোন অবস্থাতে নিম্নলিখিত কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয় আলোচনা কর:

(ক) চীন ও ইটালিতে ধান।

(খ) মিশর ও যুক্তরাষ্ট্রে কার্পাস।

উহাদের চাষের পদ্ধতি বর্ণনা কর।)

Ans — ১) চীন পৃথিবীর মধ্যে ধান উৎপাদনে প্রথম। এখানে ধান অনেক স্থানেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বেশী চাষ আবাদ হইয়া থাকে। ইয়াংসিকিয়াং ও সিকিয়াং নদীর অববাহিকাই এ বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে সমস্ত ভৌগোলিক অবস্থা ইহার জন্য দায়ী তাহার মধ্যে ইহার প্রচুর উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতযুক্ত মৌসুমী বায়ু ও নদী উপত্যকার উর্বর মৃত্তিকা প্রধান। ইহা ছাড়া জমিতে সার প্রয়োজন ও প্রচুর সুলভ শ্রমিকের

প্রাচুর্য্য এ বিষয়ে কার্য্যকরী। দেশটি ঘনবসতিপূর্ণ বলিয়া দেশের অভ্যন্তরে ইহার চাহিদাও প্রচুর। এজন্য পৃথিবীর মধ্যে উৎপাদক হিসাবে প্রথম স্থান অধিকার করা সত্বেও রপ্তানির পরিমাণ নগণ্য। ইহার কৃষি পদ্ধতি সযত্ন ও আদ্র এবং স্বল্প বৃষ্টিযুক্ত স্থানে সেচ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) ইটালিতে উহার পো নদীর অববাহিকায় লোম্বাডির সমভূমিতে ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইউরোপের মধ্যে ধান উৎপাদনে ইটালিই প্রথম স্থান অধিকার করে। ভৌগোলিক অবস্থার মধ্যে এখানে লোম্বার্ডির সমভূমি ধান উৎপাদনের উপযোগী উর্বর মাটিযুক্ত। কিন্তু এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব বেশী নহে। জলবায়ুও অনেকটা মহাদেশীয়, এজন্য মাঠে প্রয়োজন মত জলসেচ প্রথা প্রচলিত।

(৩) মিশর কার্পাস উৎপাদনে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানে দীর্ঘ আঁশযুক্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কার্পাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। মিশরের সমৃদ্ধি তুলা রপ্তানির উপর নির্ভরশীল।

ভৌগোলিক অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে মিশর মরুভূমি সদৃশ। ইহার মাটি উর্বর কিন্তু জলাভাব। এই জলের অভাব নীলনদ হইতে পূরণ হয় এবং এখানে ভাল জলসেচের ব্যবস্থা আছে। নীলনদের পলি ও জলসেচ ব্যবস্থার ফলেই এখানে কার্পাস চাষ এতটা উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে। এখানে শ্রমিক সুলভ। ছোট ছোট ভূমিখণ্ডে সযত্ন কৃষি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

(৪) পৃথিবীর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রই কার্পাস উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহা নিজ প্রয়োজন মিটাইয়া বিদেশেও রপ্তানি করিতে পারে। ইহার দক্ষিণ পূর্ব দিকেই কার্পাসের আবাদ বেশী। ভৌগোলিক অবস্থার মধ্যে এখানে ৭ মাসের উপরে কার্পাস চাষের উপযোগী তুষারমুক্ত উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু বর্তমান। ইহার উর্বর কাল প্রেইরি মৃত্তিকা কার্পাস চাষের উপযুক্ত। এখানকার কৃষি পদ্ধতিতে যন্ত্রাদি অনেক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Q. 37. State the conditions of growth, areas of production, nature of uses and world trade in hemp

(শণের উৎপাদন অবস্থা, উৎপাদন স্থান, ব্যবহার ও বাণিজ্য বর্ণনা কর)।

Ans : শণ উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ উভয় মণ্ডলেই জন্মিয়া থাকে। তবে ইহার উৎপাদনের উপযুক্ত স্থান নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল। ৫০°—৬০° ফা. উত্তাপ এবং ৩০"—

৪০" বৃষ্টিপাত ইহা উৎপাদনের পক্ষে ভাল। আর্দ্রতা সংরক্ষণকারী দোয়াঁশ মাটি ইহা চাষের জন্য আবশ্যক।

রাশিয়া, ইটালি, চীন, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাশিয়াতেই ইহার উৎপাদন সবচেয়ে বেশী। মোট উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ। কিন্তু ইহা প্রতি একরে উৎপাদনের পরিমাণ কম মাত্র ৩০০ পাউণ্ড। ইহা উৎপাদনে ইটালির স্থান দ্বিতীয় এবং এখানে প্রতি একরে উৎপাদনের পরিমাণ ১০০০ পাউণ্ড—পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক। পৃথিবীতে ইহার মোট উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১০ লক্ষ টন।

শণ বিভিন্ন জাতীয়। এই গাছগুলির ছাল, ডাঁটা, বীজ, পাতা, ফুল, আঠা সবই কাজে লাগে। ইহার ছাল হইতে যে আঁশ পাওয়া যায় তাহা দ্বারা দড়ি, সুতা, বস্তা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। শণ পাট অপেক্ষা শক্ত। ইহা ছাড়া পাটের দড়ি জলে শীঘ্র পচিয়া যায়। কিন্তু শণের দড়ি অত শীঘ্র নষ্ট হয় না। ইহার ডাঁটা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহার বীজ হইতে যে তৈল পাওয়া যায় তাহা দিয়া রং, পালিশ ও সাবান প্রস্তুত হয়। ইহার খৈইল পশুর পুষ্টিকর খাদ্য। ইহার পাতা ও মুকুল হইতে মাদকদ্রব্য ভাঙ্গ প্রস্তুত হয়। ইহার ডালপালার আঠাল জিনিস চরস নামে পরিচিত।

শণের বিভিন্ন জাত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। ফিলিপাইন, কোষ্টারিকা, গোয়াতেমালা, পানামা ও উত্তর বর্ণিওতে যে একপ্রকার শণ উৎপন্ন তাহা ম্যাণিলা শণ (Manila Hemp) নামে পরিচিত। ইহা য়্যাবাকা (Abaca) নামে কলা গাছের মত একপ্রকার গাছের ছাল। ইহা হইতে দড়ি ও সুতা তৈয়ারী হয়।

মক্সিকো, ট্যাঙ্গানিকা কেনিয়া, এঙ্গোলা, মাদাগাস্কার, ইন্দোনেশিয়া, ভেনিজুয়েলা, কিউবা ও হাইতি প্রভৃতি দেশে হেনেকুয়েন (Hen-e Quen) নামক গাছের পাতা হইতে যে শণ পাওয়া যায় তাহাকে শিশল শণ (Sisal hemp) বলে। ইহার দ্বারাও দড়ি, থলে, গালিচা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। নিউজিল্যাণ্ডে যে এক প্রকার শণ পাওয়া যায় তাহার নাম ফরমিয়াম (Phormium)।

ভারতও বর্তমান শণ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য। মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শণ রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে রাশিয়া, ইটালি, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া ভারত, ফিলিপাইন (ম্যানিলা শন), এবং মেক্সিকো, পূর্ব আফ্রিকা ও ব্রেজিল

(শিশল শণ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে ব্রিটেন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স উল্লেখযোগ্য।

Q. 30. What is Seri-culture? Describe the geographical and other circumstances favouring the growth, manufacture, world distribution and trade in Silk

(রেশম চাষ কি ? রেশম চাষের ভৌগোলিক ও অন্যান্য অবস্থা, উহার শিল্প, উৎপাদন স্থান ও বাণিজ্য সম্বন্ধে বর্ণনা দাও)।

রেশম একপ্রকার গুটিপোকা হইতে উৎপন্ন হয়। কতকগুলি গাছের পাতা এই গুটি পোকার প্রিয় খাদ্য। এই গাছগুলির মধ্যে আবার তুঁত গাছ (Mulberry trees) প্রধান। সুতরাং যেখানে তুঁত গাছের প্রাধান্য সেখানে রেশম কীটের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গাছের পাতায় রেশম কীট ডিম পাড়ে। ডিম হইতে যে কীট বাহির হয় উহারা এই গাছের পাতা খাইয়া পরিপুষ্ট হয়। সেই সময়ে ইহারা নিজেদের গাত্র হইতে একপ্রকার আঠা বাহির করিয়া নিজেদের দেহের বাহিরে আবরণের সৃষ্টি করিয়া উহার মধ্যে অবস্থান করে। এই আঠা জাতীয় আবরণ হইতেই রেশমের সূতা পাওয়া যায়। উক্ত আবরণকে গুঁটি (Cocoon) বলে। রেশম কীট পরে ঐ গুঁটি কাটিয়া উড়িয়া বাহির হয়। গুঁটি হইতে পোকা বাহির হইলে প্রজাপতি হয়। ঐ কীট গুঁটি কাটিয়া প্রজাপতি হওয়ার পূর্বে উহাকে গরমজলে সিদ্ধ করিয়া উক্ত গুঁটি হইতে রেশম সূতা বাহির করা হয়। তুঁত গাছের পাতা খাওয়াইয়া রেশমকীট প্রতিপালন করা এবং গুঁটি হইতে রেশম সূতা প্রস্তুত করাকে **রেশম চাষ** (Seri-culture) বলে।

রেশম চাষের জন্য নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি প্রয়োজন :

১। তুঁতগাছ উৎপাদনের উপযোগী জলবায়ু। উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তুঁতগাছ জন্মিয়া থাকে। সাধারণতঃ ৪০ উত্তর বা দক্ষিণ অক্ষাংশের বাহিরে তুঁতগাছ কমই জন্মিয়া থাকে। জাপানের পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে অন্যান্য শস্যের চাষ আবাদ হয় না সেখানে প্রচুর তুঁতগাছ জন্মিয়া থাকে। জলবায়ুর উষ্ণতা ৬০ ফাঃ এর কম হইলে তুঁতগাছ ভাল জন্মে না। আবার অতিরিক্ত শুষ্ক এবং অধিক আর্দ্র জলবায়ুতেও তুঁতগাছ জন্মে না এবং রেশম কীটও বাঁচে না।

২। নদী উপত্যকার উর্বর দোয়াঁশ মাটিই তুঁতগাছের চাষের উপযুক্ত স্থান।

৩। রেশম কীটকে তুঁতগাছের পাতা খাওয়ান, গুটি হইতে সূতা ছাড়ান প্রভৃতির জন্য প্রচুর দক্ষ সুলভ শ্রমিক প্রয়োজন। প্রকৃত পক্ষে রেশম চাষ ব্যাপারে অনেক স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা কাজ করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা শ্রমমূল্য অনেকটা কম করার চেষ্টা করা হয়। এতদ্ সত্ত্বেও যে শ্রম মূল্য দিতে হয় তাহাতেই রেশম বস্ত্র অন্যান্য সূতীবস্ত্র অপেক্ষা মহার্ঘ। এজন্য শ্রম মূল্য বেশী হইলে এই শিল্প প্রসার লাভ করিতে পারে না। বর্তমানে যন্ত্রের সাহায্যে গুটি হইতে সূতা প্রস্তুত হইতেছে।

৪। বসন্ত ও শরৎকালে গুটি উৎপাদনের উপযুক্ত সময়। রেশম উৎপাদনের জন্য ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং ভারত হইতে জাপান পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

(১) জাপানে রেশম সূতা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী (৫০-৬০%) উৎপন্ন হয়। এই দেশের মোট রপ্তানি দ্রব্যের শতকরা ৪০ ভাগই রেশম সূতা। সুতরাং অর্থনৈতিক জীবনে ইহা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। জাপানে স্ত্রী ও বালক-বালিকাগণ অবসর সময়ে রেশম চাষে নিযুক্ত থাকে। এজন্য এখানে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে রেশম উৎপন্ন হইতে পারে। নাগোয়া, কোয়ানটো সমভূমি, সিওয়া নদীর মোহানা অঞ্চল ও কানাজাওয়ার সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল, বিওয়া হ্রদ অঞ্চল প্রভৃতি ইহার রেশম উৎপাদন স্থান। জাপানের উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৫ হাজার টন।

(২) চীন—ইহার ইয়াংসিকিয়াং উপত্যকা, জেকোয়ান অববাহিকা, কান্টনের নিকটবর্তী অঞ্চল ও সানটুং উপদ্বীপ রেশম উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য। জলবায়ুর অনুকূল অবস্থা ভিন্ন এখানে প্রচুর শ্রমিক সহজলভ্য। সানটুং উপদ্বীপে ওক গাছের পাতা খাওয়াইয়াও রেশম চাষ হয়। চীনের উৎপাদন প্রায় ৪ হাজার টন।

(৩) ভারত—ভারতে তুঁতগাছ ছাড়া কুল, পলাশ প্রভৃতি গাছেও রেশম কীট প্রতিপালন হয়। এজন্য এখানে খাঁটি রেশম (pure mulberry silk) ছাড়া তসর, এণ্ডি, মুগা প্রভৃতি নানাপ্রকারের রেশম উৎপন্ন হয়। ভারতে রেশম উৎপাদনের জন্য জম্মু ও কাশ্মীর, পূর্বপাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলা বিহারের ভাগলপুর, ছোটনাগপুর, মহীশূরের বাঙ্গালোর, তুমকুড় ও কোলার জেলা, মাদ্রাজের কোয়েম্বাটোর জেলা, উড়িষ্যায় বহরামপুর, আসাম, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল উল্লেখযোগ্য। ভারতের উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১২ শত টন। ইহাদের মধ্যে তসর উৎপাদনে বিহারের ভাগলপুর, পালামৌ ও ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, মুগা উৎপাদনে আসাম এবং

এণ্ডি উৎপাদনে আসাম, পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর, বিহারের পূর্ণিয়া এবং গুজরাটের বরোদা অঞ্চল প্রসিদ্ধ।

(৪) **ইটালি**—ইহার পো নদীর উপত্যকা রেশম উৎপাদনের জন্য উল্লেখযোগ্য এবং ইউরোপের মধ্যে রাশিয়ার পরেই ইহার স্থান। উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১, হাজার টন। বলোনা (Bolona), মিলান (Milan এবং লুক্কা (Lucca) ইহার বিখ্যাত রেশম কেন্দ্র।

(৫) **ফ্রান্স**—ইহার রোন্ নদীর উপত্যকা রেশম উৎপাদনের জন্য উল্লেখযোগ্য। লিয়ঁ (Lyons) এ অঞ্চলের প্রধান রেশমকেন্দ্র।

(৬) ইউরোপের অন্যান্য দেশের মধ্যে স্পেন, বুলগেরিয়া ও যুগোস্লাভিয়ায় সামান্য রেশম উৎপাদন হয়। ইদানিং রাশিয়াও রেশম উৎপাদনে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য অংশ গ্রহণ করিতেছে। ইহার উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২ হাজার টন।

(৭) পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে সিরিয়া, ইরাণ, প্যালেষ্টাইন ও তুরস্কে কিছু রেশম উৎপন্ন হয়।

(৮) দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলেও রেশম উৎপন্ন হইতেছে।

উপরিউক্ত স্থানগুলি রেশম উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য হইলেও নিম্নলিখিত দেশগুলি রেশম বস্ত্র শিল্পে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রেশম সূতা হইতে রেশম বস্ত্র প্রস্তুত হয়। রেশম চাষে (Seri-culture) রেশম সূতা প্রস্তুত করাই প্রধান কাজ। রেশম সূতা হইতে নানা প্রকার রেশম বস্ত্র (শাড়ি, ধুতি ইত্যাদি), জামার কাপড়, গায়ের চাদর, ফিতা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। চাকচিক্যের দিক দিয়া যেমন ইহা শ্রেষ্ঠ, পবিত্র বস্ত্র হিসাবেও ইহা খুব আদরণীয়। বিদ্যুৎরোধক বস্ত্র হিসাবে এবং অস্ত্র চিকিৎসাতেও রেশম ব্যবহৃত হয়। টাইপ যন্ত্রের ফিতা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেও ইহার প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে সমস্ত দেশ রেশম উৎপাদনে বিখ্যাত সে সব দেশে পৃথিবীর অর্ধেক রেশমজাত দ্রব্য ও উৎপন্ন হয় না।

রেশমজাত দ্রব্য উৎপাদনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহার পূর্ব দিকে ½ অংশ রেশম দ্রব্য উৎপন্ন হয়। নিউইয়র্ক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রেশম বাজার। কিন্তু এখানে আদৌ রেশম চাষ হয় না।

সস্তা শ্রমিকের অভাবে এখানে রেশম চাষ হইতে পারিতেছে না। চীন, জাপান, দক্ষিণ ইউরোপের দেশগুলি হইতে যুক্তরাষ্ট্র রেশম আমদানি করে। ইহা সবচেয়ে বেশী পরিমাণ আমদানি করে জাপান হইতে। জাপান রেশমের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্র হইতে তুলা আমদানি করে।

পৃথিবীর অন্যান্য রেশমদ্রব্য উৎপাদনের দেশগুলির মধ্যে জাপান, চীন, কোরিয়া, ভারত, গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালি, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মেনী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্সের লিয়ঁ এবং ইটালির মিলান শ্রেষ্ঠ রেশম বাজার।



ভারতের যে যে অঞ্চল রেশম উৎপন্ন করে সে সমস্ত অঞ্চল রেশম দ্রব্যও উৎপন্ন করে। তবে কাঁচা রেশম উৎপাদনের তুলনায় রেশম দ্রব্য অনেক কম। ভারত কাঁচা রেশম অনেকটা রপ্তানি করিয়া থাকে (প্রায় ১০ লক্ষ পাউণ্ড)। রেশম দ্রব্য উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যে অমৃতসর, জলন্ধর, বেনারস, মির্জাপুর মুর্শিদাবাদ, বাকুড়া, বিষ্ণুপুর, ভাগলপুর, আমেদাবাদ, পুণা, নাগপুর, বাঙ্গালোর, সালেম, তাঞ্জোর, বহরামপুর, শ্রীনগর প্রভৃতি। ভারত প্রতিবৎসর প্রায় ২ লক্ষ গজ রেশম দ্রব্য রপ্তানি করিয়া থাকে।

প্রধান রেশম রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে জাপান (৬০%), চীন (২০%) ইটালি (৪%), হংকং (৩%), কোরিয়া (২%), সোভিয়েট রাশিয়া (২%) উল্লেখযোগ্য।

প্রধান রেশম আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র (৫৫%), ফ্রান্স (১৩%), সুইজারল্যাণ্ড (৮%), যুক্তরাজ্য, ইটালি, জার্মানী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

Q. 39. What is Rayon? Give an idea of the development of Rayon Industry in different countries of the World. Is it seriousl competing with naturul silk?

(কৃত্রিম রেশম কাহাকে বলে? পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কৃত্রিম রেশম শিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে একটা বিবরণ দাও। ইহা কি স্বাভাবিক রেশমের সহিত তীব্র প্রতিযোগিতা করিতেছে?

Ans: কৃত্রিম রেশম (Rayon একটি রাসায়নিক পদার্থ। স্বাভাবিক রেশম রেশমকীট হইতে উৎপন্ন হয়। রেশমকীটের খাদ্যদ্রব্য তাহার দেহের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 'সেলুলোজ' (Cellulose নামক এক প্রকার জেলির মত আঠাল পদার্থ সৃষ্টি করে। রেশম কীট উক্ত 'সেলুলোজ' হইতে রেশমসূত্র প্রস্তুতের উপযোগী গুটি প্রস্তুত করে। এই গুটি হইতেই স্বাভাবিক রেশম পাওয়া যায়। মোটের উপর এই 'সেলুলোজই রেশম সূত্র প্রস্তুতের মূলাধার। উক্ত অভিজ্ঞতা হইতে এখন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 'সেলুলোজ' প্রস্তুত হইতেছে। এই সেলুলোজ' প্রস্তুতের উপাদান হইতেছে কাষ্ঠমণ্ড, তুলার ও পাটের পরিত্যক্ত অংশ বা বাঁশ এবং নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য যথা—কষ্টিক সোডা, সালফিউরিক এ্যাসিড প্রভৃতি। সুতরাং উক্ত কোনও দ্রব্যাদির সহিত রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রনে 'সেলুলোজ' প্রস্তুত করিয়া যে রেশম সূত্র তৈয়ারী হয় তাহাকে **'কৃত্রিম রেশম'** (Rayon) বলে। বর্তমানে কৃত্রিম রেশমের মত কয়লা বা খনিজ তৈলের উপজাত একপ্রকার আঠাল পদার্থ হইতে রেশমের মত নাইলন (Nylon) এবং ড্যাকরণ নামক দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে।

কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের জন্য নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি প্রয়োজন:

(ক) নরম পাট, বাঁশ, তুলা বা পাটের পরিত্যক্ত অংশের সহজ লভ্যতা।
(খ) কষ্টিক সোডা, সালফিউরিক এ্যাসিড প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যের প্রাচুর্য্য।
(গ) সুলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য্য।
(ঘ) ক্লোরাইড বর্জিত পর্য্যাপ্ত জল সরবরাহ।
(ঙ শক্তির প্রাচুর্য্য।
(চ) বয়ন শিল্পের উন্নতির অন্যান্য অবস্থা।

উপরিউক্ত অবস্থা যে অঞ্চলে অধিকমাত্রায় বিদ্যমান তথায় এই শিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করিতেছে।

১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সে সর্বপ্রথম এই কৃত্রিম রেশম সূত্র আবিষ্কৃত হয়। উহার পর হইতে ইহার উৎপাদন দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে কৃত্রিম রেশমের

উৎপাদন স্বাভাবিক রেশমের প্রায় দশগুণ। নিম্নলিখিত **দেশগুলি** কৃত্রিম রেশম **উৎপাদনে** বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) **আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র**—টেনেসি, ভার্জিনিয়া ও পেনসিলভেনিয়া ইহার শ্রেষ্ঠ উৎপাদন স্থল। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণভাগ তুলা অঞ্চল। এজন্য এখানে তুলার পরিত্যক্তঅংশের অভাব নাই। ইহার উত্তর-পূর্ব অংশ কানাডার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ হইতে নরম কাঠও প্রচুর পাইয়া থাকে। রাসায়নিক শিল্পেও এদেশ উন্নত। স্বাভাবিক কাঁচা রেশম উৎপাদনে এদেশ অনগ্রসর। শিল্পের অন্যান্য অবস্থা বর্তমান থাকায় এদেশ কৃত্রিম রেশম শিল্পে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। ইহার বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৫০০ মিলিয়ন বর্গমিটার।

(২) **জাপান**—ইদানিং জাপান এই শিল্পে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং বর্তমানে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। কৃত্রিম রেশমের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে স্বাভাবিক রেশম ও কার্পাস বস্ত্র উৎপাদনও কিছুটা কমিয়া গিয়াছে। কার্পাস বস্ত্র উৎপাদনের তুলনায় কৃত্রিম রেশমের উৎপাদনের সুযোগ সুবিধা বেশী। কার্পাসের ন্যায় কৃত্রিম রেশমের কাঁচামালের জন্য বিদেশের উপর ইহাকে নির্ভর করিতে হয় না। ইহা ছাড়া সুলভ ও অভিজ্ঞ শ্রমিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেশেই বর্তমান। প্রতি বৎসর ইহা প্রায় ১৭০০ মিলিয়ন বর্গমিটার কৃত্রিম রেশম উৎপাদন করে। জাপানের হনসু দ্বীপেই কৃত্রিম রেশম শিল্প সমধিক প্রসিদ্ধ।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মধ্যে কৃত্রিম রেশম উৎপাদনে নিম্নলিখিত দেশগুলির নাম করা যাইতে পারে:

গ্রেটব্রিটেন—	৫৫০	মিলিয়ন বর্গমিটার
ভারত—	২৩০	,, ,,
পূর্বজার্মানী—	৫০	,, ,,
দক্ষিণ কোরিয়া—	৭০	,, ,,
ফ্রান্স—	২৫	,, ,,
ইটালি—	৩০	,, ,,
ভেনিজুয়েলা	২০	,, ,,

ভারতে ১৯৫০ সাল হইতে কৃত্রিম রেশম শিল্পের অগ্রগতি দেখা যাইতেছে। ভারতে কেরালায় (আলওয়া), বোম্বাই, অন্ধ্র ও মধ্যপ্রদেশে ইহা উৎপন্ন হইতেছে। বর্তমানে কাষ্ঠমণ্ড, কষ্টিক সোডা, গন্ধক প্রভৃতির উৎপাদন দেশে আরম্ভ হইলেও বিদেশের উপর উহাদের জন্য অনেকটা নির্ভর করিতে হয়। বর্তমানে উৎপাদনের

পরিমাণ প্রায় ২ কোটি পাউণ্ড। ইহার কিছুটা বিদেশেও রপ্তানি হয়। রপ্তানির পরিমাণও ২৫ লক্ষ গজের উর্ধ্বে।

কৃত্রিম রেশমের ব্যবহার দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার দ্বারা শাড়ি, গেঞ্জি, মোজা ও নানাপ্রকার জামা-কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া ইহা প্যারাস্যুট নির্মাণেও ব্যবহৃত হয়। কখনও কখনও অন্য সূতার সহিতও ইহা মিশ্রিত হয়। ইহার রং স্বাভাবিক রেশমের মত উজ্জ্বল এবং উহার তুলনায় দামে সস্তা। কিন্তু ইহা স্বাভাবিক রেশমের মত কোমল, মসৃন, সূক্ষ্ম, শক্ত ও স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট নহে। স্বাভাবিক রেশমের তুলনায় ইহার সুলভতার জন্যই ইহা সবিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। পূর্বে ইহার ব্যবহার মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে ইহার ব্যবহার ধনী ব্যক্তিদের মধ্যেও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এজন্য কৃত্রিম রেশম স্বাভাবিক রেশমের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমানে কৃত্রিম রেশমের উৎপাদন চাহিদার তুলনায় এখনও কম আছে। এজন্য স্বাভাবিক রেশমের চাহিদা কমিলেও ইহা বাজারে যথেষ্ট বিক্রীত হইতেছে। তবে ভবিষ্যতে কৃত্রিম রেশমের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক রেশমের চাহিদা আরও কমিতে বাধ্য। তখন স্বাভাবিক রেশমের ব্যবহার বিশেষ ধনী ব্যক্তিদের মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ থাকিবে বলিয়া নিঃসন্দেহে অনুমান করা চলে।

Q. 40. Describe the uses of different kinds of oilseeds. Name the countries producing oilseeds, and give an account of the nature of trade in them. (H. S. 1962)

(বিভিন্নপ্রকার তৈলবীজের ব্যবহার বর্ণনা কর। যে যে দেশে তৈলবীজ উৎপন্ন হয় তাহাদের নাম কর এবং উহাদের ব্যবসায়ের প্রকৃতির বিবরণ দাও।)

Ans. নিম্নে বিভিন্নপ্রকার তৈলবীজের (oilseeds) সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :

(১) **তিসি বা মসিনা** (Linseed) : মসিনা তিসি (Flax) গাছের বীজ। এই বীজ হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয় উহা সহজেই শুকাইয়া যায়। এই তৈল রং, বার্ণিশ, ছাপার কালি, তেলা কাপড় (oil cloth), লাইনোলিয়াম, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার খইল উৎকৃষ্ট সার ও পশুর পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য। তিসি গাছের আঁস হইতে পাটের মত সূতা পাওয়া যায় এবং উক্ত সূতা লিনেন (linen) কাপড়, ক্যানভাস, দড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

নাতিশীতোষ্ণ ও উষ্ণমণ্ডলে ৬০°—৮০° ফা উত্তাপ বিশিষ্ট স্থানে মধ্যম রকমের বৃষ্টিপাত (১৫"—৩০") যুক্ত অবস্থায় ইহার চাষ হয়। তবে প্রধানতঃ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে সূতার জন্য এবং উষ্ণমণ্ডলে বীজের জন্যই ইহার চাষ হইয়া থাকে। রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, চীন, কানাডা, ভারত প্রভৃতি দেশে ইহা প্রধানতঃ উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সুইডেন, যুগোশ্লাভিয়া ও ইটালীতে কিছু চাষ হয়।

ভারতের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান প্রভৃতি তিসি উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য। ইহা রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, ভারত, কানাডা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(২) **সরিষা (Rapeseed) ঃ** ইহার চাষ বীজের জন্য। এই বীজ হইতে তৈল ও খইল উৎপন্ন হয়। ইহার তৈল রন্ধনের ও স্নানের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং খইল পশুর খাদ্য ও জমির সার। সরিষার গুড়াও চপ, কাটলেট প্রভৃতির সহিত খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উক্ত গুড়া নানাবিধ দ্রব্য রন্ধনের একটি মশলাও বটে।

মধ্যম রকম বৃষ্টিপাতযুক্ত (২০—৪০") উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে (৬০-৭০° ফা) ইহার চাষ ভাল হয়। ইহার চাষের জন্য পলিমাটি বা দোআঁশ মাটি প্রয়োজন। কুয়াশায় সরিষার ফলন ভাল হয়। এজন্য উষ্ণ মণ্ডল অপেক্ষা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অধিকতর উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সরিষা উৎপন্ন হয়।

ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, পাকিস্তান, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে ইহার চাষ হইয়া থাকে। ভারতে ইহা প্রধানতঃ উত্তর প্রদেশ, বিহার পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যায় উৎপন্ন হয়।

ইহা রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে ভারত, চীন, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, জার্মানি, ইটালি, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স উল্লেখযোগ্য।

(৩) **চীনাবাদাম (Groundnut) ঃ** ইহা মাটির নীচে হয়। ইহা হইতে যে তৈল পাওয়া যায় তাহা ভেষজ ঘৃত ও সাবান প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। মাখন ও ঘৃততে ভেজাল হিসাবেও ইহা বেশ চলে। ইহার খইল পশুর খাদ্য ও উৎকৃষ্ট সার।

ইহার চাষ প্রধানতঃ ৩৭° উত্তর ও ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৭০°—৮০° ফাঃ উত্তাপ এবং ২০"—৪০" বৃষ্টিপাতযুক্ত স্থানে ইহার চাষ ভাল হয়। ইহা মাটির নীচে জন্মে বলিয়া মাটি হাল্কা হওয়া প্রয়োজন।

ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, পশ্চিম আফ্রিকা, পূর্ব আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতের মধ্যে মাদ্রাজ, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর-প্রদেশ উল্লেখযোগ্য।

প্রধান রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে ভারত, চীন, নাইজেরিয়া, গাম্বিয়া, সেনিগাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রধান আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে ফ্রান্স, ইটালি, গ্রেটব্রিটেন, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী, বেলজিয়াম, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(৪) **তিল (Sesamum)**ঃ ইহার চাষ প্রধানতঃ বীজের জন্য। ইহার তৈল প্রদীপ জ্বালাইতে, রন্ধনের কাজে, সুগন্ধি কেশ তৈল প্রস্তুত করিতে, জলপাই তৈলের ভেজাল হিসাবে, ও ঘর্ষণজনিত ক্ষয় নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার খইল পশুর খাদ্য এবং উৎকৃষ্ট সার।

ইহা প্রধানতঃ উষ্ণমণ্ডলের ফসল। প্রচুর উত্তাপ (৮০ ফা) এবং মধ্যম রকম বৃষ্টিপাত (৩০"—৫০") ইহা চাষের পক্ষে উপযুক্ত। হাল্কা বালুমিশ্রিত দোআঁশ মাটিতে ইহার চাষ হয়।

ভারত, চীন, পাকিস্তান, মেক্সিকো, তুরস্ক, পশ্চিম আফ্রিকা, সুদান প্রভৃতি দেশে ইহা উৎপন্ন হয়। ভারতের মধ্যে ইহা উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গে জন্মিয়া থাকে।

ভারত, চীন, মেক্সিকো, পশ্চিম আফ্রিকা, সুদান প্রভৃতি দেশে ইহা রপ্তানি করিয়া থাকে। ইটালি, জাপান, আলজিরিয়া, মিশর, হংকং, সিংহল প্রভৃতি দেশ ইহা আমদানি করিয়া থাকে।

(৫) **রেড়ি (Castorseed)**ঃ ইহার তৈল জ্বালানি হিসাবে, সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করিতে, জোলাপের কাজে, যন্ত্রপাতির ক্ষয় নিবারণের জন্য, বাতি ও সাবান প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার তৈল শীতেও জমে না। এজন্য বিমানপোতের অতি ঊর্ধ্বে উঠিতে হইলে এই তৈল ব্যবহার হয়। ইহার খইল জমির সার ও পশুর খাদ্য।

রেড়ির গাছ উৎপাদনের জন্য প্রচুর উত্তাপ (৭০—৮০° ফা) এবং মধ্যম বৃষ্টিপাত (৩০"—৫০") প্রয়োজন। মাটি জলধারণক্ষম হওয়া উচিত।

ভারত, ব্রেজিল, জাভা, ইন্দোচীন, মাঞ্চুরিয়া, এঙ্গোলা, মোজাম্বিক, ইটালি, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে উৎপন্ন হয়।

ভারত, ব্রেজিল, জাভা, ইন্দোচীন, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি ইহার রপ্তানিকারক দেশ। গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম, ইটালি জাপান প্রভৃতি আমদানি-কারক দেশ।

(৬) **কার্পাস বীজ (Cotton seed) :** ইহার তৈল সাবান, বাতি প্রস্তুত করিতে, জলপাই তৈলের পরিবর্তে, কাঠের পোকা নিবারণ করিতে, ইস্পাতের দৃঢ়তা বজায় রাখিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার খইল উৎকৃষ্ট সার এবং পশু খাদ্য।

কার্পাস ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল। ইহার জন্য ৭০—৮০ ফা. উত্তাপ ও ২০-৪০" বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। মাটি খুব উর্বর ও জলধারণক্ষম হওয়া উচিত। সমুদ্রবায়ুও ইহার বৃদ্ধির সহায়ক। এজন্য যে সমস্ত স্থানে কার্পাস উৎপন্ন হয় সে সকল স্থান হইতে কার্পাস বীজ পাওয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, পাকিস্তান, চীন, মিশর, পূর্ব আফ্রিকা, ব্রেজিল, সুদান, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ কার্পাস বীজ সরবরাহে উল্লেখযোগ্য। ভারতে ইহার উৎপাদনে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্য প্রদেশ, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্র প্রভৃতি অঞ্চল উল্লেখযোগ্য।

ইহার রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, ভারত, পূর্ব আফ্রিকা, সুদান, ব্রেজিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার প্রধান আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে গ্রেট্‌ব্রিটেন, জাপান, জার্মানী, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ইটালি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(৭) **জলপাই (Olive) :** ইহার তৈল মাখনের পরিবর্তে আলো জ্বালাইতে, গায়ে মাখিতে, সাবান ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে, কলকজা চালাইতে, স্যালাড তৈল হিসাবে, মোরব্বা প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু ইহা উৎপাদনের উৎকৃষ্ট স্থান। এজন্য ইহা উৎপাদনে স্পেন, ফ্রান্স, ইটালি, গ্রীস, তুরস্ক, সিরিয়া, টিউনিস, আলজিরিয়া ইটালি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ইহার রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে উক্ত দেশগুলি উল্লেখযোগ্য। আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(৮) **তাল (Palm) :** ইহার ফল সিদ্ধ করিয়া চটকাইলে তৈল বাহির

হয়। ইহার বীচি ভাঙ্গিয়াও তৈল বাহির করা হয়। এই তৈল কৃত্রিম মাখন হিসাবে, সাবান ও মোমবাতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা উষ্ণমণ্ডলেই বেশী জন্মিয়া থাকে। মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে।

মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকা ও ইন্দোনেশিয়া ইহার প্রধান রপ্তানিকারক দেশ। হল্যাণ্ড, জার্মানী, বেলজিয়াম, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশ ইহা আমদানি করিয়া থাকে।

নারিকেল (**Cocanut**) **:** নারিকেলের শাস হইতে তৈল পাওয়া যায়। নারিকেলের প্রতিটি জিনিসই আমাদের বিভিন্ন কাজে লাগিয়া থাকে। ইহার গুড়ি ঘরের খুঁটি হইতে পারে, পাতা আচ্ছাদনের কাজে, শলাকা ঝাটা হিসাবে, ছোবড়া পাপোশ, কার্পেট, দড়ি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার জল উত্তম পানীয়, শাস সুখাদ্য। শাঁস নিংড়াইয়া যে দুধ বাহির হয় তাহা দ্বারা অনেক খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। নারিকেলের তৈল সাবান, মোমবাতি, গ্লিসারিন, মার্গারিন প্রস্তুত করিতে, মাথার তৈল হিসাবে ও রন্ধনকার্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার খোলা ও হুকার খোল, চামচ, পাত্র, বোতাম প্রভৃতি তৈয়ার করিতে ব্যবহৃত হয়। শাঁস হইতে তৈল বাহির করার পর যাহা থাকে উহা উত্তম সার ও পশু খাদ্য। ইহা উষ্ণ মণ্ডলের সমুদ্র উপকূলে বেশী জন্মিয়া থাকে। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও প্রশান্ত মহাসাগরের সিংহল', লাক্ষাদ্বীপ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, অন্যান্য দ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, মালয়, পূর্ব পাকিস্তান, চীন প্রভৃতি দেশে ইহা প্রচুর জন্মিয়া থাকে।

ইহার রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে ভারত, সিংহল, আন্দামান, ইন্দোনেশিয়া, মালয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, বেলজিয়াম, জার্মানি, হল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(১০) **সয়াবীন** (**Soyabeen**) **:** সয়া সোজা (Soia soja) গাছের গুটিকে সয়াবীন বলে। ইহার তৈল সাবান, বার্ণিশ, কৃত্রিম রবার, গ্লিসারিন, প্লাষ্টিক, ছাপাইবার কালি, কৃত্রিম মাখন ও নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতে যে একপ্রকার দুগ্ধ প্রস্তুত হয় উহা পুষ্টিকর খাদ্য এবং উহা হইতে দধি ও পনীর সবই প্রস্তুত হয়। ইহার গুড়া আটা ও ময়দার মতও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গমে যতটা প্রোটিন (Protein) আছে ইহাতে তাহার তিনগুণ আছে।

ইহার খইল পশুর খাদ্য ও উৎকৃষ্ট সার। ইহার কাঁচা গাছও গবাদির পশুর পুষ্টিকর খাদ্য।

ইহা উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের উষ্ণতর অংশে জন্মিয়া থাকে। উত্তাপের পরিমাণ ৭০-৮০ ফা. এবং বৃষ্টিপাত ২০"-৪০" প্রয়োজন। ইহা ছাড়া উর্বর দোঁয়াশ মাটি ইহা চাষের উপযুক্ত।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়ার, ইউক্রেন প্রভৃতি ইহার প্রধান উৎপাদক অঞ্চল।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি ইহার রপ্তানিকারক দেশ। জার্মানী, মরক্কো, চিলি, স্পেন, কানাডা, গ্রীস, জাপান প্রভৃতি ইহার আমদানিকারক দেশ।

(১ **টুং (Tung) :** ইহার বীজ হইতে যে তৈল পাওয়া যায় উহা কাঠে লাগাইলে শীঘ্র শুকাইয়া যায় এবং কাঠও খুব মজবুত হয়। এরূপ কাঠ জলে থাকিলেও শীঘ্র পচে না। এজন্য নৌকা, জাহাজ, ষ্টীমার প্রভৃতি রং করার কাজেই অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়।

উষ্ণ মণ্ডলে ও উষ্ণতর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে এই গাছ জন্মিয়া থাকে।

বর্তমানে চীন দেশই ইহার প্রধান উৎপাদক অঞ্চল এবং এখান হইতেই ইহা বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

(১২) **মহুয়া (Mowa) :** ইহার বীজ হইতে যে তৈল পাওয়া যায় উহা সাবান, মোমবাতি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যহহৃত হয়। ইহার খইল সার হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

ইহা উষ্ণ অঞ্চলেরই গাছ। ভারতের ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশেই ইহা প্রধানতঃ জন্মিয়া থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

অরণ্য সম্পদ

(Forest Resources)

Q. 1. Give an account of the principal types of forests and their world distribution Indicate the relationship between climate and the development of forests (C. U. Inter, 1957)

(বিভিন্ন প্রকার অরণ্যভূমির বর্ণনা দাও এবং পৃথিবীতে উহাদের বণ্টন উল্লেখ কর। অরণ্যভূমির বৃদ্ধির সহিত জলবায়ুর সম্পর্ক নির্ণয় কর।)

Ans পৃথিবীর অরণ্যভূমিগুলিকে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় :

(১) উষ্ণমণ্ডলের চিরহরিৎ শক্ত কাঠের অরণ্যাঞ্চল (Tropical Hardwood Evergreen forests)।

(২) উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের শক্তকাঠের পর্ণমোচী অরণ্যাঞ্চল (Tropical and Temperate Hardwood Deciduous forests)।

(৩) নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের নরম কাঠের সরলবর্গীয় অরণ্যাঞ্চল (Temperate soft wood coniferous forests)।

উপরি উক্ত তিনপ্রকার অরণ্যভূমির উৎপাদন ও বৃদ্ধি মৃত্তিকা ও জলবায়ুর উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। নিম্নে উহাদের বিস্তৃত বিবরণ সহ জলবায়ুর সহিত উহাদের উৎপাদন ও বৃদ্ধির সম্পর্ক নির্ভর করা হইল :

(১) **উষ্ণ অঞ্চলের শক্ত কাঠের চিরহরিৎ অরণ্যাঞ্চল :** এই জাতীয় অরণ্য উৎপাদনের জন্য সারা বৎসরব্যাপী উচ্চ উত্তাপ (৭৫ ফাঃ ও প্রচুর বৃষ্টিপাত (৮০") প্রয়োজন। এজন্য নিরক্ষীয় অঞ্চলে ইহাদের প্রাচুর্য দেখা যায়। অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত মৌসুমী অঞ্চলেও ইহার উৎপাদন যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকা অঞ্চল দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিকা অঞ্চল, আফ্রিকার গিনি উপকূল, ইন্দোনেশিয়া, বোর্ণিও, নিউগিনি, মধ্য আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন, ভারত প্রভৃতি অঞ্চলে এরূপ অরণ্যভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। এই অরণ্যভূমিতে যে সমস্ত বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে মেহগনি আবলুস, তালজাতীয় বৃক্ষ, গোলাপগন্ধ, রবার, শাল, সেগুন উল্লেখযোগ্য। এ অরণ্যভূমিতে নানা প্রকার বৃক্ষের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া

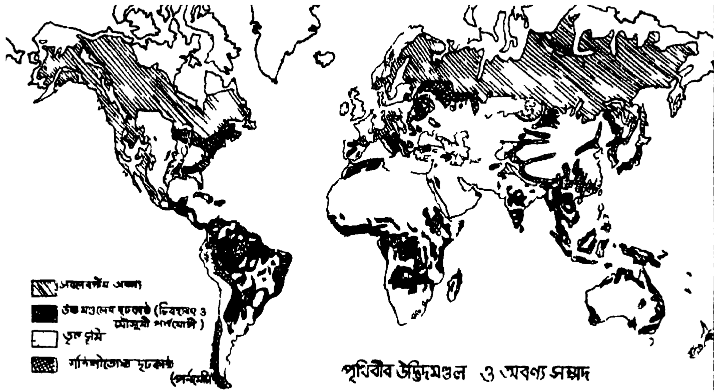
যায় এবং বিভিন্ন বৃক্ষ বৎসরের বিভিন্ন সময়ে পত্রত্যাগ করে। এজন্য কোন সময়েই এ অঞ্চল পত্রবিহীন বলিয়া মনে হয় না। এজন্য ইহাকে চিরহরিৎ অরণ্য নাম দেওয়া হইয়াছে। এখানকার বৃক্ষগুলি খুব লম্বা এবং পত্রবহুল হয় এবং নিম্নাঞ্চল নানা প্রকার লতাপাতায় আচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু বৃক্ষগুলির কাঠ খুব শক্ত, ভারী এবং কাটা খুব কষ্টসাধ্য। ইহা ছাড়া এতদ অঞ্চলে যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল নয়, নানা প্রকার বিষাক্ত পোকামাকড়ের উপদ্রব, জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর এবং অরণ্যের মধ্যে চলাফেরা করাও কষ্টকর। এজন্য বাণিজ্যিক দিক দিয়া এই বনের কাঠের ব্যবহার কম। কিন্তু কাঠগুলিকে 'পলিস করিতে পারিলে খুব সুন্দর দেখায় এবং দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। এখানকার অরণ্যজাত দ্রব্যের মধ্যে কাঠ, রবার, বাঁশ, গাটাপাচা, সিঙ্কোনা, মধু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর মোট অরণ্যভূমির শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ এই জাতীয় অরণ্য কিন্তু মোট ব্যবহৃত কাঠের শতকরা ২।৩ ভাগ মাত্র এখান হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। এই অরণ্যভূমির অন্য নাম সেলভা (Selvas)।

(২) **উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের শক্ত কাঠের পর্ণমোচী অরণ্যাঞ্চল**ঃ এই জাতীয় অরণ্য মৌসুমী ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে মধ্যম রকমের বৃষ্টিপাতযুক্ত স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ৭০"—৬০" বৃষ্টিপাত এবং ৭৭ ফা—৮০ ফা উত্তাপবিশিষ্ট স্থানেই ইহার আধিক্য। শাল, সেগুন বাঁশ, চন্দন প্রভৃতি বৃক্ষগুলি ভারত, ব্রহ্মদেশ শ্যাম, ইন্দোচীন, দক্ষিণ চীন প্রভৃতি উষ্ণ অঞ্চলে এবং ওক, ম্যাপল বাচ, অ্যাস, ওয়ালনাট, এলম, দেবদারু, ইউকলিপটাস প্রভৃতি বৃক্ষগুলি পশ্চিম ইউরোপ, দক্ষিণ রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিমালয় অঞ্চল, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, পাটাগোনিয়া, দক্ষিণ চিলি প্রভৃতি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মের প্রখরতা বা শীতের তীব্রতার হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য গাছগুলি পত্রত্যাগ করে বলিয়া ইহার নাম পর্ণমোচী হইয়াছে। এই সমস্ত গাছের কাঠ হইতে আসবাবপত্র, খেলার সরঞ্জাম, জাহাজ নির্মাণ, রেলের স্লিপার ও বগি, বাস প্রভৃতি নির্মাণের জন্য চিরহরিৎ অরণ্যের কাঠ অপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত হয়। এ জাতীয় বনভূমি মোট বনভূমির প্রায় ১৫ শতাংশ কিন্তু মোট ব্যবহৃত কাঠের প্রায় শতকরা ২০ ভাগ এখান হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। এ অঞ্চলের বনভূমির ঘনত্বও অপেক্ষাকৃত কম এবং অভ্যন্তরে যাতায়াত অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। তাহা ছাড়া এই অরণ্যভূমি উন্নতিশীল দেশগুলিতেও বেশী মাত্রায় বিস্তৃত। এতদ অঞ্চলে অনেক বনভূমি কাটিয়া ভূমি কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত করা হইয়াছে।

(৩) **নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের নরম কাঠের সরলবর্গীয় অরণ্যাঞ্চল** : যে সমস্ত অঞ্চলে গ্রীষ্মের উত্তাপ ৬০° ফা, বৃষ্টিপাত ১৫" এবং শীতকালে তুষারপাত হয় সেই সমস্ত অঞ্চলে এ জাতীয় বৃক্ষের বনভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর উচ্চ অক্ষাংশে মনুষ্য বাসের অনুপযোগী শীতপ্রধান স্থানেই এই অরণ্যের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, রাশিয়া, কানাডা, হিমালয়, আলপস, অ্যাণ্ডিজ ও রকির অপেক্ষাকৃত উচ্চাংশে এই জাতীয় বনভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। পাইন, ফার, সপ্রুস, বাচ, হেমলক, সাইপ্রাস, জুনিপার, ডগলাস প্রভৃতি এ অঞ্চলের বৃক্ষ। এখানকার বনভূমি খুব ঘন নহে। আবার একই প্রকার গাছ বহু সংখ্যায় একস্থানে পাওয়া যায়। ইহাদের কাঠ নরম, হাল্কা এবং সহজে কাটা যায় ও বহন করা চলে। নদীতে ভাসাইয়া এই কাঠ বহু দূরে লইয়া যাওয়া চলে। এই সমস্ত কাঠ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। আসবাবপত্র, কাগজের মণ্ড, কৃত্রিম রেশম, প্লাই-উড, নিউজপ্রিণ্ট, জাহাজের মাস্তুল, দিয়াশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স প্রভৃতি এই বনভূমির কাঠ হইতে প্রস্তুত করা চলে। এ জাতীয় বনভূমির পরিমাণ মোট বনভূমির শতকরা ৩০ ভাগ কিন্তু মোট ব্যবহৃত কাঠের শতকরা ৭০।৮০ ভাগ এই বনভূমি হইতে সংগৃহীত হয়। গাছগুলি সরল ও বেশী লম্বা, উহাদের পাতাগুলি সরু এবং গাছের মাথাগুলি মন্দিরের চূড়ার মত। এই গাছগুলির কাঠ বেশ নরম এবং সহজে কাটা যায়। এজন্য দামও অপেক্ষাকৃত কম। ইহা ছাড়া সে সমস্ত অঞ্চলে এই বনভূমি বিস্তৃত তথায় জলবিদ্যুৎ শক্তি সুলভ, শ্রমিকও প্রচুর, যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত। এখানকার শ্রমিকরা গ্রীষ্মকালে চাষ আবাদ করে, কিন্তু শীতকালে কাঠ কাটিতে আসে। বনভূমির নিকটে শিল্পাঞ্চলও গড়িয়া উঠিয়াছে। এজন্য এ সমস্ত কাঠের ব্যবহার বেশী এবং দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

অনেক দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি এই বনভূমির সহিত জড়িত। ফিনল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক উন্নতি অরণ্য সম্পদের উপর বেশী নির্ভরশীল। নরওয়ে ও সুইডেনও প্রচুর কাঠ রপ্তানি করিয়া থাকে। রাশিয়ার ও কানাডার কাগজ শিল্প এই নরম কাঠের উপর নির্ভরশীল। কাগজ ও মণ্ড উৎপাদনে কানাডা পৃথিবীতে প্রথম এবং নিউজপ্রিণ্ট কাগজ সবচেয়ে বেশী রপ্তানি করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নরম কাঠের বনভূমি খুব বেশী না থাকিলেও ইহার ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। জাপানেও নরম কাঠের সাহায্যে কাগজ শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ইটালি প্রভৃতি দেশে নরম কাঠের সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প যেমন কাগজ, পেন্সিল, কৃত্রিম রেশম, দেওয়াল ঘড়ি, দিয়াশলাই প্রভৃতি বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে এবং উক্ত দ্রব্যাদি রপ্তানি বাণিজ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

আন্তর্জাতিক ব্যবসাক্ষেত্রে কানাডা, সুইডেন 'ফিনল্যাণ্ড, রাশিয়া, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশ নরম কাঠ রপ্তানিতে এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশ আমদানিতে উল্লেখযোগ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমদানি রপ্তানি দুইই করিয়া থাকে



পৃথিবীব উদ্ভিদমণ্ডল ও অবণ্য সম্পদ

উপরিউক্ত বনভূমি ছাড়া নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বা লোনাজলেব অবণ্য, উষ্ণ তৃণভূমি যেমন সাভানা অঞ্চলের তৃণভূমির বৃক্ষাদি, মরু অঞ্চলেব কাঁটাগাছ, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেব পুরুছালযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষ প্রভৃতি উল্লেখ কবা যাইতে পারে।

Q 2. Describe the distribution and economic uses of the coniferous forest of the world. (C. U. Inter, 1955)

(পৃথিবীর নরম সরলবর্গীয় বৃক্ষের বণ্টন ও ব্যবহারের বিবরণ দাও)

Ans See to Ans. of Q 1. (3)

Q. 3. Describe the distribution of the temperate decidurous forests in Europe. Name four important timber producing trees of such forests and mention their economic importance to the countries of production. (C. U. Inter, 1960.)

(ইউরোপের নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী বৃক্ষের বিবরণ দাও। ঐ জাতীয়

চারিটি বৃক্ষের নাম কর এবং উৎপাদক দেশগুলির অর্থনৈতিক জীবনে উহাদের গুরুত্ব উল্লেখ কর।)

Ans. See to Ans. of Q 1 (2)

Q. 4. What are India's most important forests ?

(ভারতের প্রধান বনভূমি কি কি ?) (C. U. Inter, 1953)

Or,

Show how the distribution of the different types of forests is controlled by rainfall in India.

(ভারতে বৃষ্টিপাত কিভাবে বনভূমির বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করে দেখাও।)

Ans ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের বনভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে বৃষ্টিপাতও সর্বত্র সমান নহে। বৃষ্টিপাত বনভূমির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া বৃষ্টিপাত অনুযায়ী বনভূমির সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে বৃষ্টিপাতের সহিত বনভূমির সম্পর্ক বুঝিতে পারা যাইবে।

(১ **চিরহরিৎ অরণ্য** (Evergreen Forests) : যেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৮০"র অধিক তথায় এ জাতীয় বৃক্ষের অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পশ্চিমঢালে, হিমালয়ের পূর্বাংশের পাদদেশে ও আসামে বৃষ্টিপাতের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য এই সমস্ত অঞ্চলে চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য বিরাজমান। এ গাছের পাতাগুলি শুষ্ক শীতকালেও সম্পূর্ণ ঝড়িয়া পড়ে না। এজন্য ইহারা চির সবুজ। অধিক বৃষ্টিপাতের জন্য মাটির নীচে যে জল জমা হয় তাহাতেই বৃক্ষের পাতা সরস থাকে। এই অরণ্যে গর্জন, চাপলাস, জারুল, আবলুস, চন্দন, লোহাকাঠ, মেহগনি, খয়ের, রবার, বাঁশ, বেত, নারিকেল, তাল, গোলাপ, শিশু, তেলসুর, পুন, চিকরাশি প্রভৃতি গাছ জন্মিয়া থাকে। এ অরণ্যজাত দ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন গাছের কাঠ, গর্জন, চন্দন প্রভৃতি গাছের তৈল, বন্য রেশম, মধু, কাগজের জন্য বাঁশ, ইহাছাড়া বাঁশ, বেত প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার জিনিস তৈয়ারী হয়।

(২) **পর্ণমোচী মৌসুমী অরণ্য** (Deciduous monsoon forests) : ৪০" হইতে ৮০" বৃষ্টিপাত বিশিষ্ট অঞ্চলে এরূপ বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, হিমালয়ের তরাই প্রভৃতি এরূপ বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে এই জাতীয় অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। শুষ্ক শীতকালে এই জাতীয় বৃক্ষের পাতা ঝড়িয়া পড়ে। যে পরিমাণ বৃষ্টি এখানে হয় তাহা মাটি ও গাছের পাতা

উভয়ের সরসতা বজায় রাখিতে পারে না। ফলে শীতকালে পত্র ত্যাগ করিয়া ইহারা বাঁচিয়া থাকে। শাল, সেগুণ, শিরিষ, পলাশ, মহুয়া প্রভৃতি এ জাতীয় বনভূমির উল্লেখযোগ্য গাছ। এ অঞ্চলের অরণ্যজাত দ্রব্যের মধ্যে কাঠ, লাক্ষা, মধু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(৩) **শুষ্ক পর্ণমোচী অরণ্য (Savannah):** ২০ হইতে ৪০″ বৃষ্টিপাত বিশিষ্ট অঞ্চলে এই জাতীয় অরণ্য দেখা যায়। গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অধিকাংশ বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলের বনভূমি। এখানকার জলবায়ু মোটামুটি চরমভাবাপন্ন। শাল, সেগুন, শিশু ও দীর্ঘ সাবাই ঘাস এ অঞ্চলের সম্পদ। সাবাই গাছ কাগজ প্রস্তুত করার একটি উৎকৃষ্ট কাচামাল।

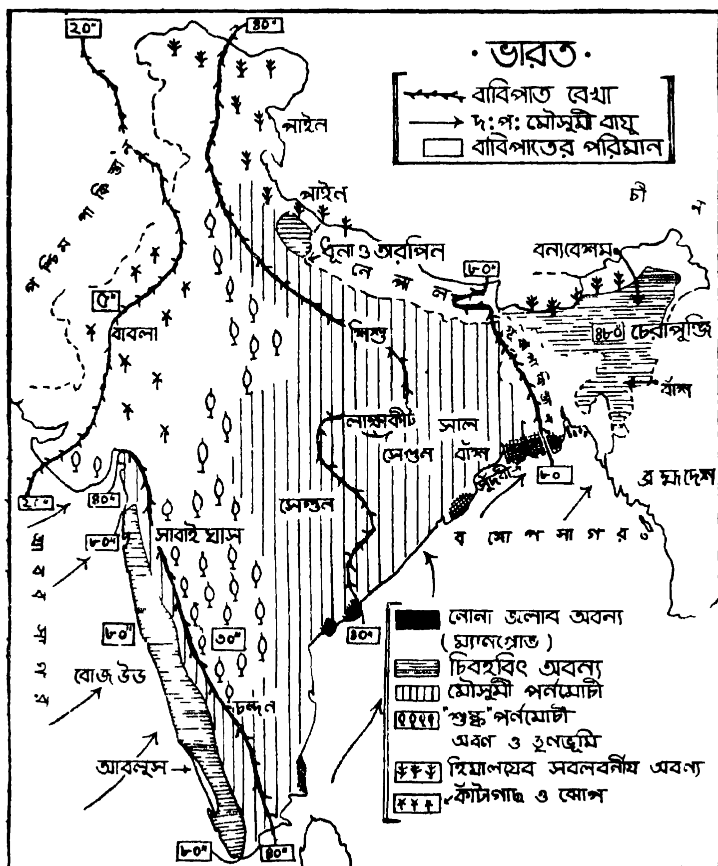
(৪) **গুল্ম অরণ্য (Scrublands):** ২০″র কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ইহা দেখা যায়। বাবলা, খেজুর, ফণিমনসা, তেশিরা প্রভৃতি গাছ এখানে জন্মিয়া থাকে। পাঞ্জাব, রাজপুতনা ও দাক্ষিণাত্যের শুষ্ক অঞ্চলে এই জাতীয় বৃক্ষ দেখা যায়। এখনকার বাবলা গাছের কাঠ খুব শক্ত ও মজবুত। লাঙ্গল, গরুর গাড়ীর চাকা প্রভৃতি নির্মাণের উপযোগী।

(৫) **শুষ্ক চিরহরিৎ অরণ্য (Arid Evergreen forests):** মাদ্রাজের তটভাগের যে অঞ্চলে বৎসরে দুইবার বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০″র কম তথায় অধুনা লুপ্ত প্রায় কিছু কিছু এই জাতীয় গাছ দেখা যায়। এই জাতীয় গাছগুলি ক্ষুদ্রাকার ও গুল্মজাতীয়। বৃষ্টিপাত কম ও জলবায়ু শুষ্ক হইলেও গাছগুলি চির সবুজ দেখিতে পাওয়া যায়।

(৬) **পার্বত্য বনভূমি (Mountain forests):** বৃষ্টিপাত ও উচ্চতার তারতম্য অনুসারে পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার অরণ্য দেখা যায়। নিম্ন হইতে উচ্চে ক্রমশঃ শাল, সেগুন, পাইন, ফার, দেবদারু প্রভৃতি বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নাংশে শাল, সেগুন, ৩০০০ হইতে ৯০০০ ফুটের মধ্যে ওক, ম্যাগনোলিয়া, জয়পত্র, স্প্রুস, পাইন, দেবদারু প্রভৃতি, ৯০০০ হইতে ১২০০০ পর্য্যন্ত জুনিপার, পাইন, ফার, রোডোড্রেনড্রন প্রভৃতি, ১২০০০ হইতে ১৫০০০ পর্য্যন্ত রোডোড্রেনড্রন, জুনিপার ও তৃণভূম জন্মিয়া থাকে। উচ্চাংশে অবস্থিত এরূপ উদ্ভিদকে "আল্পীয় উদ্ভিদ" বলে। ১৫০০০ ফুটের উচ্চে হিমালয়ে সাধারণতঃ সারা বৎসরই বরফ জমিয়া থাকে। তবে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য হিমালয়ের বনভূমির ব্যবহার কম।

(৭) **উপকূলীয় অরণ্য (Littoral Forests):** নদীর বদ্বীপে প্লাবলিক ভূমিতে উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু বিশিষ্ট স্থানে এই জাতীয় অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরীর বদ্বীপ অঞ্চলে 'মানগ্রোভ' জাতীয় এই অরণ্য জন্মিয়া থাকে। সুন্দরী, গড়ান, গেউয়া, পুশর,



হোগলা, বেত, তালজাতীয় বৃক্ষ, নারিকেল, সুপারী প্রভৃতি এ অঞ্চলের বৃক্ষাদি। এই অরণ্যজাত সম্পদের বিভিন্ন বৃক্ষের মধ্যে কাঠ, মধু, নারিকেল, সুপারী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

Q. 5. Discuss the commercial importance of forests in India (C. U. Inter 1957)

(ভারতের বনভূমির ব্যবসায়িক গুরুত্ব আলোচনা কর।)

Or

Is India rich in forest products? Mention their principal uses (C. U Inter. 1946.)

(ভারত কি বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ? উহারা কি কি কাজে লাগে উল্লেখ কর।)

Ans. ভারতের সমগ্র আয়তনের শতকরা ২২ ভাগ (১৩-২ কোটি একর) বনভূমি। ব্রেজিল, কানাডা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের তুলনায় ইহা কম। দেশের প্রয়োজন মিটাইতে প্রত্যেক দেশেব আয়তনের এক তৃতীয়াংশ বনভূমি থাকা আবশ্যক। এই দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতকে অরণ্য সম্পদে সমৃদ্ধ বলা চলে না। তাহার পর নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য:

(১) ভাবতে বনভূমির বণ্টন সর্বত্র একরূপ নহে। উহাদের বণ্টন হিমালয অঞ্চলে শতকবা ২০ ভাগ, উত্তর ভাবতের সমভূমি অঞ্চলে শতকরা ৭ ভাগ, দাক্ষিণাত্যের পর্বত ও মালভূমি অঞ্চলে শতকরা ৫৯ ভাগ, পশ্চিম ঘাট ও পশ্চিম উপকূলের সমভূমি অঞ্চলে শতকরা ১০ ভাগ এবং পূর্বঘাট ও পূর্ব উপকূলের সমভূমি অঞ্চলে শতকরা ১২ ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। (২) বিভিন্নরূপ অরণ্যের পরিমাণও আশানুরূপ নহে। সরলবর্গীয় নরম কাঠ যাহার প্রয়োজন বিভিন্ন কাজে সর্বাধিক উহা মাত্র ১০ হাজার বর্গমাইল পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া বিস্তৃত। শালবনের বিস্তৃতি প্রায ৪১ হাজার বর্গমাইল। সেগুনবনের বিস্তৃতি ২২ হাজার বর্গমাইল এবং অন্যান্য কাঠের বনের বিস্তৃতি প্রায় ২০৮ হাজার বর্গমাইল। (৩) অনেক স্থানের অরণ্য হইতে বনজাত দ্রব্য শিল্পকেন্দ্রে আনয়ন করা ব্যয়সাধ্য। (৪) বিভিন্নপ্রকার বৃক্ষের আধিক্যহেতু উহাদেব সম্যক ব্যবহার আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। কেবলমাত্র শাল ও সেগুন কাঠের অত্যধিক ব্যবহার হেতু উহারা প্রায় নিঃশেষ হইতে চলিয়াছে। (৫) নরম কাঠের গাছগুলি হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া উহারা আমাদের বিশেষ কাজে লাগিতে পারিতেছে না। এসব ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে অরণ্য সম্পদ একাধিক কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রায় ১০ লক্ষ লোক অরণ্য সংক্রান্ত কাজকর্মের দ্বারা জীবিকা অর্জন করিতেছে। নিম্নে সংক্ষেপে ভারতীয় বন সম্পদের গুরুত্ব বর্ণিত হইল:

(১) বনভূমির **মুখ্য উৎপাদন** (major produce) কাঠ। গৃহাদি ও আসবাবপত্র নির্মাণে এবং জ্বালানী হিসাবে, রেল, ষ্টীমার ও জাহাজ প্রভৃতি নির্মাণে

এই কাঠ প্রচুর ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতে কাঠের উৎপাদন প্রায় ৫০ কোটি ঘন ফুট। এই কাঠ শুধু স্বদেশের প্রয়োজনে ব্যয়িত হয় না চন্দন, আবলুস, সেগুন প্রভৃতির চাহিদা বিদেশেও প্রচুর। প্রতি বৎসরে হংকং, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে প্রায় ২ কোটি টাকার কাঠ রপ্তানি হয়। মূল্যবান কাঠ হিসাবে শাল, সেগুন, চন্দন, আবলুস, মেহগনি, খয়ের, তুন, শিশু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ঘরের কড়ি, বরগা ও রেলের পাতন প্রস্তুত করিতে শাল, জানালা দরজা, মূল্যবান আসবাব পত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে সেগুন, আবলুস, মেহেগনি, খয়ের তুন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট। কাগজ, দিয়াশলাই, কৃত্রিম রেশম, প্যাকিং বাক্স প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পাইন, ফার, দেবদারু প্রভৃতি নরম কাঠ ব্যবহৃত হয়।

(২) শিল্পোপযোগী বহু প্রকার কাঁচামাল যেমন, লাক্ষা, উদ্ভিজ্জ তৈল, চর্মরঞ্জক দ্রব্য, আঠা, ধুনা, ধূপ, কর্ক, কুইনাইন, ফল, ফুল, রং প্রভৃতি গৌণ উৎপাদন (minor produce) অরণ্যজাত সম্পদ হইতেই সংগৃহীত হয়। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৭০ ভাগ লাক্ষা ভারতে উৎপন্ন হয়। ভারতীয় উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার টন। এই উৎপাদনের অধিকাংশ বিহারের ছোটনাগপুর হইতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া যুক্তপ্রদেশে, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, উড়িষ্যা ও পাঞ্জাব হইতেও লাক্ষা সংগৃহীত হয়। পলাশ কুসুম, কুল, বাবলা প্রভৃতি গাছের রস খাইয়া একপ্রকার কীট জীবনধারণ করে। উহাদের মুখ নিঃসৃত লালা হইতে লাক্ষা পাওয়া যায়। ইহা গ্রামোফন রেকর্ড (৩৫%), বার্নিস (২০%), টুপি (১০%), সিলমোহর প্রস্তুত করিতে, বৈদ্যুতিক শিল্পে (১৫%) এবং অন্যান্য শিল্পে (৩০%) প্রয়োজন হয়। উৎপাদনের শতকরা ২ ভাগ দেশের প্রয়োজনে লাগে। বাকী অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, জার্মানী, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়। বৎসরে ভারত ১০ কোটি টাকার অধিক মূল্যের লাক্ষা রপ্তানি করে। মোট রপ্তানির শতকরা ৯৮ ভাগ কলিকাতা বন্দর দিয়া বিদেশে যায়। কৃত্রিম লাক্ষা ও শ্যামের লাক্ষা বর্তমানে ভারতীয় লাক্ষার প্রতিযোগী।

আসামের ও হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের চীর, পাইন বৃক্ষ হইতে ধুনা প্রস্তুত হয়। এই ধুনা হইতে **তার্পিন তৈল** ও **রজন** পাওয়া যায়। ধুনা হইতে তার্পিন তৈল বাহির করার পর যে শক্ত দ্রব্য থাকে তাহাকে রজন বলে। কাগজ ও সাবান প্রস্তুত করিতে এবং গালার সহিত মিশাইতে রজন এবং ঔষধ ও বার্নিশ প্রস্তুত করিতে তার্পিন তৈল ব্যবহৃত হয়। ভারতের প্রয়োজনের শতকরা ৭০ ভাগ তার্পিন তৈল দেশেই উৎপন্ন হয়। বাকী অংশ কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানি হয়।

মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে অনেক হরিতকী গাছ আছে। এই গাছের ফল, ছাল, পাতা ও কাণ্ড বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। নানা প্রকারের রং, রাসায়নিক দ্রব্য, চর্মরঞ্জক দ্রব্য, ঔষধ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ইহার ছাল ও ফল ব্যবহৃত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, জাপান, চীন, বেলজিয়াম, যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচুর হরিতকী রপ্তানি হয়।

মহীশূর, কেরালা, মাদ্রাজ ও মহারাষ্ট্রে অনেক **চন্দন** গাছ আছে। এই গাছের কাঠ হইতে তৈল বাহির করা চলে। এই তৈল ঔষধ, নানাবিধ গন্ধদ্রব্য ও উচ্চশ্রেণীর সাবান প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালোরে এই তৈল নিষ্কাশনের কারখানা আছে। এই তৈলও বিদেশে প্রচুর রপ্তানি হয়। ইহা ছাড়া **মহুয়া, নিম** প্রভৃতি গাছ হইতেও তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল চর্মরোগের পক্ষে খুব উপকারী। ভেষজ গুণসম্পন্ন আরও অনেক গাছ আছে। যেমন ধুতুরা হইতে বেলেডোনা, কুচিলা ফল হইতে নাক্সভমিকা ঔষধ প্রস্তুত হয়। বাবলা, আম, অশ্বথ ও শাল গাছ হইতে আঠা পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ ও মালাবার উপকূলবর্তী অঞ্চলে অনেক নারিকেল ও সুপারী পাওয়া যায়। নারিকেলের শাঁস, তৈল, ছোবড়া প্রভৃতি আমাদের নানা প্রয়োজন মিটায়। দার্জিলিং ও নীলগিরি অঞ্চলে সিঙ্কোনা হইতে কুইনাইন পাওয়া যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে তাল ও খেজুরের রস হইতে গুড়, চিনি, বাঁশ হইতে কাগজের মণ্ড, গৃহের খুঁটি, বেড়া ও নানা প্রকার গৃহস্থালী দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইহা ছাডা বেত সোলা, হোগলা, সাবাই ঘাস (বিশেষ কাগজ প্রস্তুত করিতে) আমাদের নানা কাজে লাগিয়া থাকে। সুতরাং ভারতীয় অরণ্য সম্পদ এইভাবে নানাবিধ গৌণ উৎপাদনের জন্যও প্রসিদ্ধ।

(৩) অরণ্য সম্পদ আহরণকারীদের নিকট হইতে সরকার রাজস্ব আদায় করিয়া থাকে। ইহাতে একদিকে জাতীয় ভাণ্ডারে অর্থ বৃদ্ধি হয় এবং বহু লোকের জীবিকার সংস্থান হয়।

(৪) অরণ্য দেশের মধ্যে বৃষ্টির জলকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জলধারার বেগ কমাইয়া দেয়। উহার ফলে ভূমিভাগের ক্ষয় নিবারণ হয়, কম পলি বাহিত হয়, নদীগর্ভ পলি দ্বারা কম ভর্তি হয় এবং এইভাবে অতিরিক্ত প্লাবনের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ভূমি ভাগের ক্ষয় নিবারিত হইলে জমির উর্বরতা অক্ষুণ্ণ থাকে। দামোদরের বন্যা এবং বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের ভূমির উর্বরতা হ্রাস যে ছোটনাগপুরের বনভূমির ধ্বংসের ফলেই ঘটিয়াছে ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অরণ্যাঞ্চল বৃষ্টিপাতে সহায়তা করে এবং উক্ত অঞ্চলের জলবায়ুকে শীতল ও আর্দ্র রাখে।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে অরণ্য আমাদের জাতীয়

জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সুতরাং বনভূমির সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য নিতান্তই প্রয়োজন। বনমহোৎসব ও বনভূমির সংরক্ষণ ও আবাদ বৃদ্ধির দ্বারা বনভূমির পরিমাণ মোট ভূমিভাগের শতকরা ৩৫ ভাগে দাঁড় করাইতে পারিলে এবং পার্বত্য অঞ্চলের পরিমাণ শতকরা ৬০ ভাগ ও সমভূমির পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ করিতে পারিলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ইহা সত্যই এক গুরুত্বপূর্ণ আসন অধিকার করিয়া বসিবে।

Q. 6. What is lumbering ? Name the countries that are most famous for lumbering industries.

(কাষ্ঠ চেরাই কি ? যে সমস্ত দেশ কাষ্ঠ চেরাই শিল্পে প্রসিদ্ধ তাহাদের নাম কর।)

Or

Write short notes on : Lumber Industry **(C. U Pre-1962)**

(কাষ্ঠ চেরাই শিল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও)

Ans : গাছ কাটা এবং উহা কাষ্ঠ সংক্রান্ত শিল্পের উপযোগী করিয়া কাঠ চেরাই করাকে কাষ্ঠ চেরাই (Iumberlng) বলে। কাঠ হইতে নানা প্রকার জ্বালানী, আসবাব পত্র, ঘরবাড়ী, রেলের স্লিপার, জাহাজের পাটাতন, মাস্তুল, কাগজের ও কৃত্রিম রেশম শিল্পের উপযোগী মণ্ড প্রভৃতি সংগৃহীত হয়। সুতরাং বনসম্পদের মুখ্য উৎপাদন (major product) যে যে কাজে লাগে তৎসংক্রান্ত শিল্পই কাষ্ঠ চেরাই শিল্পের (Lumbering industries) অন্তর্গত।

পৃথিবীতে নরম, কঠিন, শক্ত ও বিভিন্ন নামধারী অনেক প্রকার বৃক্ষ আছে। এই বিভিন্ন প্রকার গাছ বিভিন্ন প্রকার কাজের উপযোগী। কিন্তু ইহাদের বণ্টন পৃথিবীর সর্বত্র একরূপ নহে। এজন্য যে সমস্ত দেশে বনসম্পদের প্রাচুর্য্য সেই সমস্ত দেশই কাষ্ঠ চেরাই শিল্পে অগ্রসর। পৃথিবীতে মোট বন সম্পদের শতকরা ৯ ভাগ যুক্তরাষ্ট্রে, ২১ ভাগ রাশিয়ায়, ১২ ভাগ অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও কানাডায় এবং ১৩ ভাগ ব্রেজিলে অবস্থিত।

যে সমস্ত দেশ কাষ্ঠ চেরাই শিল্পে প্রসিদ্ধ তাহাদের মধ্যে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, সুইডেন, নরওয়ে, জাপান, ফিনল্যাণ্ড, জার্মানী, নিউজিল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে সমস্ত কাঁচা মাল পৃথিবীতে উৎপন্ন হয় ওজনের দিক দিয়া বিচার করিলে কাঠের স্থান দ্বিতীয়—কয়লার পরে। সুতরাং কাষ্ঠ ব্যবসার গুরুত্ব কোন অংশেই কম নহে। কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, সুইডেন,

ফিনল্যাণ্ড, জার্মানী ও জাপান একত্রে পৃথিবীর মোট কাষ্ঠের শতকরা ৭০ ভাগ উৎপন্ন করে। কাষ্ঠের ব্যবহার উত্তর আমেরিকা, ওসানিয়া ও ইউরোপে বেশী। যদিও ইহাদেব লোকসংখ্যা শতকরা ২৪ ভাগ, ইহারা শতকরা ৭০ ভাগ কাঠ ব্যবহার করিয়া থাকে। কানাডার অর্ধেকের বেশী অংশ বনাবৃত্ত। সমগ্র উত্তরাংশই বন। উক্ত বনভূমির বিস্তার পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৩০০০ মাইল এবং উত্তর-দক্ষিণে ৩০০ মাইল। ইহার অধিকাংশই নরম কাষ্ঠের বন। এখানে কাষ্ঠ চেরাই শিল্পও খুব উন্নত। যুক্তরাষ্ট্রেরও বিভিন্ন অঞ্চলে শক্ত ও নরম কাষ্ঠের বন আছে এবং এখানেও কাষ্ঠশিল্প বিশেষ উন্নত। নরওয়েের চতুর্থাংশ ও সুইডেনের অর্ধাংশ বনাবৃত। নবওয়ে হইতে কাষ্ঠ শিল্পের উপযোগী কাঠই বেশী রপ্তানি হয়। সুইডেন হইতে কাষ্টমণ্ড ও কাষ্ঠদ্রব্যই বেশী রপ্তানি হয়। ফিনল্যাণ্ডের শতকরা ৬০ ভাগ বনাবৃত। কাষ্ঠমণ্ড ও কাষ্ঠদ্রব্য বপ্তানিতে ইহার স্থান দ্বিতীয়—কানাডা প্রথম। রাশিয়ার শতকরা ৩৮ ভাগ বনাচ্ছন্ন। বনের পরিমাণ অবশ্য ফিনল্যাণ্ডের প্রায় ৯ গুণ। উত্তরে আর্কাঞ্জেল ইহার শ্রেষ্ঠ কাষ্ঠ-রপ্তানি অঞ্চল। জাপানে কয়লার পবিমাণ কম। এজন্য ইহাব নিজস্ব বনভূমি থাকিলেও গৃহ নির্মাণের ও অগ্নি উৎপাদনের জন্য আমেরিকা হইতে কাষ্ঠ আমদানি করিয়া থাকে। ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশ সেগুণ কাঠ অনেক রপ্তানি করে। অষ্ট্রেলিয়ার 'জারা' ও কারি কাঠ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে উই ধবে না এবং ইহা জলেও পচে না। এই কাঠ বিদেশে অনেক রপ্তানি হয়।

———

ষষ্ঠ অধ্যায়

পশুপালন

(Pastoral Industries)

Q. 1. Describe the importance of animal in the economic life of the people of the world.

(পৃথিবীর লোকদের অর্থনৈতিক জীবনে পশুর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।)

Ans : পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নানাপ্রকার জীবজন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত জীবজন্তুর মধ্যে অনেকগুলি যেমন আমাদের মানব জীবনে ভীতির সঞ্চার করে, আবার উহাদের অনেকে আমাদের প্রয়োজনের নানা প্রকার জিনিস সরবরাহ করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া ইহারা অনেকে আমাদের নানা কাজে সহায়তাও করিয়া থাকে। এজন্য আমরা অনেক প্রকার পশু প্রতিপালন করিয়া থাকি। এই সমস্ত পশুর মধ্যে গরু, মহিষ, মেষ, ছাগল, শূকর, অশ্ব প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে এই নানা প্রকার পশুর প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হইবে।

(১) আমাদের দুগ্ধ, মাংস, ডিম প্রভৃতির প্রয়োজন পশু হইতে মিটিয়া থাকে। দুগ্ধ হইতে মাখন, ঘি, ছানা ও নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। গরু, ছাগল ও মহিষ দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে। গরু, মেষ, ছাগল ও শূকর মাংসের জন্যও প্রতিপালিত হয়। মুরগী-হাঁস হইতে ডিম পাইয়া থাকি। ইহা ছাড়া পশুর চামড়া, হাড়, শিং, ক্ষুর ও পশম আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। শীত বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পশম অত্যাবশ্যক। পশুর হাড় দ্বারা চিরুনি, কৌটা এবং চামড়ার দ্বারা ব্যাগ, সুটকেশ, জুতা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। হাড়ের গুঁড়া উত্তম সার।

(২) হস্তী, অশ্ব, গরু, মহিষ ও উট ভারবহনের জন্য এবং শকটাদি চালাইবার জন্যও ব্যবহৃত হয়। গরু, অশ্ব ও মহিষ চাষ আবাদের কাজে লাঙ্গল টানার জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কোন কোন অঞ্চলে পশুই একমাত্র ভার বহনের অবলম্বন। মরুভূমিতে উট, উষ্ণ অঞ্চলের বনাঞ্চলে হস্তী, তুন্দ্রাভূমিতে

বন্য হরিণ, কুকুর, তিব্বতের পার্বত্য অঞ্চলে ইয়াক, দক্ষিণ আমেরিকার পার্বত্য-ভূমিতে লামা ভারবহনের প্রধান জন্তু।

(৩) জল, তৈল ও কয়লা শক্তির উৎস হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের সাহায্যে যন্ত্রাদি পরিচালিত হয় এবং মোটর, রেল, কারখানা চলিয়া থাকে। এতদসত্ত্বেও পূর্বাঞ্চলের মত বর্তমানে গরু, মহিষ, অশ্ব গাড়ী টানা, লাঙ্গল টানা, তেলের ঘানি চালান, কূপ হইতে জল তোলা প্রভৃতি কাজে শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

সুতরাং খাদ্য, পরিবহণ, শক্তি ও কাঁচা মালের প্রয়োজন মিটাইতে যে বিভিন্ন পশুর অবদান যথেষ্ট ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এজন্য পশু শিকার ও পশুপালন মানব সভ্যতার এক উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা।

Q. 2 Describe the principal grazing grounds of the world devoted to animal rearing on a commercial scale, and mention the animals which are mainly reared in those grounds.

(বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য লইয়া ব্যাপকভাবে যে যে অঞ্চলে পশুচারণ ক্ষেত্র আছে তাহাদের বর্ণনা দাও এবং যে সমস্ত পশু ঐ সমস্ত অঞ্চলে প্রতি-পালিত হয় তাহাদের নাম উল্লেখ কর।)

Ans : পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলে তৃণভূমির প্রাচুর্য্য সেই সমস্ত অঞ্চলই সাধারণতঃ পশুচারণ ক্ষেত্র (Grazing grounds) বলিয়া পরিগণিত। তৃণভূমি ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ উভয় অঞ্চলেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত অঞ্চলে জলবায়ুও পশুপালনের উপযোগী। এ অঞ্চলে সাধারণতঃ বৃষ্টিপাত ১৫ —৩০" এবং গ্রীষ্মের উত্তাপ ৭৫ ফাঃ। ইহার যে সমস্ত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম তথায় ছোট ছোট তৃণ জন্মিয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত বেশী বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চলে দীর্ঘ তৃণ জন্মিয়া থাকে। ছোট ছোট তৃণ মেষ ও ছাগল এবং দীর্ঘ তৃণ গরু ও মহিষ পালনের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক। পৃথিবীর যে যে অঞ্চলে তৃণভূমির ও পশুপালনের প্রাচুর্য নিম্নে উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল :

(১) উত্তর আমেরিকা : উত্তর আমেরিকার ১০০ পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখার পশ্চিমের সমভূমি, মালভূমি এবং পর্বতের ঢালু অংশ পশুপালনের বিশেষতঃ গো-মহিষ পালনের পক্ষে উপযুক্ত। উত্তর আমেরিকার 'প্রেইরী' তৃণভূমি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত এবং পশুপালনের উপযুক্ত। এখানে বহু পশু প্রতিপালিত হয়। উহার ভূট্টা অঞ্চলও পশুর পুষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়। মাংসের

জন্য পশু হত্যা করার পূর্বে উহাদিগকে হৃষ্টপুষ্ট করার জন্য ভূট্টা বলয়ে পাঠান হয়। দুগ্ধের জন্য গো-মহিষ বেশীর ভাগ প্রতিপালিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব দিকে। মেষ বেশীর ভাগ যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম দিকের টেক্সাস ও কর্ডিলারা পার্বত্য অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব দিকের অ্যাপেলিশিয়ান অঞ্চলেও কিছু কিছু মেষ প্রতিপালিত হয়। শূকরের প্রাচুর্য্য সাধারণতঃ ভূট্টা বলয়ে। মেক্সিকোর পার্বত্য অঞ্চলে এবং কানাডার তৃণ ও পার্বত্য অঞ্চলে কিছু পশু পালন হয়। তবে যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় উহা খুবই কম।

(২) **দক্ষিণ আমেরিকা**ঃ আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও দক্ষিণ ব্রেজিলের বিস্তৃত 'পাম্পাস' তৃণভূমি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। ইহা গরু, মেষ প্রভৃতি পশু-পালনের খুবই উপযুক্ত। গোমাংস রপ্তানিতে আর্জেন্টিনা পৃথিবীর মধ্যে প্রথম। মেষের সংখ্যার দিক দিয়া বিচার করিলেও ইহার স্থান অষ্ট্রেলিয়া ও রাশিয়ার পরেই। দক্ষিণ দিকের পাটাগোনিয়ার তৃণাঞ্চলে গরু, মেষ, ঘোড়া, খচ্চর ও ছাগল অনেক পশু প্রতিপালিত হয়।

(৩) **অষ্ট্রেলিয়া**ঃ মারে-ডার্লিং অববাহিকার নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের 'ডাউনস' তৃণভূমি পশুপালনের আদর্শস্থল। এখানে গরু ও মেষ উভয়ই প্রতিপালিত হয়। তবে মেষের সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে অষ্ট্রেলিয়াতেই সবচেয়ে বেশী। পশম রপ্তানিতেও অষ্ট্রেলিয়া প্রথম। ইহা ছাড়া দুগ্ধজাত দ্রব্যাদিও প্রচুর রপ্তানি হয়।

(৪) **নিউজিল্যাণ্ড**ঃ নিউজিল্যাণ্ডের ক্যান্ট্যারবেরী সমভূমি অঞ্চল পশু-চারণের উপযুক্ত স্থান। এখানে অনেক মেষ ও গবাদি পশু প্রতিপালিত হয়। দুগ্ধ-জাত দ্রব্যাদি রপ্তানিতে নিউজিল্যাণ্ড বিশেষ প্রসিদ্ধ।

(৫) **আফ্রিকা**ঃ আফ্রিকার সাভানা ও ভেল্ড তৃণভূমি পশুপালনের জন্য প্রসিদ্ধ। সাভানা তৃণভূমিতে গবাদি পশু, মেষ, ছাগল, শূকর, জিরাফ, জেব্রা প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ভেল্ড তৃণভূমি মেষ পালনের জন্যই সমধিক উল্লেখযোগ্য।

(৬) **ইউরোপ**ঃ স্কটল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, রাশিয়া, জার্মানী প্রভৃতি দেশের পার্বত্য অঞ্চলে অনেক গবাদি পশু ও মেষ প্রতিপালিত হয়। হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের সমভূমিতে গোচারণ ভূমির প্রাচুর্য্য আছে। এজন্য এসব অঞ্চলে প্রচুর গবাদি পশু প্রতিপালিত হয়। ইহা ছাড়া সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন, ফ্রান্স এবং ফিনল্যাণ্ডেও অনেক মেষ ও গবাদি পশু প্রতিপালিত হয়। রাশিয়ার 'স্তেপ' তৃণভূমি মেষ ও গবাদি পশুপালনে বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়া আছে;

রাশিয়া, হল্যাণ্ড ও ডেনমার্ক ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য দেশের চাহিদার তুলনায় উহাদের পশুজাত দ্রব্যের উৎপাদন কম। এজন্য বিদেশ হইতে পশুজাত দ্রব্য অনেক আমদানি করিতে হয়।

(৭) এশিয়া: এ বিষয়ে এশিয়ার মধ্যে চীন, জাপান, ভারত ও তুরস্ক উল্লেখযোগ্য। এ অঞ্চলে পশুচারণ ভূমির আধিক্য নাই। তবে পার্বত্য অঞ্চলে ও স্বল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলে অনেক মেষ প্রতিপালিত হয়। অপেক্ষাকৃত বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে গবাদি পশুই বেশী দেখিতে পাওয়া যায় এবং এ বিষয়ে সংখ্যার দিক দিয়া ভারতের স্থান প্রথম। চীন শূকর প্রতিপালনে উল্লেখযোগ্য।

Q. 3. Name the princpal animal products of the world. Give an account of their world distribution.

(বিভিন্ন প্রকার পশুজাতদ্রব্যের নাম কর এবং পৃথিবীব্যাপী উহাদের বণ্টনের বিবরণ দাও।)

Ans. নিম্নে বিভিন্ন প্রকার পশুজাত দ্রব্য এবং উহাদেব পৃথিবীব্যাপী বণ্টনের বিবরণ দেওয়া হইল:

(১) মাংস (Meat): মাংস মানুষের একটি প্রধান খাদ্য এবং উহা বিভিন্ন প্রকার পশু হইতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে গরু, মেষ, ছাগল এবং শূকরের মাংসই বাণিজ্যক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গরু পৃথিবীব মধ্যে তুন্দ্রা অঞ্চল এবং নিরক্ষীয় অঞ্চল ভিন্ন সর্বত্রই অনেক প্রতিপালিত হয়। এজন্য গোমাংস ও (Beef) এতদ অঞ্চলে পাওয়া যায়। সংখ্যার দিক দিয়া বিচাব করিলে ভারতে গরুর সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী। কিন্তু গোমাংস সরবরাহ ও ভক্ষণ সে তুলনায় খুব কম। ভারতে হিন্দুর সংখ্যা বেশী। তাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে না। মুসলমানগণ যাহাদের সংখ্যা ভারতে বেশী নয় তাহারাই গোমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। এজন্য দেশের অভ্যন্তরে চাহিদা মিটানোর জন্য এই মাংস সরবরাহ হয়। ভারত গোমাংস রপ্তানি করে না। ভারতের পর গরুর সংখ্যা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বেশী এবং দেশের মধ্যে চাহিদার জন্য গোমাংসও প্রচুর উৎপাদন করিয়া থাকে। তবে আভ্যন্তরীণ চাহিদা বেশী থাকায় খুব বেশী রপ্তানি করিতে পারে না। ইহার চিকাগো, সেণ্টলুই, সেণ্ট পলস প্রভৃতি গোমাংস উৎপাদন ও ব্যবসায়ে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা গোমাংস উৎপাদনে সবিশেষ বিখ্যাত। স্থানীয় চাহিদা কম থাকায় আর্জেণ্টিনা গোমাংস রপ্তানিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহা ছাড়া দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল ও উরুগুয়ে গোমাংস উৎপাদনে

ও রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য। **ইউরোপে** তৃণভূমির সেরূপ প্রাচুর্য্য না থাকায় গোমাংস উৎপাদন চাহিদার তুলনায় কম। এজন্য এই মহাদেশের অনেক দেশই বিদেশ হইতে ইহা আমদানি করিয়া থাকে। **অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ড** এবং **নিউসাউথ ওয়েলসেই (সাভান অঞ্চলে)** বেশী গরু প্রতিপালিত হয়। স্থানীয় চাহিদা কম বলিয়া ইহা গোমাংস রপ্তানিও করিয়া থাকে। এখানে তিনচতুর্থাংশ মাংসের জন্য এবং এক চতুর্থাংশ দুগ্ধজাত দ্রব্যের জন্য গবাদিপশু প্রতিপালিত হয় নিউজিল্যাণ্ডেও গোমাংস উৎপাদন হয় এবং এখান হইতে উহা বিদেশে রপ্তানি হয়। **রাশিয়াতে** অনেক গবাদি পশু প্রতিপালিত হয় এবং স্থানীয় চাহিদার জন্য গোমাংস বিদেশে বেশী রপ্তানি হয় না।

গোমাংস আমদানিতে বৃটেন, ইতালি, স্পেন, বেলজিয়াম, জার্মানী প্রভৃতি দেশ উল্লেখযোগ্য।

মেষ মাংস (mutton) উৎপাদনে এবং রপ্তানিতে অষ্ট্রেলিয়া প্রথম। এখানে মেষের সংখ্যাও সর্বাধিব। মেষ মাংস উৎপাদনে ও রপ্তানিতে অন্যান্য দেশেব মধ্যে আর্জেন্টিনা, নিউজিল্যাণ্ড, উরুগুয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শূকর মাংস (Pork) উৎপাদনে, **চীন, যুক্তরাষ্ট্র**, কানাডা, **আর্জেন্টিনা** ও **ইউরোপের** বিভিন্ন দেশ উল্লেখযোগ্য। উহা রপ্তানিতে যুক্তরাষ্ট্র, ও আর্জেন্টিনা ও অষ্ট্রেলিয়া উল্লেখযোগ্য। ইউরোপে ইহা প্রচুর উৎপন্ন হইলেও স্থানীয় চাহিদা পূরণ করিতে পারে না। এজন্য ইহারা বিদেশ হইতে ইহা আমদানি করিয়া থাকে।

দুগ্ধজাত দ্রব্য (Dairy Produce): গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ, প্রভৃতি হইতে দুগ্ধ পাওয়া গেলেও পৃথিবীর অধিকাংশ দুগ্ধ পাওয়া যায় গরু ও মহিষ হইতে। কিন্তু সংখ্যা অনুযায়ী দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্য গরু ও মহিষ হইতে পাওয়া যায় না। ভারতে গো-মহিষের সংখ্যা সর্বাধিক হইলেও দুগ্ধ উৎপাদন সে তুলনায় খুব কম। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য যেমন মাখন, ঘি, পনীর, জমাট দুগ্ধ, গুঁড়াদুগ্ধ ইত্যাদি উৎপাদনে আমেরিকার **যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আয়র্ল্যাণ্ড, সুইডেন, জার্মানী, ফিনল্যাণ্ড** ও **রাশিয়া** সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার **রপ্তানি** বাণিজ্যে **যুক্তরাষ্ট্র**, অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, নিউজিল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও হল্যাণ্ড বিখ্যাত। ডেনমার্কের রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ দুগ্ধজাত দ্রব্য অধিকার করে। ইহার সমবায় সমিতি দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবসায়ে বিশ্ব বিখ্যাত। ডেনমার্কের মাখন ও হল্যাণ্ডের পনীর বিখ্যাত। ডেনমার্কের মোট দুগ্ধের শতকরা ৮০ ভাগ মাখন উৎপাদনে

ব্যবহৃত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুগ্ধ উৎপাদনে দ্বিতীয় এবং পনীর উৎপাদনে প্রথম।

(৩) **পশম (wool) :** মেষ, ছাগল, উট, আলপাকা, লামা প্রভৃতি হইতে পশম পাওয়া যায়। কিন্তু মেষ হইতেই সর্বাধিক পশম পাওয়া যায়। অন্যান্য পশু ইহার উৎপাদনে মেষ অপেক্ষা অনেক পিছনে। তবে উৎকর্ষের দিক দিয়া ছাগ-লোম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পশম উৎপাদনে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আর্জেণ্টিনা, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, উরুগুয়ে, ভারত ও চীন উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়াতেই সর্বাধিক পশম উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় তৃতীয়াংশ। মেরিনো মেষ হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পশম পাওয়া যায়। তুরস্কের এঙ্গোরা ছাগল এবং তিব্বতের ও কাশ্মীরের ছাগলও উৎকৃষ্ট পশম উৎপাদনে বিখ্যাত। রপ্তানি বাণিজ্যে অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেণ্টিনা, যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আফ্রিকা উল্লেখযোগ্য। আমদানিতে ভারত, বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জাপান, ইতালি ও জার্মানী উল্লেখযোগ্য।

(৪) **অন্যান্য দ্রব্য (Other products) :** অন্যান্য পশুজাত দ্রব্যের মধ্যে চামড়া, হাড, শিং, চর্বি, খুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহারা মানুষের বিভিন্ন কাজে লাগিয়া থাকে। গবাদি পশুর চামড়া উৎপাদনে আর্জেণ্টিনা, উরুগুয়ে, রাশিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, ছাগচর্ম উৎপাদনে ভারত, চীন, স্পেন, ব্রেজিল, এবং মেষচর্ম উৎপাদনে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাতীর দাঁত একটি মূল্যবান দ্রব্য এবং উহা ভারত ও আফ্রিকা হইতে বেশী পাওয়া যায়। অন্যান্য পশুজাত দ্রব্যাদিও উপরিউক্ত দেশগুলিতে পাওয়া যায়।

(৫) **পাখীর ডিম ও মাংস (Eggs and Meat of Birds) :** মুরগী, হাঁস প্রভৃতি গৃহপালিত পাখী হইতে ডিম ও মাংস বেশী সংগ্রহ হয়। ইহা পৃথিবীর সর্বত্র কম বেশী পাওয়া যায় এবং আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যেও বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে।

Q 4. What is Dairy Farming ? Describe the geographical conditions best suited for dairy farming and meat packing industries.

(দুগ্ধসংক্রান্ত শিল্প ব্যবসায় কাহাকে বলে ? দুগ্ধসংক্রান্ত শিল্পব্যবসায় এবং মাংস সংরক্ষণ শিল্পের জন্য যে ভৌগোলিক অবস্থা উপযুক্ত তাহা বর্ণনা কর।)

Or

What are the geographical and economic conditions for the development of Dairy industry? Mention the countries which have specialised in this industry. Give a brief account also of the world trade in Dairy products.

(দুগ্ধসংক্রান্ত শিল্পের জন্য কি ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা প্রয়োজন? যে সমস্ত দেশ ইহাতে বিশেষজ্ঞ তাহা উল্লেখ কর। দুগ্ধজাত দ্রব্যের আন্তর্জাতিক ব্যবসার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।)

Ans: গবাদি পশুপালন, উহা হইতে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন এবং তৎসংক্রান্ত ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনকে দুগ্ধসংক্রান্ত শিল্প ব্যবসা (Dairy Farming বা Industry) বলা হয়।

গবাদি পশুপালন ও মাংস সংরক্ষণ শিল্পের জন্য যে ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা প্রয়োজন নিম্নে উহাদের পরিচয় প্রদত্ত হইল:

১। গ্রীষ্মকালে পরিমিত (১৫"—৩০") বৃষ্টিপাত যাহাতে দীর্ঘ ও পুষ্টিকর তৃণ জন্মাইতে পারে। কারণ গবাদি পশুর জন্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তৃণ প্রয়োজন। উক্ত তৃণ জন্মানের জন্য আর্দ্র দোয়াশ মৃত্তিকাও আবশ্যক।

২। মৃদু শীতকাল। ইহাতে গবাদি পশু নিশ্চিন্ত মনে সারাবৎসরে তৃণভূমিতে চরিয়া বেড়াইতে পারে।

৩। শীত ও গ্রীষ্মের প্রখরতা কম হইলে পশুর বৃদ্ধি, পুষ্টি এবং অধিক পরিমাণ দুগ্ধ দান করার ক্ষমতা জন্মে। এজন্য নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু বিশেষ প্রয়োজন।

৪। দুগ্ধ যাহাতে অল্পসময়ের মধ্যে পচিয়া না যায় তৎজন্যও যেমন নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু প্রয়োজন, অন্যপক্ষে হিমাগার এবং দ্রুত পরিবহনের সুযোগ থাকা অত্যাবশ্যক।

৫। ভূপ্রকৃতি কৃষিকার্যের প্রতিকূল হইলে এবং অন্যান্য অবস্থা অনুকূল থাকিলে গবাদি পশুপালন উন্নতিলাভ করিতে পারে।

৬। দুগ্ধ উৎপাদনকারী অপেক্ষা মাংস উৎপাদনকারী পশুর দেহের পুষ্টি অধিক প্রয়োজন। এজন্য ভুট্টা বা তৎজাতীয় শস্য দৈহিক পুষ্টির জন্য এবং মাংসল চেহারার জন্য খাদ্য হিসাবে প্রয়োজন। সুতরাং যে সমস্ত অঞ্চলে ভুট্টা এবং ভুট্টাজাতীয় শস্যের আবাদ বেশী হয় তথায় মাংস উৎপাদনকারী পশু পালন অপেক্ষাকৃত

সুবিধাজনক। ইহা ছাড়া শিল্পের উপযোগী শ্রমিক, যন্ত্রপাতি, চাহিদা, পরিবহনের সুবিধা প্রভৃতিও প্রয়োজন।

উপরি উক্ত সুবিধা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অধিকমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য উক্ত অঞ্চলেই দুগ্ধ ও মাংস প্রাপ্তির উপযুক্ত গবাদি পশু অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। যে সমস্ত দেশ এই শিল্পে অগ্রগতি লাভ করিয়াছে এবং ইহাতে বিশেষজ্ঞ তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত দেশগুলি উল্লেখযোগ্য।

(১) **ইউরোপের** মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশ হইতেছে ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, জার্মানী, বৃটেন সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া। গাভী প্রতি দুগ্ধের উৎপাদন এ সমস্ত দেশে অপেক্ষাকৃত বেশী। রাশিয়াতে গড়ে প্রতি গাভী হইতে ১৯১৩ কিলোগ্রাম দুগ্ধ পাওয়া যায়, রাষ্ট্রীয় খামারে দুগ্ধের পরিমান আরও বেশী—প্রায় ২৭০০ কিলোগ্রাম। ইহা ছাড়া এই মহাদেশের বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন প্রকার দুগ্ধজাতদ্রব্য উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। যেমন ডেনমার্কে মাখন, হল্যাণ্ডে পনীর ইত্যাদি। ডেনমার্কে শতকরা ৮০ ভাগ দুগ্ধ হইতে মাখন তৈয়ারী হয়। মাখন উৎপাদনে ইহা পৃথিবীতে প্রথম। ইহার রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ দুগ্ধজাত্য দ্রব্য। রাশিয়া পৃথিবীর মধ্যে দুগ্ধ উৎপাদনে প্রথম ও মাখন উৎপাদনে দ্বিতীয়। জার্মানী দুগ্ধ উৎপাদনে তৃতীয় এবং মাখন উৎপাদনে চতুর্থ। হল্যাণ্ড পনীর উৎপাদনে

(২) **উত্তর আমেরিকার** যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে পনীর উৎপাদনে প্রথম এবং দুগ্ধ উৎপাদনে দ্বিতীয় ও মাখন উৎপাদনে তৃতীয়। ইহার বিস্তৃত প্রেইরি তৃণভূমি এবং ভুট্টাবলয় মাংস ও দুগ্ধ শিল্পোন্নয়নে প্রসিদ্ধ। কানাডাও এ শিল্পে কিছুটা অগ্রগতি লাভ করিয়াছে।

(৩) **অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড:** ইহাদের বিস্তৃত তৃণভূমি এবং বিরল বসতি গবাদি পশু পালন এবং দুগ্ধজাত শিল্প উন্নয়নে সাহায্য করিয়াছে। এখানে গাভীপ্রতি দুগ্ধের উৎপাদনও বেশী। স্থানীয় চাহিদা কম বলিয়া ইহারা নানা প্রকার দুগ্ধজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করিয়া থাকে।

(৪) **দক্ষিণ আমেরিকার** আর্জেণ্টিনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৫) **ভারত, চীন ও জাপানে** অনেক গবাদি পশু আছে। ভারত গবাদি পশুর সংখ্যায় পৃথিবীর মধ্যে প্রথম, কিন্তু দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে পশ্চাৎপদ। চীন ও জাপানেও উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম।

দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি রপ্তানিতে যুক্তরাষ্ট্র, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, অষ্ট্রেলিয়া,

নিউজিল্যাণ্ড, কানাডা, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। **আমদানিকারক** দেশগুলি মধ্যে বৃটেন, ভারত, জাপান, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

Q 5. Describe the geographical and other circumstances favouring the growth, manufacture and export of wool.

(পশম উৎপাদন, শিল্প ও রপ্তানি সম্বন্ধে যে ভৌগোলিক ও অন্যান্য অনুকূল অবস্থা প্রয়োজন তাহা বর্ণনা কর।)

Or

State the condition of success in the production of commercial wool. Name the principal wool producing countries of the world and its world trade

(বাণিজ্য-উপযোগী পশম উৎপাদনের উপযুক্ত অবস্থা বল। প্রধান প্রধান পশম উৎপাদক দেশগুলির নাম এবং পশমের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বর্ণনা কর।)

Or

State the geographical conditions that are suitable for sheep rearing. Name the important sheep rearing countries of the world.

(মেষপালনের উপযুক্ত ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা কর। পৃথিবীর প্রধান প্রধান মেষপালক দেশগুলির নাম উল্লেখ কর।)

Ans. বাণিজ্যের উপযোগী অধিকাংশ পশম মেষ হইতে পাওয়া যায়। আবার মেষের আধিক্য যেখানে বেশী পশম উৎপাদনের পরিমাণও সেখানে তত বেশী। সুতরাং বাণিজ্য উপযোগী পশম উৎপাদনে বা মেষপালনের উপযোগী অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থা বলিতে একই জিনিস বুঝাইয়া থাকে। নিম্নলিখিত ভৌগোলিক অবস্থাগুলি পশম উৎপাদন ও মেষ পালনের উপযোগী :

১। মেষ পালনের উপযুক্ত অবস্থা **শুষ্ক** ও শীতল জলবায়ু। বৃষ্টিপাত ১৫—৩০' এবং উত্তাপ ৬০-৭০ মেষ পালনের পক্ষে উৎকৃষ্ট। এরূপ জলবায়ু মেষের পশম বৃদ্ধির সহায়ক। পশমও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়।

২। অধিক বৃষ্টিপাত মেষ চারণের পক্ষে অনুপযুক্ত। ইহাতে মেষ চারণভূমিতে ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে পারে না এবং হৃষ্টপুষ্ট ও পশম বহুল হইতে পারে না। ফলে **উষ্ণ অঞ্চলে এবং বৃষ্টি বহুল অঞ্চলের পশম ক্ষুদ্র ও কর্কশ হয়।**

৩। ছোট ছোট ঘাসযুক্ত বিস্তৃত চারণভূমি মেষ পালনের পক্ষে উপযুক্ত। যত অধিক সংখ্যক মেষ একসঙ্গে চরিতে পারে, ব্যবসার দিক ততই লাভবান হওয়ার সুযোগ হয়। নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি যথা স্তেপস, প্রেইরী, পাম্পাস, ডাউনস প্রভৃতি এজন্য মেষ পালনের উৎকৃষ্ট স্থান। এখানে একসঙ্গে শত শত মেষ চরিয়া বেড়াইতে পারে এবং বেড়াইয়া থাকে।

৪। পাহাড়ের ঢাল এবং উচ্চ মালভূমিও মেষ পালনের উপযুক্ত স্থান। এ অঞ্চলেব মেষ হইতেও ভাল পশম পাওয়া যায়। কাশ্মীর ও তিব্বতের মালভূমি, বৃটেনের খড়ি পাহাড়, আল্পসের উচ্চভূমি, স্পেনের উচ্চভূমি ও আফ্রিকার ভেল্ড এজন্য উৎকৃষ্ট মেষ পালন অঞ্চল।

৫। অতিরিক্ত শীতল আবহাওয়া মেষ পালনের পক্ষে উপযুক্ত নয়। এজন্য উক্ত গোলার্ধের অধিক শীতযুক্ত নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অপেক্ষা দক্ষিণ গোলার্ধের নাতিশীতযুক্ত তৃণভূমি মেষ পালনের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ।

৬। চুনাপাথরযুক্ত মাটি মেষ পালনেব পক্ষে উপযোগী।

৭। পশমের উৎকর্ষ মেষের শ্রেণী ভেদের উপরও নির্ভর করে। (ক) মেরিনো মেষ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল পশম পাওয়া যায়। এ জাতীয় মেষ অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন প্রভৃতি দেশে অধিক প্রতিপালিত হয়। (খ) মিশ্র জাতীয় মেষ পশম ও মাংস উভয়ই সমভাবে পাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিপালিত হয়। ইহাদের পশম দীর্ঘ আঁশযুক্ত হইলেও মোটা। সূক্ষ্মতা, কোমলতা ও উজ্জ্বলতার দিক দিয়া মেরিনো মেষের পশম হইতে ইহা নিকৃষ্টতর। এ জাতীয় মেষও অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, পেরু, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পালিত হয়। (গ) তৃতীয় শ্রেণীর মেষ হইতে কর্কশ, মোটা ও ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত পশম পাওয়া যায়। ইহা রাশিয়া, এশিয়া, এবং উত্তর আফ্রিকায় বেশী পালিত হয়। ইহা প্রধানতঃ গালিচা প্রস্তুতের পক্ষে উপযোগী।

আবার অল্প বয়স্ক (সাধারণতঃ ৭ মাস বয়সের) মেষের গাত্র হইতে যে পশম কাটিয়া লওয়া হয় তাহাই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হইয়া থাকে। মেষ ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার এঙ্গোরা ছাগল হইতে সূক্ষ্ম, দৃঢ় ও উজ্জ্বল 'মোহের' পশম, তিব্বত, দক্ষিণ চীন, কাশ্মীর হইতে কাশ্মীর ছাগলের সূক্ষ্ম ও কোমল পশম, মরুভূমি অঞ্চলের উটের পশম, দক্ষিণ আমেরিকার ভাইকুনা বন্যজীবের এবং আলপাকা, লামা ও গুয়ানাকো প্রভৃতি জন্তুর পশমও পাওয়া যায় এবং ইহারাও ব্যবসাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

পৃথিবীতে মেষের সংখ্যা প্রায় ১০০ কোটি। উহাদের সংখ্যা বিভিন্ন দেশে সাধারণতঃ নিম্নরূপ দেখিতে পাওয়া যায় :

অষ্ট্রেলিয়া	১৪ কোটি	দক্ষিণ আফ্রিকা	৩ কোটি
রাশিয়া	১০ "	ভারত	৫ "
আর্জেন্টিনা	৬ "	বৃটেন	২ "
যুক্তরাষ্ট্র	৫ "	চীন	২½ "
নিউজিল্যাণ্ড	৩ "	উরুগুয়ে	২½ "

পৃথিবীতে মোট পশম উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২৫ লক্ষ মেঃ টন। উহার উৎপাদন বিভিন্ন দেশে সাধারণতঃ ; নিম্নরূপ :

অষ্ট্রেলিয়া	৭.৩৩ লক্ষ মেঃ টন	আর্জেন্টিনা	১.৯২ লক্ষ মেঃ টন
রাশিয়া	৩.৫১ " " "	যুক্তরাষ্ট্র	১.৪৭ " " "
নিউজিল্যাণ্ড	২.৬৭ " " "	দক্ষিণ আফ্রিকা	১.৩৩ " " "

পশম বাণিজ্য নিম্নরূপ :

উত্তর গোলার্ধ পশম শিল্পে উন্নত। দক্ষিণ গোলার্ধ পশম উৎপাদনে উন্নত। নিম্নে কয়েকটি দেশের আমদানি ও রপ্তানির মোটামুটি হিসাব দেওয়া হইল :

রপ্তানি কারক দেশ	পরিমাণ	আমদানিকারক দেশ	পরিমাণ
অষ্ট্রেলিয়া	৬.০৭ লক্ষ মেঃ টন	বৃটেন	২.৯৩ লক্ষ মেঃ টন
নিউজিল্যাণ্ড	২.৩৭ " " "	জাপান	১.৮৯ " " "
আর্জেন্টিনা	১.৩৯ " " "	ফ্রান্স	১.৭০ " " "
দক্ষিণ আফ্রিকা	১.১১ " " "	যুক্তরাষ্ট্র	১.৩১ " " "

Q. 6. Describe briefly the problems of India's Live-stock. What is the position of India in her hides and skins trade ?

(ভারতের গোমেষাদি গৃহপালিত পশুর সমস্যা বর্ণনা কর। চামড়ার ব্যবসায় ভারতের অবস্থা কিরূপ ?)

Ans : ভারতের গো-মেষাদি গৃহপালিত পশুর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। তাহাদের সমস্যা নিম্নে বর্ণিত হইল :

(১) **গো-মহিষাদি (Cattle) :** ভারতে গো-মহিষাদির সংখ্যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী। পৃথিবীতে প্রায় ৭০ কোটি গো-মহিষাদি পশু আছে। তন্মধ্যে ভারতের সংখ্যা প্রায় ২০ কোটি (১৬ কোটি গরু এবং ৪ কোটি মহিষ)।

ভারতে এ সমস্ত জন্তু চাষের লাঙ্গল টানা, গাড়ী টানা, কূপ হইতে জল তোলা প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া দুধের জন্যও গো-মহিষ প্রতিপালিত হয়। ভারতের সর্বত্রই কমবেশী গো-মহিষ আছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা সর্বদিক দিয়াই শোচনীয়। ইহাদের দুধ দেওয়ার ক্ষমতা এবং অন্যান্য কাজে ইহাদের নিপুণতা অন্য অনেক দেশ হইতে কম। নিউজিল্যাণ্ডে প্রতি গরু হইতে উহার দুগ্ধদানকালে (per lactation period) ৭০ মণ দুধ পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গরু হইতে পাওয়া যায় গড়ে মাত্র ২০ মণ। ইহাদের সংখ্যাও বেশী নয়। সাধারণ গরু ইহা অপেক্ষা অনেক কম দুধ দেয়। ১৯৬১ সালে ভারতে মোট দুধের উৎপাদন ছিল ২২০ লক্ষ টন। ভারতের গরুগুলির মধ্যে পাঞ্জাবের হরিয়ানা গরু নামকরা। ইহা ছাড়া উত্তর গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, উত্তর প্রদেশ, মহীশূর ও মহারাষ্ট্রেও কিছু ভাল জাতীয় গরু আছে। গরু অপেক্ষা মহিষের দুধ দেওয়ার ক্ষমতা অনেক বেশী। মহিষের অবস্থা গরু অপেক্ষা কিছু ভাল। মোটের উপর ইহাদের উভয়ের অবস্থা আশানুরূপ নহে। ইহার কারণ খাদ্যের অভাব, তৃণভূমির অভাব এবং নিকৃষ্ট প্রজনন। ভূমির উপর লোকের চাপ বেশী বলিয়া গো-মহিষের খাদ্যাভাব ঘটিতেছে। কলিকাতার নিকটে হরিণঘাটা এবং বোম্বাইয়ের নিকট অঞ্চল ছাড়া গো-পালন ও দুগ্ধ শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই।

অন্যান্য পশু (other animals): ভারতে প্রায় ৪ কোটি মেষ আছে, কিন্তু উহাদের মাংস এবং ভাল পশম দেওয়ার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ভারতীয় মেষ অষ্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে অনেক নিকৃষ্ট এবং গড়ে প্রতি মেষ হইতে মাত্র ২ পাউণ্ড পশম পাওয়া যায়। মেষচারণ উপযোগী ভাল তৃণভূমির অভাব, নিকৃষ্ট প্রজনন এবং মেষ পালনে অবহেলাই ইহার জন্য দায়ী। ভারত গড়ে প্রায় ৩৬ কোটি পাউণ্ড পশম রপ্তানি করিয়া থাকে। ভারতীয় পশম অধিকাংশ ছোট আঁশযুক্ত, মোটা ও কর্কশ।

ছাগলের সংখ্যাও প্রায় ৫½ কোটি। ছাগল হইতে দুধ, চামড়া, মাংস ও পশম পাওয়া যায়। কাশ্মীরী ছাগলের পশম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। ইহা ছাড়া ছাগলের পশম কমই ব্যবহৃত হয়।

ভারতে ঘোড়া ও খচ্চরের সংখ্যা ২০ লক্ষ, উটের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ এবং শূকরের সংখ্যা প্রায় ৩৬ লক্ষ। কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই বিশেষ ভাল জাতের নয়। ভারতে হাঁস ও মুরগী বহু প্রতিপালিত হয়। উহাদের ডিম ও মাংস উল্লেখযোগ্য।

ভারতে যে দুগ্ধ উৎপাদন হয়, তাহাতে গড়ে প্রতি লোকের ভাগে ৫ আউন্সের বেশী পড়ে না। পুষ্টিকারিতার জন্য উহার পরিমাণ অন্ততঃ ১৫ আউন্স হওয়া উচিত। দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদনও আশানুরূপ নহে। বর্তমানে খাঁটি মাখন, ঘি প্রভৃতি পাওয়া এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

মাখন উৎপাদনের জন্য আগ্রা, আলিগড়, বোম্বাই, কলিকাতা এবং ঘি উৎপাদনের জন্য পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান উল্লেখযোগ্য। ভারতে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ১.৪ কোটি মণ ঘি প্রস্তুত হয়।

গো-মেষাদির চামড়া উৎপাদনও ভারতে কম নয়—প্রায় ২ কোটি খণ্ড। উহার মধ্যে ছাগ-মেষ হইতে পাওয়া যায় প্রায় ৩৭ লক্ষ খণ্ড। মোট উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ কাঁচা ও ট্যান করার পর বিদেশে রপ্তানি হয়। যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইরাক, ইরাণ, রাশিয়া, সুইডেন, চেকোশ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়। কাঁচা চামড়ার রপ্তানি মূল্য ৭ কোটি টাকা ও ট্যান করা চামড়া রপ্তানি মূল্য ২১ কোটি টাকার উপরে। ভারত কিছু ট্যান করা ও কাঁচা চামড়া আমদানিও করিয়া থাকে। আমদানি মূল্য যথাক্রমে ৮.৫ লক্ষ টাকা এবং ১.২০ কোটি টাকার মত।

সপ্তম অধ্যায়

খনিজ ও শক্তি সম্পদ

(Mineral and Power Resources)

Q. 1. Write a short essay on the role of minerals in the economic development of a country. (B.U. Entrance, 1961)

(দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে খনিজ সম্পদের কাজ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ।)

Ans ভূগর্ভের শিলাস্তরে নানাবিধ খনিজ সম্পদ লুক্কায়িত আছে। ইহাদিগকে আবিষ্কার করা, আহরণ করা ও বিভিন্ন কাজে লাগান বর্তমান মানব সভ্যতার বিশেষ লক্ষণ। মানুষের জীবন ধারণের উপযোগী আহার, বাসস্থান ও পরিধেয় দ্রব্যাদি খনিজ সম্পদ আহরণ ভিন্নও সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু মানুষের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সে আর সামান্য আহার, বাসস্থান ও পরিধেয় লইয়াই সন্তুষ্ট নহে। মানুষের জীবনযাত্রার মান ক্রমশঃ উন্নতির দিকে যাইতেছে। আমাদের বিভিন্নমুখী অভাব এবং অর্থ নৈতিক উন্নতিলাভ করিতে হইলে খনিজ সম্পদ আহরণ বর্তমান সভ্যতায় অপরিহার্য। কারণ মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও শিল্প বাণিজ্যের অগ্রগতি অনেক খনিজ সম্পদের উপর নির্ভর করে।

খনিজ সম্পদ যে বর্তমান সভ্যতারই অপরিহার্য্য বস্তু একথা বলিলে খনিজ সম্পদের গুরুত্ব লাঘব করা হয়। খনিজ সম্পদ আদিমকাল হইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তবে উহার ব্যাপকতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। মানুষ প্রথমে প্রস্তরের ব্যবহার শিখে। তখন প্রস্তর তাহার শিকারের অস্ত্র ও অগ্নি উৎপাদনের বস্তু ছিল। ইতিহাসে উহা প্রস্তর যুগ বলিয়া খ্যাত। তাহার পর আসে তাম্রের ব্যবহার এবং তাম্রযুগ। তাম্রের পরে টিনের ব্যবহারও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর আসে তাম্র ও টিন মিশ্রিত ব্রোঞ্জযুগ। ব্রোঞ্জ হইতে প্রস্তুত কৃষিযন্ত্র, যুদ্ধাস্ত্র, শিলমোহর প্রভৃতির অনেক নিদর্শন আমাদের প্রাচীন হিন্দুসভ্যতায় পাওয়া যায়। এইভাবে ক্রমে বহুপ্রকার খনিজদ্রব্য যেমন লৌহ, কয়লা, পেট্রোলিয়াম, সীসা, দস্তা, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, অভ্র, এ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতির ব্যবহার আরম্ভ হয়। ইহা ছাড়া স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক প্রভৃতি মূল্যবান খনিজ সম্পদের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারও মানুষ শিখিল। মানুষের নিত্যনূতন প্রয়োজন ও অভাববোধ যতই বাড়িতেছে দুঃসাহসিক

অভিযানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াও বিভিন্ন খনিজ সম্পদ আহরণে সে ততই অগ্রসর হইতেছে।

কৃষিজ, বনজ ও প্রাণীজ সম্পদের ন্যায় খনিজ সম্পদের অবস্থান জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল নয়। অপ্রীতিকর, অস্বাস্থ্যকর বা মরুপ্রকৃতির জলবায়ু বিশিষ্ট অঞ্চলে বা দুর্গমস্থানেও খনিজ সম্পদের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ শীতল আলাস্কার, মরুময় পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার, দুগম অরণ্যসমাচ্ছন্ন দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণখনি, মরুময় চিলির নাইট্রেট খনি, মরুময় আরবের তৈলখনি, অস্বাস্থ্যকব ও দুর্গম কাটাঙ্গা ও রোডেশিয়ার তাম্রখনি প্র-তি উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সমস্ত অঞ্চলের প্রতিকূল অবস্থা মানুষের সর্বজয়ী প্রতিভা ও উদ্যমের ফলে খনিজ সম্পদ আহরণে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে পারে নাই। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের অধিবাসীরা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও খনিজ সম্পদের লোভে ঐ সমস্ত অঞ্চলে উহা আহরণে লিপ্ত হয় এবং উপনিবেশ স্থাপন করে। অনেক দেশ আবার এই খনিজ সম্পদের অবস্থানের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছে। 'Gold mines are the backbone of South Africa'—goes the saying অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকার মেরুদণ্ড অন্য কথায় সমৃদ্ধি স্বর্ণখনির জন্যই সম্ভব হইযাছে। সৌদি-আরবের মরুভূমির অধিপতিগণ উক্ত অঞ্চলেব খনিজ তৈল আবিষ্কারেব পূর্বে অত্যন্ত দরিদ্রভাবেই জীবনযাপন করিত। সামান্য পশুপালন অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা ছিল। কিন্তু তৈল সম্পদ আবিষ্কারের ফলে উহাবা বিশেষ ধনবান হইতে পারিযাছেন এবং অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানও অনেকটা উন্নত হইতে পারিয়াছে। কঙ্গোর নিরক্ষীয় অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু সত্বেও উহার তামা, হীবক, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি খনিজ সম্পদের দিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দৃষ্টি পডিয়াছে। এই খনিজ সম্পদের জন্যই উহা আর অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ নহে। এইভাবে ভেনিজুয়েলার তৈলখনি, চিলিব নাইট্রেট্ খনি প্রভৃতি উহাদের অর্থ-নৈতিক উন্নতির পথ সুগম করিয়াছে।

আমাদের দেশের দাক্ষিণাত্যের মালভূমির অনেকস্থান পাহাড ও বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন। কিন্তু এ অঞ্চল লৌহ, কয়লা, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি নানাবিধ খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ। এই খনিজ সম্পদের জন্যই জামসেদপুর, ভিলাই, দুগাপুর, রুঢ়কেলা প্রভৃতি স্থানে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে। জনবিরল অঞ্চল জনবহুল হইয়া পডিয়াছে এবং অন্যান্য শিল্পও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে। সুতরাং খনিজ সম্পদ দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য্য যেমন অর্থ নৈতিক উন্নতির পরম সহায়ক, কোন অঞ্চলের খনিজ সম্পদ আবার নিঃশেষ হইলে বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়। পৃথিবীতে খনিজ

সম্পদের অবস্থান ও পরিমাণ সীমাবদ্ধ। একবার উত্তোলিত হইলে মানুষ উক্ত শূন্যস্থান খনিজ সম্পদ দ্বারা পূরণ করিতে পারে না। এ কারণে যে সমস্ত স্থানের খনিজ উত্তোলন শেষ হইয়া পড়ে সে সমস্ত স্থান লোকজন পরিত্যক্ত হয় এবং পুনরায় উহা দুর্গম অরণ্যাচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের অনেকস্থান এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সমস্ত স্থানের খনিজ আহরণ শেষ হইয়া যায় সে সমস্ত স্থানের ভূমিভাগও অনুর্বর হইয়া পড়ে। ফলে কৃষিকার্য্য বা অন্যবিধ কাজের আকর্ষণ আর এখানে থাকে না।

খনিজ সম্পদের আহরণ ও ক্ষয় দ্রুতবেগেই চলিতেছে। যেমন আমাদের দেশের উন্নত শ্রেণীর কয়লার যেভাবে উত্তোলন ও ব্যবহার চলিতেছে তাহাতে হয়ত ৫০ বৎসরের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যাইবে। যখন নানাবিধ খনিজ সম্পদের এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইবে তখন হয়তো মানুষকে উহার উপর নির্ভর না করিয়াই চলিতে হইবে। কিন্তু বর্তমান সভ্যতা খনিজ সম্পদের সভ্যতা একথা বলা চলে এবং ইহাই দেশের অর্থ-নৈতিক মান নির্ণয় করিতেছে।

Q 2. In the modern age coal and iron are more valuable than gold and diamond." Do you agree with this view? Give examples in support of your answer.

(বর্তমান যুগে স্বর্ণ ও হীরক অপেক্ষা কয়লা ও লৌহ অধিক মূল্যবান তুমি কি এ সম্বন্ধে একমত? তোমার উত্তরের সমর্থনে উদাহরণ দাও।)

Ans : লৌহ একটি প্রয়োজনীয় ধাতু। ইহার ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল হইতে হইয়া আসিতেছে। ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি যে মানুষ তাহার প্রয়োজনে প্রথমতঃ প্রস্তর ব্যবহার করিত। তখনকার মানুষদের বলা হইত প্রস্তরযুগের মানুষ। তাহার পর আসে তাম্রযুগ, ব্রোঞ্জযুগ প্রভৃতি। উহার সর্বশেষে আসে লৌহের ব্যবহার বা লৌহ-যুগ। লৌহযুগের আরম্ভও খুব প্রাচীন। বর্তমান যুগকে আমরা লৌহযুগই আখ্যা দিতে পারি যদিও লৌহের পরিবর্তে এ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার অনেকক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। লৌহযুগকে অন্যকথায় কলকব্জার ও যন্ত্রপাতির যুগও বলিতে পারি। বর্তমান মানব সভ্যতার ইহা ছাড়া চলা কঠিন। আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দা, কুঠার, হাতা, কড়াই ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া যন্ত্রপাতি, গৃহ, রেলগাড়ী, মোটর, জাহাজ প্রভৃতি নির্মাণে লৌহ একান্ত প্রয়োজনীয় ধাতু। ইহা একাধারে আমাদের বিভিন্ন দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইতেছে এবং অন্যদিকে মানুষের শ্রমের লাঘব করিতেছে এবং জীবনযাত্রা সহজ, সরল ও সুন্দর করিতেছে। ইহা হইতে তৈয়ারী যন্ত্রপাতি কেবল মানুষের শ্রম লাঘবই করিতেছে

না, ইহা কায়িক শ্রমের পরিবর্তেও ব্যবহৃত হইতেছে। আমাদের দেশে একজন শ্রমিক গরু ও লাঙ্গলের সাহায্যে যাহা করিতে পারে উন্নত দেশগুলিতে কলের লাঙ্গল দিয়া অনেকগুণ বেশী কাজ করিতে পারে।

কিন্তু যে লৌহদ্বারা আমাদের এই বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি, বাড়ীঘর, জাহাজ, রেলপথ ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে উহা খনি হইতে আহরণ করা হয়। খনি হইতে যে জিনিস এইভাবে উত্তোলিত হয় তাহাকে লৌহ আকরিক (Iron ore) বলে। লৌহ আকরিকের সহিত নানাবিধ দ্রব্য ও ময়লা মিশ্রিত থাকে। ঐ সমস্ত দ্রব্য পৃথক করিতে হইলে এবং ইহার ময়লা দূর করিতে হইলে উহাকে গালান প্রয়োজন। এই গালানোর সহজ ইন্ধন হইতেছে কয়লা। কাঠ বা জলবিদ্যুৎশক্তির সাহায্যেও লৌহ গালান চলিতে পারে। কিন্তু কয়লার সাহায্যেই উহা সস্তায় ও সুন্দরভাবে চলিতে পারে।

সুতরাং লৌহ দ্রব্যাদির প্রস্তুতের উপযোগী প্রধান উপকরণ হইতেছে লৌহ আকরিক ও কয়লা। ইহা ছাড়া ডোলোমাইট, চুনাপাথর প্রভৃতিও অবশ্য প্রয়োজন হয়। যে সমস্তদেশ লৌহ ও কয়লার সম্পদে সমৃদ্ধ এবং উক্ত সম্পদ প্রায় কাছাকাছি অবস্থিত সেই সমস্ত দেশ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে সমধিক প্রসিদ্ধ। আবার লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে যে দেশ সমধিক প্রসিদ্ধ সেইদেশ অন্যান্য শিল্পেও বিশেষ উন্নত। বিভিন্ন শিল্পে উন্নত দেশই ব্যবসা বাণিজ্যে বেশী অগ্রসর এবং সেইদেশই বেশী বিত্তবান এবং বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ কথার সার্থকতা প্রমাণ করে। স্বর্ণ ও হীরক অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। যাহার এই সম্পদ যত বেশী আছে সে তত বেশী বিত্তবান। ব্যক্তি ও জাতি উভয়ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য। কিন্তু স্বর্ণ বা হীরক আহরণ নির্ভর করে লৌহের কার্যকরী শক্তির উপর। অর্থবান্ হইতে হইলে অর্থোপার্জনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বৃদ্ধিই অর্থোপার্জনের উপযুক্তক্ষেত্র। লৌহ ও কয়লাই প্রত্যক্ষভাবে এই ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে পারে। স্বর্ণের বা হীরকের বা অর্থের প্রভাব এখানে পরোক্ষ। অর্থোপার্জনের নূতন নূতন সম্পদ লৌহ ও কয়লার সাহায্যেই প্রত্যক্ষভাবে উৎপন্ন হয়। স্বর্ণ বা হীরক বা অর্থ উহা আহরণের সহায়কমাত্র। স্ব। থাকিলে বিদেশ হইতে লৌহ ও কয়লা আহরণ করা যায় সত্য কিন্তু প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে এরূপ আহরণ দ্বারা শিল্পে-বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করা অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। এজন্য লৌহ ও কয়লা স্বর্ণ ও হীরক অপেক্ষা অধিক মূল্যবান বলা চলে।

পূর্বে আমাদের অবশ্য লৌহ ও কয়লার উপর এমন নির্ভর করিতে হইত না। তখন কাঠের ও বাঁশের সাহায্যে অনেক অভাবই পূরণ হইত। কাঠের লাঙ্গল,

কাঠের গাড়ী, কাঠের তাঁত বা বাঁশের তাঁত পূর্বে কম ছিল না। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতিতে উহারা বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে এবং লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার ফলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সংঘটিত হইতেছে এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

কয়লা :

Q. 3 State the different kinds of Coal, its uses and by-products.

(বিভিন্ন প্রকার কয়লা, উহার ব্যবহার ও উপজাত দ্রব্যাদি উল্লেখ কর।

Ans. : কয়লা একটি খনিজ পদার্থ। ইহা পাললিক শিলার মধ্যে স্তরে স্তরে সঞ্চিত থাকে। এই কয়লার স্তর coal seams) ভূপৃষ্ঠের বা ভূপৃষ্ঠের অনেকটা নীচেও অবস্থিত থাকিতে পারে।

কয়লাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে :

(১) এন্থ্রাসাইট (Anthracite) : ইহা দেখিতে কাল, কিন্তু খুব শক্ত ও ভারী। ইহা সহজে প্রজ্বলিত হয় না কিন্তু একবার প্রজ্বলিত হইলে নীল আভাযুক্ত তীব্র উত্তাপ উৎপাদন করে এবং খুব কম ধূম উদ্গীরণ করে। কয়লার মধ্যে ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে শতকরা ৯৫ ভাগ কার্বন, ২.৫ ভাগ হাইড্রোজেন এবং ২.৫ অক্সিজেন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার পরিমাণ মোট উত্তোলিত কয়লার শতকরা ৫ ভাগ মাত্র। ধাতব শিল্পে, জাহাজ ও রেল এঞ্জিনে এই জাতীয় কয়লা ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া ও ব্রিটেনের দক্ষিণ ওয়েলসেই ইহা প্রধানতঃ পাওয়া যায়।

(২) বিটুমিনাস (Bituminous) : ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়লা এবং দেখিতে কাল। ইহা হইতেও যথেষ্ট তাপ উৎপন্ন হয় কিন্তু প্রচুর ধূম নির্গত হয়। ইহাতে শতকরা ৮২ ভাগ কার্বন, ৫ ভাগ হাইড্রোজেন, ৩ ভাগ অক্সিজেন এবং ৮ ভাগ নাইট্রোজেন দেখিতে পাওয়া যায়। গ্যাস ও কোক প্রস্তুত করিতে, রন্ধনকার্যে, কারখানায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোট উত্তোলিত কয়লার শতকরা ৮০ ভাগ কয়লা এই জাতীয়। আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে, ভারতের রানীগঞ্জ ও ঝরিয়া অঞ্চলে ইহা পাওয়া যায়।

(৩) লিগনাইট বা ব্রাউন (Lignite or Brown) : ইহা অপেক্ষাকৃত কোমল এবং ভঙ্গুর। ইহাতে শতকরা ৬৯ ভাগ কার্বন, ৫৫ ভাগ হাইড্রোজেন, ২৫ ভাগ অক্সিজেন এবং ৮ ভাগ নাইট্রোজেন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ধূসরবর্ণের বলিয়া ইহাকে 'ব্রাউন কয়লা' বলা হয়। ইহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা এবং পৃথিবীর

মোট উত্তোলিত কয়লার শতকরা ১৫ ভাগ মাত্র। ইহা সহজে প্রজ্বলিত হয় এবং ইহার উত্তাপ দেওয়ার ক্ষমতা কম। স্থানীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্যই ইহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জার্মানী, অষ্ট্রেলিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ভারতের আসাম, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে ইহা বেশী পাওয়া যায়।

(৪) **পিট** (Peat): উদ্ভিদ কয়লায় রূপান্তরিত হওয়ার ইহা প্রথম সোপান। ইহাতে উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহা সাধারণতঃ জলাভূমিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে শতকরা ৫৯ ভাগ কার্বণ, ৬ ভাগ হাইড্রোজেন, ৩৩ ভাগ অক্সিজেন এবং ২ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। ইহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা। ইহা জ্বালাইলে খুব ধুম নির্গত হয় এবং কাঠ পোড়ার গন্ধ পাওয়া যায়। ইহার উত্তাপ দেওয়ার ক্ষমতাও কম। রাশিয়ার উত্তরে এই জাতীয় কয়লা কিছু পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া নিকৃষ্ট শ্রেণীর আর একপ্রকার কয়লা আছে। উহাকে 'ক্যানেল কয়লা' বলে। গ্রাফাইটও এক প্রকার কয়লা, কিন্তু উহা উত্তাপ সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয় না। পেন্সিলের সীস, মুষ, মুদ্রণের হরফ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।

কয়লার ব্যবহার ও উপজাত দ্রব্য নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে:

(১) কয়লা বর্তমানযুগে মানুষের বিশেষ প্রয়োজনীয় ইন্ধন। ইহা রন্ধন কার্য্যে, শীতপ্রধান দেশে গৃহের উত্তাপ সৃষ্টি করিতে, কলকারখানা, রেলএঞ্জিন, ষ্টিমার, জাহাজ প্রভৃতি চালানোর জন্য প্রচুর ব্যবহৃত হয়। গ্যাস ও বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন, খনিজদ্রব্য গলান প্রভৃতি কাজেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া নানা জাতীয় উপজাত দ্রব্য ইহা হইতে পাওয়া যায়। ইহার বহুবিধ প্রয়োজনীয়তার জন্য ইহাকে শিল্পের জননী (Mother of Industries) আখ্যা দেওয়া হয়। রাসায়নিক শিল্পে কাঁচা মাল হিসাবে ইহার গুরুত্ব কম নয়। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় যে উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায় তাহার মধ্যে ১ টন কয়লা হইতে ২৭ পাউণ্ড এমোনিয়াম সালফেট, ১২ গ্যালন আলকাতারা, ১৯৫০০ ঘন ফুট গ্যাস ও ১৪৫০ পাউণ্ড কোক প্রস্তুত হইতে পারে। যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কয়লার উপজাত দ্রব্যাদি পাওয়া যায় নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। বর্তমানে ১৬০০০ হাজারেরও অধিক সংখ্যক উপজাত দ্রব্যাদি কয়লা হইতে পাওয়া যাইতেছে।

(২) **উপজাত দ্রব্য পাওয়ার বিভিন্ন প্রণালী:**

(ক) **অধিক উত্তাপশক্তিসম্পন্ন অঙ্গারীকরণ প্রণালী** (High power

Carbonization Method) : এই প্রণালীতে কোক, গ্যাস, আলকাতরা, এমোনিয়া, গন্ধক, বেঞ্জল, ন্যাপথল প্রভৃতি পাওয়া যায়।

(খ) **স্বল্প উত্তাপঅঙ্গারীকরণ প্রণালী** (Low Temperature Carbonization Method) : এই প্রণালীতেও ধুমহীন কোক, আলকাতরা, হাল্কা তৈল প্রভৃতি পাওয়া যায়।

(গ) **উদ্‌যানী ভবন প্রণালী** (Hydrogenation method) : এই প্রণালীতে কয়লার গুঁড়া সামান্য পেটোলিয়ামের সহিত মিশাইয়া ৩০০ ফা হইতে ৪৫০ ফা উত্তাপে হাইড্রোজেন গ্যাসেব প্রবল চাপে উহাকে কৃত্রিম পেট্রোলে (Synthetic petrol) রূপান্তরিত করা যায়। এইভাবে ৮ টন কয়লা হইতে ৪৫ গ্যালন পেট্রল, কিছু গ্যাস, ডিজেল তৈল, জ্বালানি তৈল প্রভৃতি পাওয়া যায় এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা এ কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে।

কোক লৌহ গলাইবার জন্য ও গৃহস্থালীর কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। আলকাতরা হইতে পিচ, রং, সুগন্ধ দ্রব্য, স্যাকারিণ, ফিনাইল, প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য পাওয়া যায়। এমোনিয়াম সালফেট হইতে সার, নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য, প্রভৃতি পাওয়া যায়।

Q. 4. Give the world distribution of Coal. Mention in particular three fields in India (C U, Pre, 1961)

(পৃথিবীর কয়লা উৎপাদনের বিবরণ দাও। ভারতে যে অঞ্চলে কয়লা উৎপন্ন হয় তাহার তিনটি ক্ষেত্র বিশেষতঃ উল্লেখ কর।)

Or

Give an account of the world distribution of Coai,

(C, U, Inter 1954)

(পৃথিবীর কয়লা প্রাপ্তির স্থানসমূহের বিবরণ দাও।)

Ans পৃথিবীতে বৎসরে বর্তমানে ২০০ কোটি টনের উপর কয়লা উত্তোলিত হয়। প্রতিবৎসরই উৎপাদন কিছু বাড়িতে দেখা যায়। পৃথিবীতে যে কয়লা সঞ্চিত আছে এইভাবে উত্তোলিত হইলে ২০০০ বৎসর চলিতে পারে বলিয়া পণ্ডিতগণের অনুমান। নিম্নে বিভিন্ন দেশের কয়লা উত্তোলনের বিবরণ দেওয়া হইল :

(ক) **ইউরোপ**—এই মহাদেশে পৃথিবীর প্রায় ৫০% কয়লা উত্তোলিত হয়। নিম্নলিখিত দেশগুলি উহার কয়লা উত্তোলনে উল্লেখযোগ্য।

(খ) **রাশিয়া**—বর্তমানে কয়লা উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া

আছে। ১৯৬১ সালের উৎপাদন ৫১ কোটি টন। ইহার মধ্যে কিছু লিগনাইট কয়লাও আছে—পরিমাণ প্রায় ১২ কোটি টন। উহার উল্লেখযোগ্য কয়লাখনিগুলির মধ্যে ডনেৎস (সর্বোৎকৃষ্ট—উৎপাদন ৬০), টুলা, ইউরাল, পেচোবা ও ককেশাস অঞ্চল ইউরোপে অবস্থিত এবং সাইবেরিয়ার কাবাগণ্ডি, কুজবাস, ক্রজনেৎস্ক, টুঙ্গাজ, লেনস্ক, মিণ্ডমিনস্ক, ইখুটস্ক, কানস্ক, লেনা, ফার্গানা, বেব'নস্ক প্রভৃতি এশিয়ায় অবস্থিত।

(খ) ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে উৎপাদন ১৯৬১ সালে ১৯ কোটি টন এবং পৃথিবীর মধ্যে ইহার স্থান চতুর্থ। খনিগুলির মধ্যে ইংলণ্ডের নদাম্বারল্যাণ্ড, ডারহাম, ইয়র্ক-ডার্বি নটিংহাম, মিডল্যাণ্ড, ল্যাঙ্কাশায়ার, স্টাফোর্ডশায়ার, দক্ষিণ ওয়েলস, স্কটল্যাণ্ডের আয়ারশায়ার, লানার্কশায়ার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। খনিগুলি সমুদ্রতীর হইতে দূরে অবস্থিত নয় বলিয়া রপ্তানি ব্যয় কম পড়ে। লৌহ ও কয়লার খনিগুলি নিকটবর্তী থাকায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সমধিক প্রসিদ্ধ।

(গ) জার্মানীর উৎপাদন ১৯৬১ সালে পশ্চিম অংশে ১৪ কোটি টন এবং পূর্বাংশে প্রায় অনুরূপ উৎপাদন দেখিতে পাওয়া যায়। জার্মানীর প্রধান খনিগুলি রূঢ় (৬০) স্যাক্সনী, সাইলেসিয়া প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত

(ঘ) ফ্রান্সের ১৯৬১ সালের উৎপাদন ৫.৫০ কোটি টন। উত্তর ফ্রান্স, মধ্য ভাগের মালভূমি (সেণ্টইটিনি) ইহার খনি অঞ্চল। ইহা কয়লা আমদানিও করিয়া থাকে।

(ঙ) পোল্যাণ্ডের উৎপাদন ১৯৬১ সালে প্রায় ১০ কোটি টন। জার্মানী হইতে অধিকৃত সাইলেসিয় ইহার প্রধান খনি অঞ্চল। ইহা কয়লা রপ্তানিকারক দেশ।

(চ) বেলজিয়ামের কয়লা খনি অঞ্চল ডিনান্ট ও ক্যামপাইনে অবস্থিত।

ইহা ছাড়া ইউরোপের চেকোশ্লোভাকিয়া স্পেন, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, অষ্ট্রিয়া, ইতালী, সুইডেন প্রভৃতি দেশেও সামান্য পরিমাণ কয়লা পাওয়া যায়।

২। উত্তর আমেরিকায় পৃথিবীর প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ কয়লা উত্তোলিত হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত দেশগুলি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

(ক) যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন ১৯৬১ সালে ৩৭ কোটি টনের উপর দাঁড়াইয়াছে। এতকাল ইহা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। এখন উক্ত স্থান রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। ইহার খনি অঞ্চলগুলি পেনসিলভানিয়া (অ্যানথ্রেসাইট কয়লা উৎপাদন), ভার্জিনিয়া, আলাবামা, কানসাস, মিসৌরী, ডাকোটা, নেব্রাস্কা, ইলিনয় রকি পার্বত্য অঞ্চল ও ওয়াশিংটনে অবস্থিত। পূর্ব দিকে কয়লা অপেক্ষা

পশ্চিম দিকের কয়লা নিম্নশ্রেণীর। পিট্সবার্গ, বার্মিংহাম প্রভৃতি লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্র পূর্বাঞ্চলেই অবস্থিত।

(খ) কানাডায় প্রচুর কয়লার স্তর থাকিলেও নোভাস্কোসিয়া, নিউ ব্রানস উইক, আলবার্টা ও সাসকাচুয়ানে সামান্য পরিমাণ উৎপন্ন হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র হইতে ইহাকে কয়লা আমদানি করিতে হয়।

(গ) মেক্সিকোতে সামান্য কয়লা পাওয়া যায়।

৩। দক্ষিণ আমেরিকায় কয়লা সম্পদ খুবই কম। ইহার আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল, পেরু, কলম্বিয়া, ভেনিজুয়েলা ও চিলিতে সামান্য কয়লা উত্তোলিত হয়।

৪। এশিয়া মহাদেশে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীর শতকরা ৬ ভাগ মাত্র। নিম্নলিখিত দেশগুলি উহার কয়লা উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য।

(ক) চীন কয়লা সম্পদে সমৃদ্ধ। ইহার সানসি, সেনসি, হোনান, কানসু, মাঞ্চুরিয়া ও সেজোয়ান অঞ্চলের কয়লাখনি উল্লেখযোগ্য।

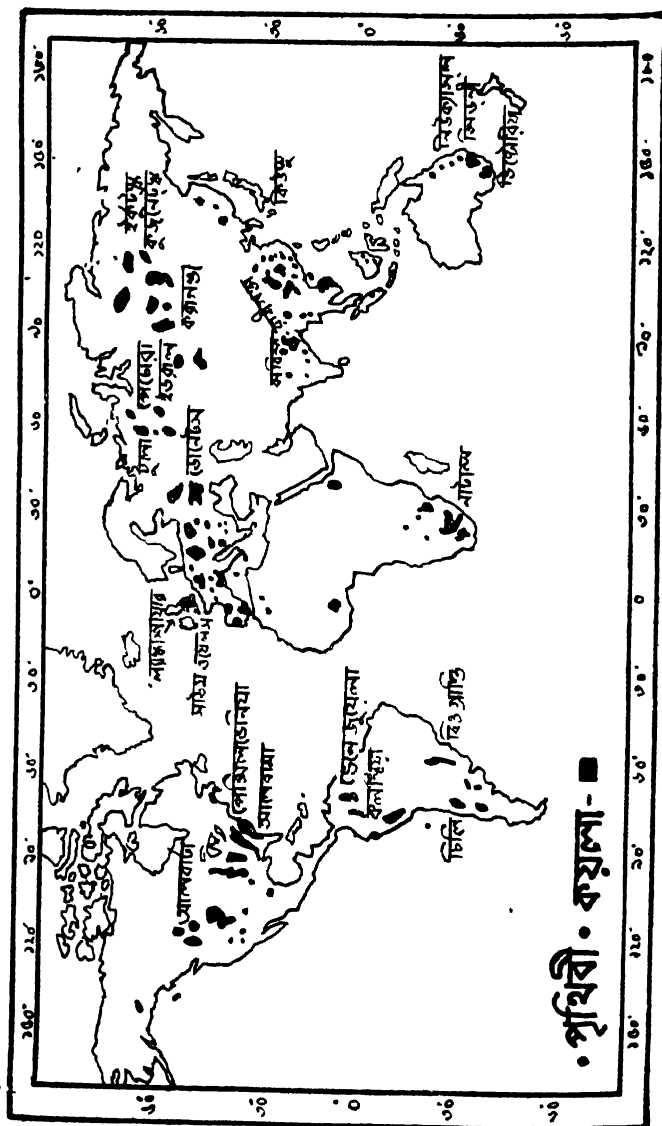
বর্তমানে ইহা কয়লা শিল্পে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং ১৯৬১ সালে ইহার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৫ কোটি টন। এখানে অ্যানথ্রেসাইট ও বিটুমিনাস উচ্চ শ্রেণীর কয়লাই আছে।

(খ) জাপানের কিউস্যু ও হোক্কাইডোতে কয়লার খনিগুলি অবস্থিত। জাপান কয়লা সম্পদে সমৃদ্ধ নহে। কিউস্যুর কয়লা নিকৃষ্ট শ্রেণীর যদিও উহা ইয়াওয়াটার লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(গ) ভারত কয়লা উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করে। ইহার উৎপাদনের পরিমাণ বর্তমানে প্রায় ৫ ৬০ কোটি টন। মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৮৩ ভাগ পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জ, বিহারের ঝরিয়া, গিরিডি, বোকারো, করণপুরা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে পাওয়া যায়। অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে উড়িষ্যার তালচের ও রামপুর, মধ্য প্রদেশের সোহাগপুর, উমারিয়া, সোহপানি, সাপুর ছত্রিশগড, অন্ধ্রের সিঙ্গারেনী, তন্দুর, মাদ্রাজের আর্কট ও সালেম, আসামের, নাজিরা, মাকুম এবং কাশ্মীর ও রাজস্থানের নাম করা যাইতে পারে। ভারতের ভাল কয়লার পরিমাণ খুব কম।

এশিয়া মহাদেশের উক্ত দেশগুলি ছাড়া ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান, মালয়, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়াতে সামান্য কয়লা পাওয়া যায়।

৫। আফ্রিকার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাহা কিছু কয়লা উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে ট্রান্সভাল, নাটাল, অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট উল্লেখযোগ্য। ন্যাটাল ভিন্ন অন্য স্থানের কয়লা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। নাটাল প্রচুর কয়লা বিদেশে রপ্তানি করে।


পৃথিবী • কয়লা - ■

৬। **ওসায়ানিয়ার** মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে কিছু কয়লা পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়ায় কুইনস্ল্যাণ্ড, নিউসাউথওয়েলস্, ভিক্টোরিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে এবং দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া ও টাসমানিয়ায় সামান্য পরিমাণে কয়লা উৎপন্ন হইয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার নিউক্যাসল ও সিডনি কয়লার জন্য উল্লেখযোগ্য।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উৎপাদনের তুলনায় খুব বেশী কয়লা স্থান পায় না। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, পোলাণ্ড, চেকোশ্লাভিয়া, জার্মানী, চীন, মাঞ্চুরিয়া, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া কয়লা রপ্তানি করিয়া থাকে। ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, ইতালি, সুইডেন, বাল্টিক রাজ্যসমূহ, জাপান, পাকিস্তান, সিংহল, এডেন, ব্রহ্মদেশ, ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা, কানাডা ও মেক্সিকো কয়লা আমদানি করিয়া থাকে। ভারতের কয়লা প্রধানতঃ ব্রহ্মদেশ, সিংহল, এডেন ও পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

Q. 5. Describe the principal Coal fields of India and discuss the present condition of the Coal mining industry.

(C. U. Inter, 1928)

ভারতের প্রধান কয়লাখনিগুলি বর্ণনা কর এবং কয়লাখনি শিল্পের বর্তমান অবস্থা আলোচনা কর।

Ans. ভারতে দুই শ্রেণীর কয়লা উৎপন্ন হইয়া থাকে—

(১) **গণ্ডোয়ানা** (Gondwana) ও

(২) **টার্সিয়ারী** (Tertiary)

গণ্ডোয়ানা প্রাচীন যুগের কয়লা এবং অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। টার্সিয়ারী অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের কয়লা এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

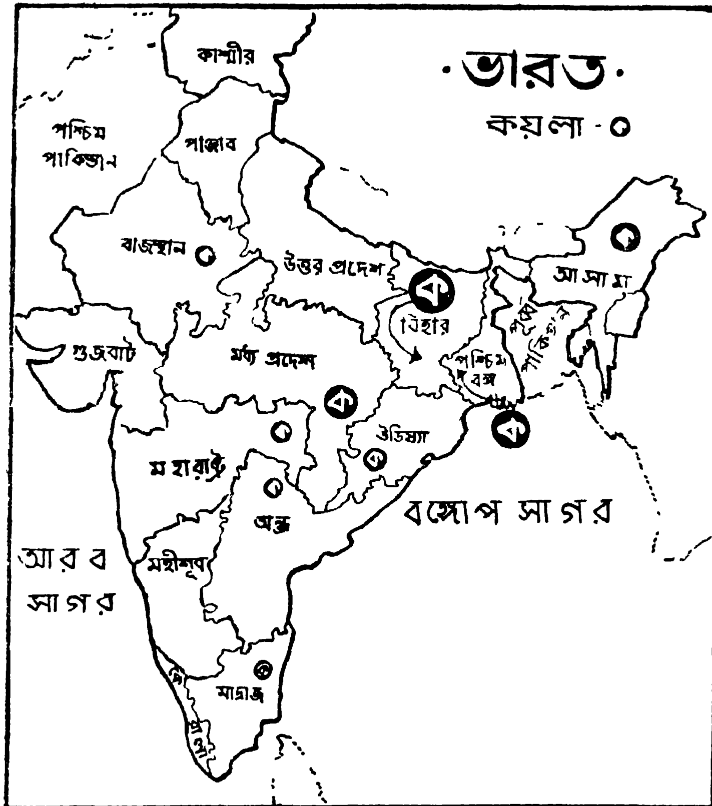
ভারতের **গণ্ডোয়ানা** কয়লা খনি অঞ্চল প্রধানতঃ

(১) **পশ্চিমবঙ্গে**—রাণীগঞ্জ। এখানে উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায় এবং মোট উৎপাদনের প্রায় ¼ অংশ উৎপন্ন হয়। এখানেই সর্বপ্রথম খনির কার্য্য আরম্ভ হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের শিল্পোন্নতিতে এই কয়লা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

(২) **বিহারে**—ঝরিয়া, গিরিডি, বোকারো, করণপুরা, পালামৌ, রামগড় ও রাজমহল পাহাড় উল্লেখযোগ্য। বিহারের খনিগুলির কয়লা মোটামুটি উচ্চশ্রেণীর এবং এখান হইতে মোট উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ পাওয়া যায়।

(৩) **উড়িষ্যায়**—তালচের ও রামপুর। এখানকার কয়লা মধ্যম শ্রেণীর এবং উৎপাদনও বিহারের তুলনায় অনেক কম।

(৪) মধ্যপ্রদেশে—সোহাগপুর, উমারিয়া, মোহপানি, সাপুর, পেঞ্চ উপত্যকা, ছত্রিশগড, করবা, সিংগোলি, ঘোতমল। এ অঞ্চলের কয়লা মধ্যমশ্রেণীর। উ পাদন এখনও কম। ভিলাইযে ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় করবার কয়লা খনির গুরুত্ব বাড়িয়া গিযাছে।



(৫) মহারাষ্ট্রে—চান্দা, বল্লারপুর ও ওয়ারোয়া।

(৬) অন্ধ্রে—সিঙ্গেরণী ও তান্দুর।

ভারতের টার্সিয়ারী কয়লা খনি অঞ্চল প্রধানতঃ

(১) আসামে—নাজিরা ও মাকুম।

(২) রাজস্থানে -বিকানীর।

(৩ মাদ্রাজে—আর্কট। এখানকার নেভেলিতে নিম্নশ্রেণীর লিগনাইট কয়লা প্রচুর আছে এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া ২ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও সারের কারখানা স্থাপিত হইতেছে।

(৪) জম্মু ও কাশ্মীরে—রায়াসি।

(৫) পশ্চিম বঙ্গের—দার্জিলিং।

১৯৬৯ সালে ভারতে ৫ ৬০ কোটি টন কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল। বিভিন্ন রাজ্যের কয়লা উৎপাদন নিম্নের তথ্য হইতে মোটামুটি জানা যাইবে:

বিহার—২ কোটি ৯০ হাজার টন	উড়িষ্যা—৬ লক্ষ ৩ হাজার টন
পশ্চিমবঙ্গ—১ কোটি ১২ লক্ষ ৯০ হাজার টন	আসাম—৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টন
মধ্যপ্রদেশ—৪৮ লক্ষ ২৯ হাজার টন	বোম্বাই—৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টন
অন্ধ্র— ১৬ লক্ষ ৯৪ হাজার টন	রাজস্থান—২৬ হাজার টন।

বর্তমানে গণ্ডোয়ানা কয়লা খনি অঞ্চলে মোট উৎপাদনে ৯৮ ভাগ উৎপন্ন হয় এবং টার্সিয়ারী খনিগুলি হইতে মাত্র শতকরা ২ ভাগ উৎপন্ন হয়। টার্সিয়ারী কয়লা অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং অধিকাংশ গুঁড়া কয়লা।

ভারতের কয়লা শিল্পের অবস্থা:—

(১ পৃথিবীর মোট উৎপাদনের মাত্র শতকরা তিন ভাগ ভারতে উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর মধ্যে কয়লা উৎপাদনে ভারতের স্থান অষ্টম।

(২) ভারতে মোট সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ৬০০০ কোটি টনের কিছু উপরে। উহার শতকরা ২৫ ভাগ উচ্চশ্রেণীর এবং শতকরা ১০ ভাগ মাত্র কোকিং কয়লা।

(৩ ভারতে কয়লার ব্যবহার রেল এঞ্জিনে শতকরা ৩৩ ভাগ, শিল্প কারখানায় ২৯ ভাগ, কয়লা উৎপাদনে ১১ ভাগ, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৮ ভাগ, গৃহস্থালিতে ৮ ভাগ এবং রপ্তানি বাণিজ্যে ও জাহাজে ৫ ভাগ।

(৪) কয়লার অধিকাংশ নিকৃষ্ট শ্রেণীর, একটি অঞ্চলে বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত এবং সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত, জন্য রেলপথে পরিবহন ব্যয় অধিক পড়ে। বর্তমানে উপযুক্ত সংখ্যক রেলওয়াগন সরবরাহ না হওয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলে কয়লা প্রেরণ ঠিকমত হইতেছে না।

(৫) কয়লা খনিগুলিতে প্রায় ৩½ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে, কিন্তু আধুনিক যন্ত্রের অভাবে মাথা-পিছু উৎপাদন কম।

(৬) কয়লার উপজাত দ্রব্য ঠিকমত ভাবে উৎপন্ন হয় না।

(৭) কয়লা কাটিবার পর অবশিষ্ট কয়লা সংরক্ষণের জন্য এবং বিস্ফোরক গ্যাস নিবারণের জন্য উপযুক্ত বালি নিক্ষেপের (sand stowing) ব্যবস্থা Sand stowing Act পাশ হইলেও ত্রুটিপূর্ণ।

(৭) গুঁড়া কয়লার সহিত কাদা মিশ্রিত করিয়া জ্বালানি প্রস্তুতের ব্যবস্থা নাই এবং এজন্য গুঁড়া কয়লা নষ্ট হয়।

কয়লা শিল্পের উন্নতির জন্য উপরিউক্ত ত্রুটিগুলি দূর করা উচিত। এদিকে অবশ্য চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু ফললাভ আশানুরূপ হইতেছে না।

Q. 6. State how far the coal fields of India have influenced the location of industries.

(ভারতের কয়লাখনিগুলি শিল্প স্থাপনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বর্ণনা কর।)

Ans : ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। এজন্য সমভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে গড়িয়া উঠে নাই। বিভিন্ন প্রকার শিল্পের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের পাট, কার্পাস, ইঞ্জিনিয়ারিং, লৌহ ও ইস্পাত, রাসায়নিক ও কাগজ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের কার্পাস, মহীশূরের বিমানপোত, উত্তর প্রদেশের ইক্ষু, কার্পাস, চর্ম ও কাঁচ, মাদ্রাজের কার্পাস, অন্ধ্রের জাহাজ নির্মাণ, বিহারের লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ভারতের কয়লার খনিগুলির কাজ পশ্চিমবঙ্গে ও বিহারেই প্রথম আরম্ভ হয়। এজন্য উহার নিকটবর্তী অঞ্চলে উক্ত কয়লার উপর নির্ভর করিয়া অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। উক্ত শিল্পগুলির মধ্যে কুলটি ও বার্নপুরের লৌহ ইস্পাত কারখানা, জামসেদপুরের লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, কলিকাতার উপকণ্ঠের পাট শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে ক্রমে ক্রমে এবং বর্তমানে অনেক শিল্প শক্তি হিসাবে কয়লার উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। উহাদের মধ্যে কাটনির সিমেন্ট, সিন্ধ্রির সার, আসানসোলের সাইকেল, এলুমিনিয়াম, চিত্তরঞ্জনের রেলইঞ্জিন, রানীগঞ্জের ও ২৪ পরগণার কাগজ, দুর্গাপুর, ভিলাই ও রুঢ়কেলার লৌহ ও ইস্পাত, দুর্গাপুরের কোক, বিশাখাপত্তনের জাহাজ, কুমারধুবীর ফায়ার ব্রিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং, আসানসোলের টাইল, কোন্নগরের হিন্দ মোটরস্, উত্তরবঙ্গের ও আসামের নানারকম শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত শিল্প ভবিষ্যতে নদী উন্নয়ন পরিকল্পনা হইতে জলবিদ্যুৎ শক্তি পাইবে।

পূর্ব ও উত্তর ভারতে এইভাবে শক্তি হিসাবে কয়লার উপর নির্ভর করিয়া অনেক শিল্পস্থাপন হইয়াছে। এজন্য কয়লা উক্ত শিল্পস্থাপনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলা চলে। পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণ ভারত কয়লাখনিগুলি হইতে দূরে অবস্থিত। কয়লা বহন ব্যয় বেশী পড়ে বলিয়া উক্ত অঞ্চল জলবিদ্যুতের উপর বেশী নির্ভরশীল। এই ভাবে বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহীশূর প্রভৃতি অঞ্চলে জলবিদ্যুতের সাহায্যে অনেক শিল্প গড়িয়া উঠে। মহীশূরের ভদ্রাবতীর লৌহ ও ইস্পাতের শিল্প কাঠ কয়লার উপর নির্ভর করিয়া প্রথমতঃ গড়িয়া উঠে। বোম্বাই পেট্রোলজাত শক্তির উপরও নির্ভর করিয়াছে। মাদ্রাজে অবশ্য জলবিদ্যুৎ ও কয়লা উভয়ই ব্যবহার করা হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আর্কটের কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইলে কয়লার উপরও কিছুটা নির্ভর করিবে। এইভাবে ভারতের শিল্পের উপর কয়লার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

Q. 7. Name the important countries of the world producing petroleum. What are the main uses of the product ?

(C. U. Inter. 1940, 1946, 1947.)

(পেট্রোলিয়াম উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম কর। উহা প্রধানতঃ কি কাজে লাগিয়া থাকে ?)

Ans : **পেট্রোলিয়াম উৎপাদনকারী দেশ**

পৃথিবীর সঞ্চিত পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ প্রায় ৮৬০০ কোটি ব্যারেল। ১ ব্যারেল সমান প্রায় ⅐ মেট্রিক টন। মোট সঞ্চয়ের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় শতকরা ৪৬ ভাগ এবং মধ্য প্রাচ্যে ৪৫ ভাগ বলিয়া অনুমান করা হয়। পেট্রোলিয়াম উৎপাদক দেশের সংখ্যা প্রায় ৫০টি। উহাদের প্রধান তৈলখনি অঞ্চলগুলিকে নিম্নলিখিত তিনটি বলয়ে ভাগ করা হইয়া থাকে ঃ

১। **পশ্চিম অঞ্চল বা নূতন পৃথিবী** (Western Zone বা New world)। এই অঞ্চলে প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ তৈল উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলের মধ্যে নিম্নলিখিত দেশগুলি উল্লেখযোগ্য ;

(ক) **মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র** ;—১৯৬১ সালে এখানে ৩৫ কোটি টন তৈল উৎপন্ন হয়। মোট উৎপাদনের ইহা প্রায় ½ অংশ। এখানকার তৈলখনি অঞ্চলগুলি অ্যাপালাচিয়ান পর্বতমালার উত্তরে নিউইয়র্করাজ্য হইতে দক্ষিণে টেনেসি পর্যন্ত, ইলিনয় ও দক্ষিণ-পশ্চিম ইণ্ডিয়ানা, লিমা-ইণ্ডিয়ানা-ওহিও, মধ্য মহাদেশীয়ের কানসাস, ওকলাহামা ও উত্তর টেক্সাস, মেক্সিকো উপসাগরীয় অঞ্চলের টেক্সাস ও লুইসিয়ানা, রকির উইয়োমিং ও কলোরাডো ও কালিফোর্নিয়া প্রভৃতি অঞ্চলগুলি

উল্লেখযোগ্য। অ্যাপালাসিয়ান পূর্বে প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ উৎপন্ন করিত। এখন উহার উৎপাদন অনেক কমিয়া গিয়াছে। বর্তমানে টেক্সাস প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে (২৫ ′), তাহার পর কালিফোর্নিয়া (২০%) ও কানসাস রাজ্যের স্থান। পেট্রোলিয়াম বিদেশে সামান্য রপ্তানি হইলেও পরিশোধনের জন্য ভেনিজুয়েলা ও মধ্যে প্রাচ্য হইতে তৈল আমদানি করা হয়।

(খ) ভেনিজুয়েলার মারাকাইবো হ্রদের চতুর্দিক ও ওরিনকো নদীর অববাহিকা তৈলখনি জন্য প্রসিদ্ধ। ১৯৬১ সালে উহার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৫° কোটি টন। এখানকার অধিকাংশ তৈল রপ্তানি হয়। ইহা ছাড়া এ অঞ্চলের কানাডা, মেক্সিকো (৩%), কলম্বিয়া (১%), ব্রেজিল, পেরু ও আর্জেন্টিনায় সামান্য তৈল উৎপন্ন হয়।

২। **মধ্য অঞ্চল** (Middle Zone) বা **পূর্ব ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য দেশসমূহ** (Eastern Europe and Middle East Countries) : এ অঞ্চলের মধ্যে নিম্নলিখিত দেশগুলি উল্লেখযোগ্য :

(ক) রাশিয়া—ইহার বাকু, গ্রজনি, মাইকপ, উফা, উজবেক, কাজাকিস্তান ও সাখালীন দ্বীপপুঞ্জ তৈলখনি অঞ্চল। ১৯৬০ সালে ইহার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৬° কোটি টন। এখানকার বাকুতেই বেশী তৈল উৎপন্ন হয়। ইউরালের উফাকে দ্বিতীয় বাকু বলা হয়। ইউরোপের মধ্যে রাশিয়ার স্থান প্রথম।

(খ) রুমানিয়া—ইহার দক্ষিণ-পূব দিকে কার্পেথিয়ান পর্বতমালার পূর্বদিকে তৈলখনি অবস্থিত। প্লোয়েষ্টি এখানকার প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র। রুমানিয়ার উৎপাদন মোট উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৩ অংশ। ১৯৫৯ সালে ইহার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ১৩ লক্ষ টন। ইউরোপের মধ্যে ইহার স্থান দ্বিতীয়।

(গ) মধ্যপ্রাচ্যের তৈলখনিগুলি সৌদি আরব, কোয়াট, বাহরিণ দ্বীপ, ইরাণ ও ইরাকে অবস্থিত। এ অঞ্চলের মোট উৎপাদন ১৯৬১ সালে ২৬ কোটি টন ছিল। সৌদি আরবের তৈল হাসা হইতে বেশী পাওয়া যায় এবং ইহার উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৭ কোটি টন। কোয়াটের উৎপাদন ৮½ কোটি টনের উপরে। ইরাকের তৈলখনি উত্তরে মসুল ও কিরখুকে অবস্থিত। দক্ষিণেও তৈল আবিষ্কৃত হইয়াছে। উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৫ কোটি টন। ইহার তৈল নলযোগে ভূমধ্যসাগরের তীর অবস্থিত হাইফা ও ত্রিপলি বন্দরে লওয়া হয়। ইরাকের তৈলখনি বৃটিশ কোম্পানীর অধীন। সৌদি আরব, কোয়াট ও বাহরিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈল কোম্পানীর অধীন। ইরাণের তৈলখনি মজিদ ই-সুলেমানেই প্রসিদ্ধ এবং এখানকার তৈল নলযোগে আবাদান বন্দরে শোধনের জন্য লওয়া হয়। উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৫¾ কোটি টন। ইরাণের তৈলখনি রাষ্ট্রীয়করণের

পৃথিবীর পেট্রোলিয়াম উৎপাদন ও রপ্তানি

পূর্বে বৃটিশের প্রভাবাধীন ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক অবস্থা জটিল। এজন্য বিদেশী তৈল কোম্পানীগুলি বড়ই সন্ত্রস্ত। তাই এখানে বেশী মাত্রায় তৈল আহরণের চেষ্টা চলিতেছে এবং ইহার ফলে উৎপাদনও দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে।

৪। **সুদূর প্রাচ্য অঞ্চল** (Far Eastern Region) বা **দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার** দেশসমূহ। এ অঞ্চলের উৎপাদন মোট উৎপাদনের প্রায় ৫%। ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও (সারওয়াক) প্রভৃতি এ অঞ্চলের তৈল উৎপাদক দেশ। ভারতের আসামে এখন সামান্য তৈল উৎপন্ন হইতেছে। অন্যত্র তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবের আটক জেলায় সামান্য তৈল পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশের খনিগুলি ইরাবতী ও চিন্দুইন নদীর অববাহিকা চেড়ুবা ও রামরী অঞ্চলে অবস্থিত। ভারত ও পাকিস্তান অপেক্ষা ইহার উৎপাদন বেশী।

পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার (**Uses of Petroleum**) :

পেট্রোলিয়াম খনিজ পদার্থ এবং খনিজ তৈল বলিয়া খ্যাত। ইহার উৎপত্তি উদ্ভিদ ও প্রাণী হইতে এবং প্রাপ্তিস্থান পাললিক শিলা হইতে। এই তরল খনিজ তৈল জল অপেক্ষা হাল্কা। ভূগর্ভে সঞ্চিত জলের উপর ইহা ভাসমান অবস্থায় থাকে এবং গভীর কূপের সাহায্যে উত্তোলিত হয়।

পেটোলিয়াম একটি জ্বালানি পদার্থ। কিন্তু খনি হইতে তোলার পর ইহা কাজে লাগান যায় না। কারণ ইহাতে অনেক ময়লা থাকে। সেজন্য শোধন (refine) করার পর নানাবিধ মূল্যবান জিনিস সংগৃহীত হয়। তন্মধ্যে পেট্রোল, কেরোসীন, ডিজেল তৈল, পিচ্ছিল তৈল, এসফেল্ট, প্যারাফিন, ভ্যাসেলিন প্রভৃতি পাওয়া যায় এবং এ সমস্ত দ্রব্য পেট্রোলিয়ামের উপজাত দ্রব্য (by products)। পেট্রোল মোটর গাড়ী, এরোপ্লেন, মোটর সাইকেল, কলের লাঙ্গল, রেলগাড়ী, জাহাজ প্রভৃতি চালানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। কেরোসীন আলো জ্বালিবার জন্য, গ্রীজ ও লুব্রিকেটিং তৈল, কলকব্জা, পিচ্ছিল করার জন্য, ডিজেল তৈল, ডিজেলের যন্ত্রপাতি চালানোর জন্য, এ্যাসফেল্ট রাস্তা তৈয়ারীর জন্য প্যারাফিন, মোমবাতি ও নানা প্রকার ঔষধ তৈয়ারীর জন্য ব্যবহৃত হয়।

ইহা ইন্ধন হিসাবে কয়লা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সহজে পাইপে বা জাহাজে অন্যত্র লইয়া যাওয়া যায়।

কয়লা হইতেও কৃত্রিম পেট্রোল প্রস্তুত হয়। জার্মানী ও বৃটেন এ বিষয়ে উন্নত। খনিজ তৈলের অভাবই কৃত্রিম তৈল উৎপাদনে প্রেরণা যোগাইয়াছে এবং পেট্রোলিয়ামের পরিবর্ত (substitute) হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। ভারতেও

এরূপ তৈল উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে। তবে এরূপ তৈল উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশী

Q, 8. Write an account of the world production and trade in Petroleum. (C. U. Inter, 1955)

(পৃথিবীর পেট্রোলিয়াম উৎপাদন ও উহার ব্যবসা-বাণিজ্যের বিবরণ লিখ।)

Ans. পেট্রোলিয়াম উৎপাদনের উত্তর Q. 7. এ দেখ।

পেট্রোলিয়ামের ব্যবসা-বাণিজ্য (**Trade in Petroleum**) :

পেট্রোলিয়াম ব্যবসা-বাণিজ্য দুই প্রকারে চলে। খনিজ হইতে উত্তোলিত পেট্রোলিয়াম (ক্রুডঅয়েল) রপ্তানি হইতে পারে এবং পেট্রোলিয়াম শোধনাগারে শোধনের পর উহার উপজাত দ্রব্য রপ্তানি হইতে পারে।

ক্রুড অয়েল বা অপরিশোধিত তৈল রপ্তানিতে ভেনিজুয়েলা, সৌদি আরব, কোয়াট, বাহরীন্ দ্বীপ, ইরাক, ইরান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে পেট্রোলিয়াম উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করিলেও অপরিশোধিত তৈল কমই রপ্তানি করে। ইহা অপরিশোধিত তৈল ভেনিজুয়েলা, সৌদি আরব, কোয়াট প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রচুর আমদানি করে এবং তৈলের উপজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করে। অন্যান্য 'ক্রুড অয়েল' আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে ব্রিটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালি, ভারত ও জাপান উল্লেখযোগ্য। আরব, ইরান, ইরাক, ইন্দোনেশিয়া হইতে ভারত ক্রুড অয়েল আমদানি করে এবং তৈলজাত দ্রব্যাদি প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানি করে। তৈলজাত দ্রব্য রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া রুমানিয়া, রাশিয়া, জার্মানী ও ব্রিটেনের নাম করা যাইতে পারে।

Q, 9, Give an account of the mineral oil fields and petroleum refineries of India,

(ভারতের খনিজ তৈল ও পেট্রোলিয়াম শোধনাগারের বিবরণ দাও।)

Ans, ভারত খনিজ তৈল সম্পদে এখনও খুব দরিদ্র। ইহার খনিজ তৈলের চাহিদা প্রায় ৪৫ লক্ষ টন। কিন্তু উৎপাদন বর্তমানে মাত্র ৫ লক্ষ টন। সুতরাং প্রয়োজনের ১০% বেশী নিজস্ব খনি হইতে উৎপন্ন হয় না। ফলে বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়।

ভারতের প্রধান তৈল উৎপাদন কেন্দ্র আসামের লখিমপুর জেলায় ডিগবয় নামক স্থানে অবস্থিত। এই তৈলখনি ২½ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া বিস্তৃত এবং আসাম 'অয়েল

কোম্পানী' নামে এক ইংরেজ কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত। ডিগবয়ের নিকটবর্তী বাপ্পাপাং, হংসপং প্রভৃতি খনি হইতে সামান্য তৈল পাওয়া যায়। সম্প্রতি নাহারকাটিয়ায় এক তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং উহা হইতে তৈল উত্তোলনের কাজ আরম্ভ হইতে চলিয়াছে।

ভারতের তৈলের অভাব পূরণ করার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। প্রথমতঃ ভারত সরকার 'তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের (Oil and Natural Gas Commission) এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে তৈলখনি আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছে। উক্ত চেষ্টার ফলেই নাহারকাটিয়া তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া গুজরাটের কাম্বে অঞ্চলে লুনেজ ও এ্যাঙ্কলেশ্বরে তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। হিমাচল প্রদেশের জালামুখীতে এবং রাজস্থানের



জয়সলমীর অঞ্চলে রুমানিয়া ও রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকদের সাহায্যে অনুসন্ধান চলিতেছে। সম্প্রতি 'ষ্টানভ্যাক কোম্পানীর' সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গে অনুসন্ধান চলিতেছে। বিহারে, ত্রিপুরা রাজ্যে ও কাশ্মীরেও তৈলখনি আছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হইতেছে তৈল শোধনাগার স্থাপন। বর্তমানে নিম্নলিখিত তৈল শোধনাগারগুলি কার্য্যরতঃ আছে :

(১) ডিগবয় তৈল শোধনাগার। ইহা আসাম কোম্পানীর পরিচালনাধীন এবং ডিগবয় খনির তৈল এখানে শোধন হইতেছে। উক্ত শোধনাগার হইতে পেট্রোল, পিচ্ছিল তৈল, কেরোসীন, মোম প্রভৃতি পাওয়া যাইতেছে।

(২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ষ্টানভ্যাক' এবং বৃটেনের 'বার্মাসেল' অয়েল কোম্পানীর দ্বারা বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী ট্রম্বেতে দুইটি তৈল শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে। উহারা প্রধানতঃ মধ্যপ্রাচ্য হইতে অপরিশোধিত তৈল আমদানি করিয়া শোধন করিতেছে এবং বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য উৎপন্ন করিতেছে।

(৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ক্যালটেক্স' কোম্পানী বিশাখাপত্তনমে একটি শোধনাগার স্থাপন করিয়াছে এবং বিদেশ হইতে অপরিশোধিত তৈল আমদানি করিয়া শোধন করিতেছে।

(৪) ইহা ছাড়া ভারত সরকারের চেষ্টায় বিহারের বারাউনিতে এবং আসামের গৌহাটির নিকট নূনামাটিতে তৈল শোধনাগার স্থাপিত হইতেছে এবং উহা প্রায় সমাপ্তির পথে। এই শোধনাগার দুইটি নাহারকাটিয়া হইতে অপরিশোধিত তৈল পাইবে।

তৃতীয় প্রচেষ্টা হইতেছে চিনির কলের ঝোলা গুড় যাহা এযাবৎ কাল প্রায় ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে তাহা হইতে শক্তি সুরাসার (Power Alcohol) প্রস্তুত করা। এই গুড় হইতে ১৯৫৫ সালে ১ কোটি ৫ লক্ষ গ্যালন সুরাসার প্রস্তুত হইয়াছে। উহার পরিমাণ বৃদ্ধি করার চেষ্টা চলিতেছে এবং উহার উৎপাদন বর্তমানে ৩ কোটি ৬৬ লক্ষ গ্যালনে দাঁড়াইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়।

চতুর্থ প্রচেষ্টা হইতেছে যে প্রচুর নিকৃষ্ট শ্রেণীর লিগনাইট কয়লা আছে তাহা হইতে কৃত্রিম তৈল উৎপাদন করা। এ দিকের চেষ্টা এখনও কার্যকরী হয় নাই। তবে চেষ্টা চলিতেছে।

উপরিউক্ত প্রচেষ্টার দ্বারা তৈল সম্পর্কে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা চলিতেছে এবং অনেকটা সাফল্য লাভ করা গিয়াছে। ভারতের বর্তমান উৎপাদনের মধ্যে মোটর গাড়ীর পেট্রোল ও ফারনেস তৈল উহার প্রয়োজন মিটাইতে পারিতেছে এবং কিছুটা রপ্তানিও করিতেছে। বিমানের তৈল এবং কেরোসীন তৈল গ্রামাঞ্চলের চাহিদা বেশী বলিয়া আমদানি করিতে হইতেছে। অন্যান্য তৈলজাত দ্রব্যাদিও আমদানি করিতে হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে আমরা তৈল সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইতে পারিব বলিয়া আশা করা যায়।

জলবিদ্যুৎ

Q. 10. Describe in general the physical and economic factors for the development of hydro-electricity. Name two countries which have developed it because they have practically no other fuel resources and two countries which have developed it though they are rich in other one or more fuel resources.

(B. U. Entrance, 1961)

(জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রয়োজন তাহা সাধারণ-ভাবে বর্ণনা কর। এমন দুইটি দেশের নাম কর যাহারা অন্য জ্বালানি সম্পদ না থাকার জন্য জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করিয়াছে এবং এমন দুইটি দেশের নাম কর যাহাদের একাধিক অন্য জ্বালানি সম্পদ থাকা সত্ত্বেও জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করিয়াছে।)

Ans : জল প্রবাহ হইতে যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয় তাহাকে জল-বিদ্যুৎ শক্তি (Hydro-electric power) বলে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কতকগুলি অনুকূল প্রাকৃতিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থার প্রয়োজন। নিম্নে উহাদের বিবরণ দেওয়া হইল :—

(১) **বন্ধুর ভূপ্রকৃতি**—ইহাতে জলস্রোত বেগবতী হয়, নদী খরস্রোতা হয়, গতিপথে জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে এবং এইভাবে জলপ্রবাহের বেগ বৃদ্ধি করে। জলপ্রবাহের বেগ যত বৃদ্ধি পাইবে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের যন্ত্রাদি যথা টারবাইন চালান তত সহজসাধ্য হইবে এবং অল্পায়াসে অধিক বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব হইবে।

(২) **প্রচুর বৃষ্টিপাত**—ইহাতে নদীতে উপযুক্ত পরিমাণ জল পাওয়ার সুবিধা হয়।

(৩) **বৃষ্টিপাত ও বরফ গলা পুষ্ট নদী** ইহাতে সারা বৎসর সমভাবে জল পাওয়ার সুবিধা হয়। নদী শুধু বৃষ্টিপাত দ্বারা পূর্ণ হইলে শীতকালে জল কমিয়া যায়। ফলে বাঁধ দিয়া জল আটকানোর প্রয়োজন হয় এবং দাক্ষিণাত্যে এইভাবে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়।

(৪) **হিমবাহ**—নদীর উৎপত্তি স্থলের নিকটবর্তী উচ্চ ভূমিতে হিমবাহ থাকিলে উহা প্রচুর বরফগলা জলে পুষ্ট হইতে পারে।

(৫) **বরফমুক্ত**—নদী বরফমুক্ত না হইলে যখন জল জমিয়া বরফ হইবে তখন বিদ্যুৎ উৎপাদন হইবে না।

(৬) **প্রয়োজনবোধে নদীর গতিপথে বাঁধ দেওয়া বা বড় রকমের জলাধার প্রস্তুত করার সুবিধা**—ইহাতে কৃত্রিম জলপ্রপাত সৃষ্টি করা সহজসাধ্য হয়। ইহা

ছাড়া নদীর এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত অনেক সময় বাঁধ দিয়া জলাধার সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়। উক্ত জলাধারের জল লইয়া বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের পর প্রয়োজনমত নদীগর্ভে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যেখানে বাঁধ-নির্মাণ হইবে উহা পাহাড়ের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ স্থান হইলে ভাল হয়। ইহাতে বাঁধ-নির্মাণ ব্যয়ও কম পড়ে এবং সহজে বিদ্যুৎ উৎপাদনও হইতে পারে।

(৭) **অরণ্য**—ইহা জলপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রিত করে এবং ভূমিক্ষয়ও প্রতিরোধ করে। অরণ্যাঞ্চলের মধ্য দিয়া নদী প্রবাহিত হইলে জলধারার সমতা রক্ষা হয় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের সহায়ক হয়। ভূমিক্ষয় নিবারণ হইলে নদীর জল পরিষ্কার থাকে। ইহাতে বিদ্যুৎ যন্ত্র অনেকদিন কার্যকরী থাকে এবং বাঁধ দিয়া জলাধার সৃষ্টি করিলে পলি পড়িয়া শীঘ্র ভরাট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

(৮) **বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা**—বিদ্যুৎ-উৎপাদন ব্যয়সাধ্য। যে টাকা ব্যয় করিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন হইবে তাহার উপর উপযুক্ত পরিমাণ আয় হওয়াও প্রয়োজন। বিদ্যুতের প্রচুর চাহিদা থাকিলে প্রচুর আয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শিল্পপ্রধান ও জনবহুল স্থানগুলিতেই বিদ্যুতের চাহিদা বেশী।

(৯) বিদ্যুৎ-শক্তি ভিন্ন বন্যানিয়ন্ত্রণ, জলসেচ প্রভৃতি প্রয়োজন থাকা ভাল। তাহা হইলে নদী বহুমুখী নদী উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্গত হইতে পারে।

(১০) যে অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে তথায় কয়লা, খনিজ তৈল, গ্যাস প্রভৃতি না থাকা বা কম থাকা ভাল। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে উক্ত সম্পদ নিয়ন্ত্রণ বা সংরক্ষণের জন্য জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়, যেমন—যুক্তরাষ্ট্র, কিন্তু ইহাতে জলবিদ্যুৎ শক্তির একচেটিয়া চাহিদায় কিছুটা বিঘ্ন ঘটে।

(১১) জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র হইতে বর্তমানে ৩০০ মাইল দূর পর্যন্ত তার ও ট্রান্সমিশন টাওয়ারের সাহায্যে লইয়া যাওয়া যায়। সুতরাং চাহিদার কেন্দ্র কিন্তু দূরে অবস্থিত হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক দুই প্রকার অনুকূল অবস্থাই প্রয়োজন। নতুবা ইহার সম্যক উন্নতি সম্ভব নহে। দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকায় অনুকূল প্রাকৃতিক ব্যবস্থা আছে কিন্তু অনুকূল অর্থনৈতিক অবস্থা নাই। এজন্য জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন যৎসামান্য। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে উভয় প্রকার সুবিধা থাকায় তথায় প্রচুর জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হইতেছে।

নরওয়ে ও সুইডেনে কয়লার ও অন্যান্য জ্বালানির খুব অভাব। এজন্য সেখানে জলবিদ্যুৎ শক্তি প্রচুর উৎপন্ন হয়।

জার্মানী ও যুক্তরাষ্ট্রে কয়লা সম্পদে সমৃদ্ধ। কিন্তু উক্ত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও

জলবিদ্যুৎশক্তিও উন্নত। উক্ত সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণের জন্য এবং অন্যান্য সুবিধা অসুবিধা বিচার করিয়াই ইহা উৎপাদন হইতেছে।

Q. 11 Give an account of the present development of the water power in different parts of the world.

(পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের বর্তমান অবস্থার বিবরণ দাও।)

Ans : পৃথিবীর জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা (potentiality) এবং প্রকৃত উৎপাদন (actual development) একরূপ নয়। বিভিন্ন মহাদেশের জলবিদ্যুৎ শক্তির সম্ভাবনা ও উৎপাদন মোটামুটি নিম্নরূপ ;

	সম্ভাবনা (লক্ষ কিঃ ওঃ)	উৎপাদন লক্ষ কিঃ ওঃ		সম্ভাবনা (লক্ষ কিঃ ওঃ)	উৎপাদন লক্ষ কিঃ ওঃ
আফ্রিকা	৬২০০	৩	দক্ষিণ আমেরিকা	১৯০০	২০
এশিয়া	৩১০০	১০২	ইউরোপ	১৫৪০	৩২০
উত্তর আমেরিকা	১৯০০	৩৫০	ওশিয়ানিয়া	৬১০	১৫

(১) **উত্তর আমেরিকা :** এই মহাদেশেই সর্বাপেক্ষা বেশী জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। আবার এই মহাদেশের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রে বেশী উৎপন্ন হয়। ইহার নায়েগ্রা জলপ্রপাত এবং এ্যাপালেসিযান পর্বতের পূর্বদিকে ফল লাইন (fall line) সর্বাপেক্ষা অধিক জলবিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র। নিউইংল্যাণ্ড, হ্রদ অঞ্চল ও কানাডার দক্ষিণ-পূর্ব অংশের শিল্পউন্নত অঞ্চলের প্রযোজন এখান হইতে মিটিয়া থাকে। ইহা ছাড়া রকি পার্বত্য অঞ্চল ও কালিফোর্নিয়াও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সমধিক প্রসিদ্ধ। কানাডায় প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার সুযোগ থাকায় অন্যান্য শিল্পের মধ্যে কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজ শিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছে।

২) **ইউরোপ :** এই মহাদেশের মধ্যে নরওযে, সুইডেন, জার্মানী, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালি, রাশিযা ও ব্রিটেন জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য। মাথা পিছু জলবিদ্যুৎ উৎপাদন নরওয়েতে সবাপেক্ষা বেশী।

(৩) **এশিয়া :** এই মহাদেশে জাপান জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য। ইহার কয়লার অভাব, অথচ, ইহা শিল্পপ্রধান দেশ। এজন্য ইহাকে জলবিদ্যুতের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহা ছাড়া ভারত ও চীনে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হয। এশিয়ার অন্যান্য দেশ এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ।

পৃথিবীর কার্যকরী জলবিদ্যুৎ শক্তি ● ২০,০০০ ● ১০,০০০ • ১০০০ ১০ লক্ষ কিলোওয়াট প্রতি ঘন্টায়

(৪) **দক্ষিণ আমেরিকা :** এই মহাদেশে একমাত্র ব্রেজিলে শিল্প-সম্পদ বাড়িতেছে অথচ ইহার কয়লার অভাব। এখানেও জলবিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন বাড়িতেছে। দক্ষিণ আমেরিকায় অন্যান্য দেশ এবিষয়ে খুব পশ্চাৎপদ।

(৫) আফ্রিকা : এই মহাদেশ শিল্পে অনুন্নত। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও উহার উৎপাদন খুব কম। কেবলমাত্র ইউরোপীয় অধিকৃত অঞ্চলে কিছু জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইতেছে।

(৬) ওশিয়ানিয়া : এই মহাদেশের অষ্ট্রেলিয়া, টাসমানিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে সামান্য জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

Q 12 Is water power a free gift of nature? Write a brief account of the water power resources of Asia indicating the advantages and disadvantages of this continent for water-power development (C. U-Inter. 1956)

(জলবিদ্যুৎ শক্তি কি প্রকৃতির অবাধ দান? উৎপাদনের সুবিধা অসুবিধা উল্লেখ করিয়া এশিয়ার জলবিদ্যুৎ শক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

Ans জলবিদ্যুৎ শক্তি প্রকৃতির অবাধ দান একথা বলা চলে না। জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের উপযোগী অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে মাত্র। উহাতে মানুষের উদ্যম নিয়োজিত হইলে তবেই জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে।

এশিয়া মহাদেশে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা ৩১০০ লক্ষ কিলোওয়াট কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন মাত্র ১০২ লক্ষ কিলোওয়াট। এশিয়া মহাদেশে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের নিম্নলিখিত সুবিধা আছে ;

(১) এশিয়ার মধ্যভাগে সুউচ্চ পর্বত, মালভূমি, জলপ্রপাত, অনেক নদী প্রভৃতি বর্তমান। এশিয়া বৃহত্তম মহাদেশ। সমগ্র স্থলভাগের প্রায় ⅓ অংশ। এরূপ বিপুল আয়তনের জন্য জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী খরস্রোতা নদীর অভাব নাই।

(২) সুউচ্চ পর্বতগুলি তুষারাচ্ছন্ন। মৌসুমীবায়ু পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় প্রচুর বারিপাতও হয়। এজন্য হিমালয় পর্বতশ্রেণী হইতে উৎপন্ন দক্ষিণ বা দক্ষিণ পূর্ব-বাহিনী নদীগুলি বরফগলা ও বৃষ্টির জলে পুষ্ট।

(৩) যে সমস্ত নদী শুধুমাত্র জলে পুষ্ট সেখানে নদীতে বাঁধ দিয়া জল সঞ্চয় করিয়া রাখার মত স্থানের অভাব নাই। যেমন ভারতের দাক্ষিণাত্যের নদীগুলি।

(৪) একমাত্র উত্তরের নদীগুলি ভিন্ন প্রায় সর্বত্রই প্রাকৃতিক পরিবেশ জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের অনুকূল।

কিন্তু এই মহাদেশের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কতকগুলি অসুবিধাও আছে। উহা প্রধানতঃ নিম্নরূপ :

(১ এশিয়ার মধ্যে জাপানই একমাত্র শিল্পোন্নত দেশ। ভারত ও চীন ইদানিং কিছুটা শিল্পোন্নত হইয়াছে। অন্যান্য দেশগুলি শিল্পে অনুন্নত। আবার অনেক দেশ জনবিরল। এজন্য জলবিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা কম।

(২) ইহা ছাড়া অন্য জালানি বা ইন্ধনও অনেক দেশে আছে। এজন্য কেবল মাত্র জাপান, ভারত এবং ইদানিং চীন ছাড়া অন্যত্র জলবিদ্যুৎ শক্তি সামান্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(৩) অনেক দেশ শিল্পের উন্নতির প্রয়োজনও বোধ করে না। কৃষিকার্য্যে দ্বারা কাঁচামাল উৎপাদন এবং উহা রপ্তানি করিয়াই উহাদের প্রযোজন মিটিয়া যায়।

(৪) ভারতের রাজস্থান, ইরাক, ইরাণ, আরব প্রভৃতি আবার মরু প্রকৃতির। এ অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধাও কম

Q. 13 Write an account of the development of the water power resources of India and discuss the benefit of such development on our economic life. How is it that most of the hydro-electric installations are located in the Deccan ?

(ভারতে জলশক্তি সম্পদের বিবরণ লিখ এবং উহা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতিতে কিরূপ উপকার সাধন করিতেছে তাহার আলোচনা কর। ভারতের অধিকাংশ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত কেন ?)

Ans ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা আছে। বন্ধুর ভূপ্রকৃতি, প্রচুর বৃষ্টিপাত, নিয়মিত প্রবহমান খরস্রোতা নদী, জলপ্রপাত প্রভৃতি কোনটারই অভাব নাই। ইহা ছাড়া কয়লা ও খনিজ তৈলের অপ্রাচুয, ঘনবসতি, ক্রমবর্ধমান শিল্প সমৃদ্ধি প্রভৃতি জলবিদ্যুৎ আহরণের প্রেরণা যোগাইতেছে। ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা শক্তি ৪ কোটি কিলোওয়াটের উপরে। কিন্তু বর্তমানে উহার উ পাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। বর্তমান উৎপাদনের পরিমান প্রায় ১৩ লক্ষ কিলোওয়াট। যে সমস্ত অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হইতেছে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :

(১) **মহারাষ্ট্র : এখানকার পশ্চিম ঘাট পর্বত মালার উপর ভিপুরী (অন্ধ্রভ্যালী), খোপলি (লোনাভলা), ভীরা (নিলামূলা) ও চোলায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন**

কেন্দ্র স্থাপিত আছে। উক্ত চারিটি উৎপাদন কেন্দ্র হইতে মোট প্রায় ৩ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইতেছে। ইহারা প্রধানতঃ বোম্বাই, থানা, কল্যান প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়া থাকে।

(২) **মহীশূর:** ভারতে প্রথম ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এখানকার শিবসমুদ্রমে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পরে সিমসা ও যোগপ্রপাতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই তিনটি উৎপাদন কেন্দ্র তারের সাহায্যে পরস্পর সংযুক্ত। এখান হইতে কোলার স্বর্ণ খনি, বাঙ্গালোর ও অন্যান্য ২০৬টি শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়। বর্তমানে এখান হইতে মাদ্রাজ ও বোম্বাই রাজ্যেও সরবরাহ হইতেছে। এখানে মোট ১ লক্ষ ৩০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে।

(৩) **মাদ্রাজ:** মেতুর, পাইকারা, ও পাপনাশম ও ময়ারে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত আছে। ইহারা বিদ্যুৎবাহী তারের সাহায্যে পরস্পর সংযুক্ত এবং মাদ্রাজের বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়া থাকে। এই সমস্ত কেন্দ্র হইতে প্রায় ১ লক্ষ ৩৭ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইতেছে।

(৪) **কেরালা:** এখানে পল্লীভাসাল ও সেঙ্গুয়ালম জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র। ইহারা তারের সাহায্যে পরস্পর সংযুক্ত। ইহারা মোট ৮২ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং কেরালায় এ্যালুমিনিয়াম শিল্পের ও অন্যান্য প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। মহীশূর, মাদ্রাজ ও কেরালার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে চক্রপ্রথায় (Grid system) পরস্পর সংযুক্ত করা হইয়াছে।

(৫) **কাশ্মীর:** এখানকার বারমুল্লা প্রধান জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। ইহার সাহায্যে শ্রীনগর আলোকিত হয় এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়। ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে আরও নূতন নূতন পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

(৬) **পাঞ্জাব:** এখানকার মণ্ডিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত। ইহা ছাড়া ভাক্রা-নাঙ্গাল পরিকল্পনার নাঙ্গাল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে। এখানে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে এবং অমৃতসর, লুধিয়ানা, জলন্ধর প্রভৃতি স্থানে এবং রেলপথে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে।

(৭) **উত্তর প্রদেশ:** এখানকার গঙ্গাখালের জলপ্রপাত হইতে অনেক স্থানে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। তন্মধ্যে বাহাদুরাবাদ, হরিদ্বার, ভোলা, সালওয়া, পালরা, সুমেরা, চিতোরা, মহম্মদপুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া পাথরা ও

সর্দা কেন্দ্র হইতেও বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে। এখানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমান প্রায় ৫০ হাজার কিলোওয়াট।

(৮) উপরিউক্ত স্থানগুলি ছাড়া অন্ধ্রের মাচকুঁদ (১০ হাজার কিঃ ওঃ), উড়িষ্যার হিরাকুঁদ (২ লক্ষ ৭২ হাজার কিঃ ওঃ), মধ্যপ্রদেশের খাপার খেদা (৩০ হাজার কিঃ ওঃ), বিহারের মাইথন (৬০ হাজার কিঃ ওঃ), পাঞ্চেত (৪ হাজার কিঃ ওঃ), অন্ধ্রের তুঙ্গাভদ্রা, নাগার্জুনসাগর, আসামের শিলং, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং প্রভৃতি অঞ্চল হইতেও কিছু কিছু জলবিদ্যুৎ পাওয়া যাইতেছে।



নদী উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণ হইলে বিদ্যুৎ সরবরাহ অনেকগুণ বাড়িয়া যাইবে।

জলবিদ্যুৎ ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রও আছে।

ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে জলবিদ্যুৎ প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে। ভারতে কয়লা খুব প্রচুর নহে। খনিজ তৈলের অভাব আমরা বিশেষ অনুভব করিতেছি। কয়লা ও খনিজ তৈল সমভাবে বণ্টিত নয়। এজন্য অনেক স্থানে জলবিদ্যুতের উপর নির্ভর করা শ্রেয়। ইহার ভাণ্ডার অফুরন্ত এবং দামেও সস্তা। এই সুবিধার জন্য দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান ও রেলপথ জলবিদ্যুতের সাহায্যে চলিতেছে এবং শহর, গ্রাম আলোকিত হইতেছে। গৃহস্থালির কাজ সম্পন্ন হইতেছে এবং কুটিরশিল্পও চলিতেছে। অ্যালুমিনিয়াম শিল্প, কৃত্রিম সার তৈয়ারী, কাষ্ঠ শিল্প প্রভৃতি যাহাতে অত্যধিক উত্তাপ প্রয়োজন তাহাতে জলবিদ্যুৎ-শক্তির ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

বর্তমানে যে জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইতেছে উহার অধিকাংশ দক্ষিণ ভারতেই কেন্দ্রীভূত। ইহার কারণ দক্ষিণ ভারতের খরস্রোতা নদী, জলপ্রপাত, পশ্চিমঘাট অঞ্চলের প্রচুর বৃষ্টিপাত, ভূমিভাগ শক্ত, পার্বত্য অঞ্চলেই নদীর পরিসর কম বলিয়া বাঁধ নির্মাণের সুবিধা, কয়লা খনি হইতে দূরত্ব, শিল্প প্রসারের প্রয়োজনীয়তা ও বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা।

উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলেও নদীগুলি খরস্রোতা এবং বরফগলা ও বৃষ্টির জলে পুষ্ট সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ অঞ্চল অপেক্ষাকৃত দুর্গম এবং স্রোতবেগ ও ভীষণ। এজন্য বাঁধ নির্মাণ সমস্যাপূর্ণ। ইহা ছাড়া উত্তর ভারতের অনেক অঞ্চলের শিল্প প্রতিষ্ঠান কয়লা ও তৈল অপেক্ষাকৃত সহজে ও সস্তায় পাইয়া থাকে। যে অঞ্চলগুলি যেমন উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও কাশ্মীর কয়লা সম্পদ হইতে দূরে সেখানে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন স্বভাবতঃই কিছু বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

Q. 14. How does Hydro-electricity differ from other sources of power? Discuss its comperative advantages.

(জলবিদ্যুৎশক্তি হইতে অন্যান্য শক্তির পার্থক্য কি? তুলনামূলকভাবে ইহার সুবিধা বর্ণনা কর)।

Ans অন্যান্য শক্তি হইতে জলবিদ্যুৎ শক্তির পার্থক্য ও সুবিধা নিম্নলিখিত উপায়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(১) কয়লা, খনিজ তৈল, গ্যাস প্রভৃতি শক্তি কালক্রমে নিঃশেষ হইতে পারে, কিন্তু জলপ্রবাহ হইতে উৎপন্ন শক্তি চিরস্থায়ী।

(২) অন্যান্য শক্তি অপেক্ষা জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের প্রাথমিক ব্যয় কিছু

বেশী হইলেও, ইহার চলতি ব্যয় কম এবং এজন্য অপেক্ষাকৃত সস্তায় জলবিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া সম্ভব।

(৩) যে স্থানে জলবিদ্যুৎ শক্তির আধার সে স্থান হইতে ৩০০ মাইল দূরেও উক্ত শক্তি পাঠান সম্ভব, কিন্তু অন্য শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র হইতে অন্যত্র লইয়া গিয়া ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে অন্য শক্তির জন্য পরিবহন ব্যয় অধিক দিতে হয়।

(৪) যে স্থানে অন্য শক্তির অপ্রতুলতা সেখানে অন্য শক্তি আমদানী করা অপেক্ষা বিদ্যুৎশক্তি আমদানি করা সহজ ও সস্তা। তবে অন্য শক্তি ভিন্ন দেশ হইতে আমদানি করা যেমন সম্ভব, জলবিদ্যুৎ শক্তি তেমন নয়।

(৫) কৃত্রিম সার উৎপাদন, এ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন প্রভৃতিতে যে প্রচণ্ড উত্তাপের প্রয়োজন হয় উহা জলবিদ্যুৎ ভিন্ন অন্য শক্তি হইতে পাওয়া সম্ভব নয়।

(৬) জলবিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ বা বন্ধ করা খুব সহজ। কারণ একটি মাত্র কল বা চাবি, টিপিলেই উহার গতি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে।

(৭) জলবিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করিলে বাসগৃহ, রেলগাড়ী প্রভৃতি পরিচ্ছন্ন থাকে এবং ধোঁয়ার জন্য স্বাস্থ্যহানির এবং অন্য অসুবিধার ভয় থাকে না।

লৌহ ঃ

Q 15 Name the principal varieties of Iron Ore. State also the uses of Iron Ore.

(লৌহ আকরিকের প্রধান শ্রেণীগুলির নাম কর। উহার ব্যবহারও উল্লেখ কর।)

Ans খনি হইতে যে লৌহ উত্তোলিত হয় উহাতে প্রচুর ময়লা থাকে। উক্ত ময়লাযুক্ত লৌহকে লৌহ আকরিক বলে। লৌহ আকরিকের ময়লা নিষ্কাশনের পর উহা ব্যবহার যোগ্য হয়।

লৌহ আকরিককে (Iron Ore) নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে :

(১) ম্যাগনেটাইট (Magnetite) : ইহার রং কাল এবং ইহাতে প্রায় শতকরা ৭২ ভাগ লৌহ থাকে। এজন্য ইহাই লৌহ আকরিকের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।

(২) হেমাটাইট (Haematite বা Hematite) : ইহার রং লাল এবং ইহাতে শতকরা ৫৫ হইতে ৭০ ভাগ পর্য্যন্ত লৌহ থাকে। ইহাও উচ্চ শ্রেণীর লৌহ আকরিক। ইহা হইতে ময়লা সহজে দূর করা চলে।

(৩) লিমনাইট (Limonite) : ইহার রং ধূসর এবং ইহাতে শতকরা ৩০ হইতে ৬০ ভাগ পর্য্যন্ত লৌহ থাকে।

সিডারাইট (Siderite) : ইহা লিমনাইটের মত গুণসম্পন্ন।

লৌহের ব্যবহার নানাবিধ। যদিও ইহার আর্থিক মূল্য সোনা বা রূপার তুলনায় অনেক কম, প্রয়োজনের দিক দিয়া ইহা মানুষের অমূল্যসম্পদ। বর্তমান যুগকে লৌহযুগ (Iron Age) বলা চলে। ইহা আমাদের গৃহস্থালির প্রয়োজনে ব্যবহৃত দা, কাস্তে, কোদাল, হাতা, খন্তি কড়াই প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে, গৃহাদি ও যন্ত্রপাতি নির্মাণে, আত্মরক্ষার জন্য তলোয়ার, বল্লম, ছোরা প্রভৃতি এবং নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র যেমন, কামান, বন্দুক প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। লৌহ হইতে যে ইস্পাত প্রস্তুত হয় উহা অনেক ঘাতসহ ও ভারসহ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে লাগিয়া থাকে। বড় বড় কলকারখানা, জাহাজ, রেলপথ, রেল ইঞ্জিন সেতু, এরোপ্লেন ও অনেক মূল্যবান ও সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে ইস্পাত অপরিহার্য্য উপাদান। বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন যন্ত্রাদি, রেডিও সেটের ডাইনামো প্র ;তি প্রস্তুত করিতেও লৌহ ও ইস্পাতের প্রয়োজন। সুতরাং বর্তমান যুগে লৌহ ছাড়া আমাদের চলিবার উপায় নাই—সংক্ষেপে ইহাই বলা চলে।

লৌহের গুণাগুণ অবশ্য লৌহ আকরিকের মধ্যে লৌহের পরিমাণের উপব নির্ভর করে। লৌহ সর্বত্রই পাওয়া যায়। ভূত্বকের উপরিভাগের শতকরা ৪ ভাগ লৌহ। কিন্তু সকল স্থান হইতে লৌহ সংগ্রহ করা লাভজনক নহে। যে লৌহ আকরিক গালাইলে অন্ততঃ শতকরা ৪০ ভাগ লৌহ পাওয়া যায়, সেই লৌহ আকরিক সংগ্রহ দ্বারা লৌহ ও ইস্পাত তৈয়ারীর কাজ লাভজনক চলিতে পারে। লৌহ আকরিকের মধ্যে অতি মাত্রায় গন্ধক বা ফসফরাস থাকা ক্ষতিকর। লৌহ আকরিক সংগ্রহ ব্যয়ও উহার লাভজনক কার্য্যকারিতার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। অনেক দুর্গম স্থানে যেমন ভারতে ও ব্রেজিলে শতকরা ৮০ ভাগ লৌহ বিশিষ্ট লৌহ আকরিক আছে, কিন্তু লাভজনকভাবে কাজে লাগান এখনও সম্ভব হয় নাই। অথচ ব্রিটেন ও জার্মানীতে শতকরা ৩০ ভাগ লৌহযুক্ত আকরিকও লাভজনকভাবে সংগৃহীত হইতেছে। সুতরাং লৌহ আকরিক ব্যবহারের কথা চিন্তা করিলে এ দিকটাও চিন্তা করা উচিত।

Q. 16. Give a brief account of the world distribution of Iron-Ore. Also mention three principal fields of India raising Iron ore (B U Entrance, 1963)

(পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লৌহ আকরিক সম্পদের বিবরণ দাও। এ প্রসঙ্গে ভারতের প্রধান তিনটি লৌহ আকরিক খনির নাম উল্লেখ কর।)

A. 16 পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লৌহ আকরিক সম্পদের বিবরণ নিম্নলিখিতভাবে দেওয়া হ্ল :

উত্তর আমেরিকা : ইহা লৌহ আকরিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এই মহাদেশের নিম্নলিখিত দেশগুলি লৌহ আকরিক উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য।

(ক) **যুক্তরাষ্ট্র :** ইহার সুপিরিয়র হ্রদ অঞ্চল মোট উৎপাদনের অর্ধেক উৎপন্ন করিয়া থাকে। সুপিরিয়র হ্রদের পশ্চিমে ও দক্ষিণের মিনেসোটা, উইস্কন্‌সিন্ ও মিচিগান রাষ্ট্রের মেসাবি, কুইনা, লৌহ পর্বত, ভারমিলিয়ান পর্বত, গোজেবিক, মনোমিনি, মারকোয়েট প্রভৃতি স্থানে খনিগুলি অবস্থিত। ইহা ছাড়া আলবামা, রকি পর্বত ও নিউইয়র্কে লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। লৌহ আকরিক হইতে গড়ে ৫০ ভাগ লৌহ পাওয়া যায়। অধিকাংশ হেমাটাইট জাতীয়। ইহার পিটস্‌বার্গ ও বার্মিংহাম প্রধান লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদক অঞ্চল। কয়লা, লৌহ, চুনাপাথর কাছাকাছি অবস্থিত বলিয়া এবং সুলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য্য হেতু লৌহ ও ইস্পাত সস্তায় প্রস্তুত হইতে পারে। দেশের লৌহ আকরিক সামান্য রপ্তানি হইলেও দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশ হইতে ইহা লৌহ আকরিক আমদানি করিয়া থাকে। ১৯৬১ সালে এই দেশে প্রায় ৭ কোটি ৮০ লক্ষ টন লৌহ আকরিক এবং ৯ কোটি টন ইস্পাত উৎপন্ন করিয়া থাকে। পৃথিবীর মধ্যে লৌহ আকরিক উৎপাদনে ইহার স্থান দ্বিতীয়।

(খ) **কানাডা :** ১৯৬১ সালে ১ কোটি ৯৪ টন উৎপন্ন করে। কানাডায় লৌহ আকরিক পাওয়া যায় অন্টেরিও, কুইবেক, লাব্রাডার, আলবার্টা, স্যাসকাচুয়ান, নোভাস্কোসিয়া, কলম্বিয়া ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে। কয়লার অসচ্ছলতার জন্য ইহা লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ততটা উন্নত নয়।

(গ) **মেক্সিকো**-তে সামান্য পরিমাণ লৌহ আকরিক পাওয়া যায়।

২। **ইউরোপ :** এই মহাদেশও লৌহ আকরিক সম্পদে সমৃদ্ধ। ইহার নিম্নলিখিত দেশগুলি লৌহ আকরিক উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য।

(ক) **রাশিয়া :** ইহার স্থান প্রথম। ১৯৬১ সালে ইহা ১২ কোটি টন লৌহ আকরিক এবং ৭½ কোটি টন লৌহ ও ইস্পাত উৎপন্ন করে। ইহার প্রধান খনি ডনেৎসের দক্ষিণে ক্রিভয়রগ। ইহা ছাড়া উরালের ম্যাগনেটোগর্স্ক; মধ্য রাশিয়ার কুর্স্ক, সাইবেরিয়ার কুজবাস, উত্তরের মুরমানস্ক, উত্তর-পশ্চিমে লেলিনগ্রাড, দক্ষিণ-পূর্বে বৈকাল হ্রদ ও ভ্লাডিভস্টক উল্লেখযোগ্য।

(খ) **জার্মানী :** ইহার স্যাক্সনি ও ওয়েষ্টফালিয়া (রুঢ) লৌহ আকরিক উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম জার্মানীই লৌহ শিল্পে সমধিক প্রসিদ্ধ। তবে ইহাকে ফ্রান্স, সুইডেন প্রভৃতি দেশ হইতে লৌহ আকরিক আমদানি করিতে হয়। ১৯৬১ সালে ইহা ১ কোটি ৩১ লক্ষ টন লৌহ আকরিক উৎপন্ন করে।

(গ) **পোল্যাণ্ড :** ইহার জার্মানী হইতে প্রাপ্ত সাইলেসিয়ার খনি উল্লেখযোগ্য।

(ঘ) **ফ্রান্স :** ইহার পূর্ব দিকে লোরেন খনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া মধ্যভাগের মালভূমি, নর্মাণ্ডি, ব্রিটানি, পিরেনিজ পর্বতে আকরিক পাওয়া যায়। লোরেন খনি উচ্চশ্রেণীর আকরিক উত্তোলন না করিলেও রূঢ় কয়লা খনির নিকট অবস্থিত বলিয়া ইহার গুরুত্ব বেশী। ১৯৬১ সালে ইহা ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টন লৌহ আকরিক উৎপন্ন করে এবং পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

(ঙ) **ব্রিটেন :** ক্লিভল্যাণ্ড পাহাড়, কাম্বারল্যাণ্ড, ল্যাঙ্কাশায়ার ও লিঙ্কনসায়ারে ইহার উল্লেখযোগ্য খনি অবস্থিত। আকরিক বিশেষ উচ্চ শ্রেণীর নহে। ইহাকে ফ্রান্স, সুইডেন, স্পেন ও কানাডা হইতে আকরিক আমদানি করিতে হয়। ১৯৬১ সালে ইহা ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টন লৌহ আকরিক উৎপন্ন করে। ইহার লৌহ ও ইস্পাত শিল্পও খুব উন্নত।

(চ) **সুইডেন :** ইহার উত্তরে কিরুণা ও গেলিভারা প্রধানতঃ লৌহ আকরিক উৎপন্ন করিয়া থাকে। ১৯৬১ সালে ইহা ২ কোটি ৩১ লক্ষ টন উৎপন্ন করে। ইহার অধিকাংশ আকরিক নরওয়ের নারভিক বন্দর দিয়া বিদেশে রপ্তানি হয়।

(৪) **লুক্সেমবার্গ :** এখানে ১৯৬১ সালে ৭০ লক্ষ টন আকরিক উত্তোলিত হয়।

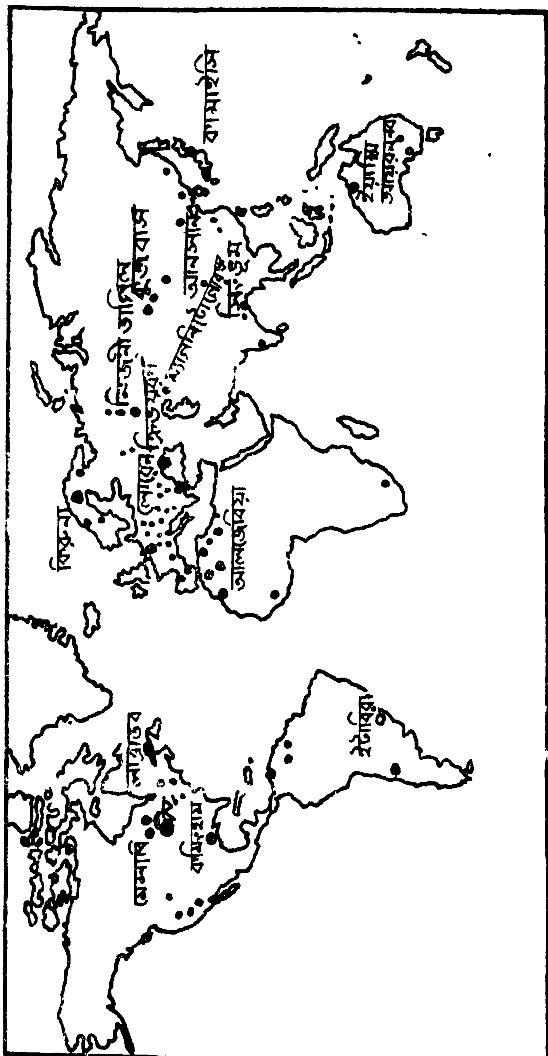
ইহা ছাড়া ইউরোপের স্পেন (সানটানডার ও বিলাবাও—আকরিক রপ্তানি-যোগ্য) ও বেলজিয়ামে কিছু উৎপন্ন হয়। ইহাদের প্রত্যেকের উৎপাদনের পরিমাণ মোট উৎপাদনের শতকরা ২ ভাগ।

৩। **এশিয়া :** এই মহাদেশে কয়েকটি দেশ ছাড়া লৌহ আকরিকে খুব বেশী সমৃদ্ধ নহে। ইহার নিম্নলিখিত দেশগুলি উল্লেখযোগ্য।

(ক **ভারত :** ইহা লৌহ সম্পদে সমৃদ্ধ। ইহার খনিগুলির মধ্যে বিহারের সিংভূম, উড়িষ্যার বোনাই, কেওঞ্জর, ময়ুরভঞ্জ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যেও খনি আছে। ১৯৬১ সালে ভারত ১২১ কোটি টন লৌহ আকরিক উৎপন্ন করে। ইহার লৌহ ও ইস্পাত শিল্প উন্নতির পথে। তথাপি ইহা ২৫ লক্ষ টন আকরিক বিদেশে রপ্তানি করে।

(খ) **চীন :** ইহার সানসি, সেনসি, হোনান ও জেফুয়ান লৌহখনির জন্য প্রসিদ্ধ। আনসানে ইহার লৌহ গালাই কেন্দ্র। চীনের উত্তরে মাঞ্চুরিয়াতেও প্রচুর লৌহখনি আছে। চীন লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে উন্নতির পথে।

(গ) **জাপান :** কামাইসি, হোক্কাইডো, সেণ্ডাই ও মেরোরনে প্রধান খনি অঞ্চল। জাপান লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে উন্নত। এজন্য আকরিক উৎপাদন প্রয়োজনের



পৃথিবীর আকরিক লৌহ

তুলনায় কম এবং ভারত, মালয়, ফিলিপাইন, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। ১৯৬১ সালে ইহার আকরিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩০ লক্ষ টন।

৪। দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে **ভেনিজুয়েলা** (উৎপাদন ১৯৬১ সালে ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টন), চিলি ও ব্রেজিল লৌহ আকরিক উৎপাদন উল্লেখযোগ্য। কয়লার অভাবে ইহারা আকরিক বিদেশে রপ্তানি করে।

৫। আফ্রিকার আলজিরিয়া, টিউনিস ও দক্ষিণ আফ্রিকায় লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। ইহাও রপ্তানিকারক অঞ্চল।

৬। অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে 'আয়রণনব' পাহাড় লৌহ খনির জন্যে উল্লেখযোগ্য।

১৯৬১ সালে পৃথিবীতে মোট লৌহ আকরিক উৎপন্ন হয় প্রায় ৪৩২৮ কোটি মেট্রিক টন।

পৃথিবীর মোট সঞ্চিত লৌহ আকরিকের পরিমাণ প্রায় ৫৭৮১ কোটি টন। ইহার মধ্যে বিভিন্ন দেশের পরিমাণ নিম্নরূপ: ভারত ২১০০ কোটি টন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১০৪৫ কোটি টন, ফ্রান্স ৮১৬ কোটি টন, ব্রেজিল ৭০০ কোটি টন, বৃটেন ৫৯৭ কোটি টন, সুইডেন ২২৩ কোটি টন ও রাশিয়া ২০৬ কোটি টন।

Q 17. Give a short account of the iron ore resources of India
(ভারতের লৌহ আকরিক সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।)

Ans. ভারত লৌহ আকরিক সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। ইহার সঞ্চিত উচ্চশ্রেণীর লৌহ আকরিকের পরিমাণ প্রায় ২১০০ কোটি টন। ইহা ছাড়া মধ্যম ও নিম্নশ্রেণীর লৌহ আকরিক অফুরন্ত।

আবার ভারতে অধিকাংশ লৌহ খনিগুলি উহা গালাইবার উপযুক্ত কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, চুনাপাথর, ডলোমাইট খনিগুলির সন্নিকটে অবস্থিত। বিভিন্ন খনি অঞ্চলগুলি বড় বড় শহরের সহিত যানবাহন দ্বারা সংযুক্ত। এজন্য লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া তোলার সুন্দর সুযোগ-সুবিধা আছে। দেশ পরাধীন থাকায় সে সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করা হয় নাই। বর্তমানে জাতীয় সরকার এদিকে মনোনিবেশ করিয়াছেন—ইহা আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। ভারতের লৌহ খনিগুলি নিম্নলিখিত স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়:

(১) বিহার: সিংভূম জেলা (বুদাবুরু, পানশিরা, বুরু, গুয়া ও নোয়ামুণ্ডি)। বিহারই বর্তমানে সর্বাপেক্ষা বেশী উচ্চশ্রেণীর হেমাটাইট লৌহ আকরিক উৎপন্ন

করিয়া থাকে (৩৮%)। ইহার লৌহ আকরিক টাটা ও অন্যান্য ইস্পাত শিল্পে রেলপথে প্রেরিত হয়।

(২) উড়িষ্যা ঃ কেওনঝড় (বাগিয়াবুরু), ময়ুরভঞ্জ (গুরুমহিশানি, সুলাইপাত বাদাম পাহাড়) ও বোনাই। এখান হইতেও রেলপথে টাটা, বানপুর ও



রাউরকেল্লা ইস্পাত শিল্পে প্রেরিত হয়। ভারতের মধ্যে লৌহ আকরিক উৎপাদনে ইহা দ্বিতীয়।

(৩) মধ্যপ্রদেশ ঃ দ্রাগ, (ঢালি, রাজহারা) ও বাস্তার। ভিলাই ইস্পাত

কারখানা এখান হইতে প্রধানতঃ লৌহ আকরিক পায়। এ খনিগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির পথে।

(৪) মহীশূর: বাবাবুদান পাহাড়, তিপ্পুর ও চিতলদ্রাগ। এখানে লৌহ আকরিক উচ্চশ্রেণীর। ভদ্রাবতী ইস্পাত কারখানা এখান হইতে লৌহ আকরিক পায় এবং কয়লাব অভাবে কাঠ কয়লা দিয়া লৌহ গালাই আরম্ভ করে।

(৫) মহারাষ্ট্র: রত্নগিরি, গোয়া ও চান্দা।

(৬) অন্ধ্র: নেলোর, কুডপ্পা ও কুর্নুল।

(৭) মাদ্রাজ: ত্রিচিনপল্লী ও সালেম।

ইহা ছাড়া উত্তর প্রদেশের আলমোড়া, গুজরাট, পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গে (বাঁকুড়া) লৌহের খনি আছে।

ভারত প্রায় ২৫ লক্ষ টন লৌহ আকরিক জাপান, যুক্তরাজ্য, সিংহল ও যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে। ১৯৬১ সালে ভারতে লৌহ আকরিক উৎপন্ন হয় ১'২১ কোটি টন। ভারত হইতে লৌহ আকরিক আমদানীতে জাপান বিশেষ আগ্রহশীল। এজন্য উড়িষ্যার পরদ্বীপে বন্দর গঠিত হইয়াছে এবং জাপানের সহযোগিতায় মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার দুর্গম স্থানে লৌহ উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য রেলপথ নির্মিত হইতেছে। লৌহ আকরিক কলিকাতা, বিশাখাপত্তনম ও রত্নগিরি দিয়াও বিদেশে রপ্তানি হয়। ইহা বৈদেশিক মুদ্রা আহরণে পরম সহায়ক। এজন্য ইহার রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কাকিনাদা, কুড্ডালোর, কারোয়ার প্রভৃতি বন্দরও উন্নত করা হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে উৎপাদনও অনেক বৃদ্ধি পাইবে এবং রপ্তানির পরিমান বৃদ্ধি পাইবে।

বর্তমানে ভারত লৌহ ও ইস্পাত ও উৎপাদনেও মনোনিবেশ করিয়াছে। বর্তমানে জামসেদপুর, বার্ণপুর, কুলটি, দুর্গাপুর, ভিলাই, রুঢ়কেল্লা ও ভদ্রবতীতে লৌহ ও ইস্পাত উৎপন্ন হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বোকারোতে আরেকটি ইস্পাত কারখানা প্রস্তুত হইবে।

তামা:

Q 18. Write an account of the world distribution of copper deposits. Mention also its uses.

(পৃথিবীর তাম্র উৎপাদনের বিবরণ লিখ। উহার ব্যবহারও উল্লেখ কর।)

Or

Mention the uses of Copper. What are the leading copper

producing countries of the world? Give an idea of the position of the Indian Union in this respect. (C. U. Pre, 1962)

(তাম্রের ব্যবহার উল্লেখ কর। পৃথিবীর কোন কোন দেশে প্রধানতঃ তাম্র উৎপন্ন হয়? এ ব্যাপারে ভারতের অবস্থা বর্ণনা কর।)

Ans. তাম্র উৎপাদনে নিম্নলিখিত দেশগুলি উল্লেখযোগ্য :

১। উত্তর আমেরিকার

(ক) যুক্তরাষ্ট্র—খনি অঞ্চল : মণ্টানা, আরিজোনা, কলোরাডো ও সুপিরিয়র হ্রদের তীরবর্তী অঞ্চল। উৎপাদনের পরিমাণ ১২ লক্ষ ১৮ হাজার টন (১৯৬১)। উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম। উক্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে আরিজোনার উৎপাদন সবচেয়ে বেশী—প্রায় ½ অংশ।

(খ) কানাডা—খনি অঞ্চল : সাডবেরী (প্রধান), কুইবেক ও রকি অঞ্চল। উৎপাদন ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টন (১৯৬১)। সাডবেরীর তাম্র নিকেলের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

(গ) মেক্সিকো—উৎপাদন সামান্য আরিজোনা খনির সম্প্রসারিত অংশ।

(ঘ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ : উৎপাদন সামান্য।

২। দক্ষিণ আমেরিকার

(ক) চিলি—খনি অঞ্চল : আটাকামা ও সান্তিয়াগো। প্রধান তাম্র রপ্তানিকারক দেশ। উৎপাদন ৫ লক্ষ ৯ হাজার টন (১৯৬১)।

(খ) পেরু—সামান্য উৎপাদন।

৩। ইউরোপের

রাশিয়া খনি অঞ্চল : কাজাকস্তান, বলখাস হ্রদ অঞ্চল, উজবেকিস্তান ও আর্মেনিয়া।

(খ) ইহা ছাড়া জার্মানী, যুগোশ্লাভিয়া, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড, স্পেন প্রভৃতি দেশে তাম্র পাওয়া যায়। জার্মানীর উৎপাদন ৩ লক্ষ ৭ হাজার টন (১৯৬১)। ইউরোপ সম্পদে দরিদ্র এবং প্রধান আমদানিকারক মহাদেশ।

৪। আফ্রিকার স্থান দক্ষিণ আমেরিকার পরেই। ইহার উত্তর রোডেসিয়া ও কঙ্গো (কাটাঙ্গা) তাম্র উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য। রোডেসিয়ার তাম্র নিকৃষ্ট শ্রেণীর, কিন্তু কঙ্গোর তাম্র উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। রোডেসিয়ার উৎপাদন ৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টন (১৯৬১) এবং কঙ্গোর উৎপাদন ২ লক্ষ ৮৮ হাজার টন (১৯৬১) । ইহার প্রধান রপ্তানিকারক মহাদেশ।


পৃথিবী
▲ - তামার খনি

৫। এশিয়ার মধ্যে জাপানে ও ভারতে তাম্র পাওয়া যায়। জাপানের উৎপাদন মোটামুটি মন্দ নয়। ইহার এসিও, বেসি, কোসাকো, হিতাচী ও সাগানাসাকি তাম্র উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য এবং ওসাকা একটি উত্তম তাম্র শোধন কেন্দ্র। ভারতের উৎপাদন সামান্য—মাত্র ৯ হাজার টন। নেপাল, সিকিম উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত কুমায়ুন ও গাড়োয়াল অঞ্চল, রাজপুতানা, বিহারের সিংভূম, হাজারিবাগ, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে তাম্র মিশ্রিত খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য খনি হইতেছে সিংভূম জেলার গোসাবানিতে। মৌভাণ্ডারে ইহা পরিশোধিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, রোডেশিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে ভারত ২০ কোটি টাকা মূল্যের প্রায় ২৫,০০০ টন তাম্র আমদানি করে। ভারতীয় আকরিকে তাম্রের ভাগও মাত্র ৩%।

তাম্রের ব্যবহার :

তাম্রযুগে তৈজসপত্র, অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্রাদি সবই তাম্র দ্বারা প্রস্তুত হইত। বর্তমানেও ইহার ব্যবহার ব্যাপক। প্রথমতঃ ইহা মুদ্রা, বাসন ও যন্ত্রাদি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। তাম্রের সহিত দস্তা মিশাইয়া পিতল ও টিন মিশাইয়া ব্রোঞ্জ প্রস্তুত করা হয়। সোনার সহিত সামান্য তাম্র মিশাইয়া গিনি সোনা তৈয়ারী হয়। ইহা বিদ্যুৎ পরিচালনক্ষম। এজন্য বৈদ্যুতিক শিল্পে ইহার ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া টেলিগ্রাফ, উত্তাপ উৎপাদন, শক্তি উৎপাদন, মোটরগাড়ী, রেফ্রিজারেটর ও তাপ সংরক্ষণ যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

এ্যালুমিনিয়াম ঃ

Q. 10. Mention the commercial uses and sources of supply of Aluminium

(এ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার ও উৎপাদক অঞ্চল উল্লেখ কর।)

Ans. এ্যালুমিনিয়াম অত্যন্ত হাল্কা ও উজ্জ্বল অথচ খুব শক্ত পদার্থ। ইহাতে মরিচা ধরে না। ইহাকে সুন্দরভাবে নানা রংয়ে রঞ্জিত করা যায়। এজন্য ইহা বহুবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহা ইস্পাতের খাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গৃহস্থালীর বাসনপত্র, আসবাবপত্র, এরোপ্লেন, মোটরগাড়ী, বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, রেলগাড়ী, বড় বড় বাড়ীঘর, অস্ত্রশস্ত্র, রং, আতসবাজি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। এইভাবে ইহার ব্যবহার দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

কিন্তু আমরা যে এ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করি উহা সরাসরি খনি হইতে পাওয়া যায় না। এ্যালুমিনিয়াম যে খনিজ পদার্থ হইতে পাওয়া যায় তাহার নাম বক্সাইট (Bauxite)। বক্সাইটের সহিত ক্রায়োলাইট (cryolite) আকরিক মিশ্রিত

করিয়া প্রচুর উত্তাপের সাহায্যে যে তরল এ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায় তাহা হইতে ব্যবহারোপযোগী এ্যালুমিনিয়ামের পিণ্ড, পাত, তার প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। আবার বক্সাইটের খনি থাকিলেই এ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন হইতে পারে না। উহার জন্য চাই সুলভ বিদ্যুৎশক্তি এবং কর্মনৈপুণ্য। নিম্নে বক্সাইট ও এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের অবস্থা দেওয়া হইল :

বক্সাইট উৎপাদন (১৯৫৯) : মোট উৎপাদন ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টন।

জ্যামেকা : উৎপাদন ৫৭ লক্ষ টন। রপ্তানিকারক দেশ। এ্যালুমিনিয়াম শিল্পে উন্নত নয়।

ডাচ গিয়ানা : উৎপাদন ৩৩ লক্ষ টন। রপ্তানিকারক দেশ।

বৃটিশ গিয়ানা : উৎপাদন ২২ লক্ষ টন। রপ্তানিকারক দেশ।

ফ্রান্স : উৎপাদন ১৬ লক্ষ টন। বক্স (Baux), ভার, হেরল্ট ও আবিজ খনি অঞ্চল। বক্সে প্রচুর পাওয়া যায় বলিয়া এ খনিজ পদার্থের নাম বক্সাইট (Bauxite) হইয়াছে। এদেশ এ্যালুমিনিয়াম শিল্পেও উন্নত।

যুক্তরাষ্ট্র : উৎপাদন ১৪ লক্ষ টন। জর্জিয়া, আলাবামা, আরকানসাস খনি অঞ্চল। ইহা এ্যালুমিনিয়াম শিল্পে উন্নত এবং বক্সাইট আমদানিকারক দেশ।

হাঙ্গেরী : উৎপাদন ৯ লক্ষ টন এ্যালুমিনিয়াম শিল্পও আছে।

যুগোস্লাভিয়া : উৎপাদন ৫%। এ্যালুমিনিয়াম শিল্পও আছে।

গ্রীস : উৎপাদন ৪%।

রাশিয়া : এখানকার বক্সাইট উচ্চ শ্রেণীর না হইলেও বিভিন্ন অঞ্চলে খনি আছে এবং এ্যালুমিনিয়াম শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে।

ইহা ছাড়া ফরাসী, পশ্চিম আফ্রিকা (২৫%), ইন্দোনেশিয়া (১৫%) ও মালয়ে (১০%) বক্সাইট উৎপন্ন হয় এবং ইহারা রপ্তানিকারক দেশ।

এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন

(১৯৬১)

পৃথিবীর মোট উৎপাদন ৪১ লক্ষ মেঃ টন

যুক্তরাষ্ট্র	২০৮ লক্ষ টন	ব্রিটেন	১৪১ লক্ষ টন
কানাডা	৬৯ " "	ইতালি	৮০ " "
ফ্রান্স	৩২২ " "	অষ্ট্রিয়া	৬০ " "
জার্মানী	৩'৮ " "	হাঙ্গেরী	'৫০ " "
নরওয়ে	১'৭২ " "	যুগোস্লাভিয়া	'৫০ " "
জাপান	২'২০ " "	ভারত	'১৮ " "


উত্তর
আমেরিকা
দক্ষিণ
আমেরিকা
আফ্রিকা
ইউ. এস. এস. আর.
চীন
অষ্ট্রেলিয়া
•পৃথিবী• এ্যালুমিনিয়াম খনি +

ভারতে প্রচুর বক্সাইট আছে। ইহার সঞ্চিত ভাণ্ডার ২৫ কোটি টন বলিয়া অনুমান করা হয়। ভারতের যে যে অঞ্চলে বক্সাইট পাওয়া যায় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলি উল্লেখযোগ্য :

১। মধ্যপ্রদেশ : জব্বলপুর, কাটনি ও বালাঘাট
২। বিহার : পালামৌ ও রাঁচি।
৩। মাদ্রাজ : সালেম, মাদুরাই ও নীলগিরি।
৪। মহারাষ্ট্র : থানা, কয়রা ও বেলগাঁও।
৫। মহীশূর ও কাশ্মীর।

এ্যালুমিনিয়াম শিল্প ভারতে এখনও ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠে নাই। কেবলমাত্র আলওয়ে, বেলুড়, আসানসোল ও মুরি এ্যালুমিনিয়াম শিল্পের জন্য উল্লেখযোগ্য। উৎপাদন প্রায় ১৮০০০ টন। বর্তমান চাহিদা প্রায় ৩০,০০০ টন। সুতরাং আমদানি ভিন্ন গত্যন্তর কি?

Q, 20 Describe the uses and world distribution of Tin, Lead, Mica and Salt with special reference to India.

(টিন, সীসা, অভ্র ও লবণের ব্যবহার এবং তাহাদের পৃথিবীব্যাপী বণ্টন বিশেষতঃ ভারতের কথা উল্লেখ করিয়া বর্ণনা কর।)

(ক) টিন (Tin) :

টিনের ব্যবহার (Uses of Tin) :

টিনের ব্যবহার অতি প্রাচীন। ইহাতে মরিচা ধরে না। এজন্য ইহা লোহার পাত তৈয়ারী করার জন্য বেশী ব্যবহৃত হয়। খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিস ভালভাবে মোড়াইয়ের (packing) জন্য টিনের কৌটার ব্যবহার দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে। লোহার উপর টিনের প্রলেপ দিয়া 'ঢেউতোলা' টিন প্রস্তুত করা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেরোসীন, সরিষা ও নারিকেল তৈল, বনস্পতি ঘি, মাখন, ঘি প্রভৃতিও টিনে ভর্তি করিয়া চালান দেওয়া হয়। টিনের সহিত তামা মিশাইলে 'ব্রোঞ্জ' এবং নিকেল মিশাইলে 'কাঁসা' পাওয়া যায়। যুদ্ধ জাহাজ, কামান, এরোপ্লেন, মোটরগাড়ী প্রভৃতি তৈয়ার করিতেও টিন ব্যবহৃত হয়।

টিনের প্রাপ্তিস্থান প্রধানতঃ মালয়, ইন্দোনেশিয়া, বলিভিয়া, বেলজিয়ান কঙ্গো, থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ, চীন, নাইজিরিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন, বৃটেন, জার্মেনী ও আলাস্কা।

মালয়ে সবচেয়ে বেশী টিন উৎপন্ন হয় -পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ। পিরাকই ইহার সর্বপ্রধান উৎপাদন কেন্দ্র। তবে শোধনকেন্দ্র হিসাবে পেনাং ও সিঙ্গাপুরের নাম উল্লেখযোগ্য।

ইন্দোনেশিয়ার বাঁকা, বিলিটন, সিঙ্কেপু দ্বীপ প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র। ইন্দোনেশিয়ার উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় শতকরা ২০ ভাগ।

বলিভিয়া উৎপাদন করে প্রায় শতকরা ১৬ ভাগ। আণ্ডিজ পর্বতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ইহা সংগৃহীত হয়।

বেলজিয়ান কঙ্গোর কাটাঙ্গা ইহা উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য। বেলজিয়ান কঙ্গোর উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা প্রায় ১০ ভাগ।

উপরিউক্ত অন্যান্য অঞ্চলের উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। থাইল্যাণ্ড, নাইজিরিয়া ও চীনের উৎপাদন যথাক্রমে শতকরা ৭., ৫ ও ৭ ভাগ।

টিনের বাণিজ্য: যে সমস্ত দেশ টিন উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য তাহারা শিল্পে অনুন্নত। এজন্য ইহারাই প্রধানতঃ রপ্তানিকাবক দেশ। যে সমস্ত দেশে টিনের ব্যবহার বেশী তন্মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ৫০%) এবং উত্তর পশ্চিম ইউরোপ (৪০%) বিশেষ বিখ্যাত। সুতরাং টিন রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে মালয়, ইন্দোনেশিয়া, বলিভিয়া, বেলজিয়ান কঙ্গো, আলাস্কা, থাইল্যাণ্ড ও নাইজিরিয়া উল্লেখযোগ্য।

আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মেনী, জাপান ও ভারত প্রধান। ভারতে টিনের উৎপাদন সামান্য এবং বিহারের হাজারীবাগে সীমাবদ্ধ। মালয় ও ব্রহ্মদেশ হইতে ভারত প্রচুর টিন আমদানি করিয়া থাকে।

সীসা:

সীসার ব্যবহার: সীসার ব্যবহার নানাবিধ। ইহা প্রধানতঃ ছাপাখানার টাইপ, গ্যাস, জল ও নর্দমার পাইপ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া ইহা মোটর ও বিমান শিল্প, তড়িৎকোষ, বন্দুকের গুলি, সঙ্গীতের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি নির্মাণেও ব্যবহৃত হয়। ইহা লৌহের সহিত মিশাইয়া ইস্পাতও প্রস্তুত হয়। ইহার ব্যবহার প্রাচীন এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

সীসার প্রাপ্তিস্থান: যুক্তরাষ্ট্রে ইহা বেশী উৎপন্ন হয়—শতকরা ৩০ ভাগ। ইহার অধিকাংশ আবার পাওয়া যায় মিসৌরী রাজ্যে। অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের ব্রোকেন হিল এবং কুইন্সল্যাণ্ডের মাউণ্টইসা সীসা উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য। সীসা উৎপাদনে অষ্ট্রেলিয়ার স্থান পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়।

মেক্সিকোর স্থান তৃতীয় এবং উহার চিহুয়াহুয়া প্রধান খনি অঞ্চল। কানাডা ইহার উৎপাদনে চতুর্থ এবং ইহার প্রাপ্তিস্থান পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল। ইহা ছাড়া রাশিয়া (কাজাকস্থান), পেরু, যুগোশ্লোভিয়া, জার্মানী, স্পেন, ইতালি, মরক্কো, দক্ষিণ আফ্রিকার নাম উৎপাদক হিসাবে উল্লেখ করা যায়। ইহার রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো, স্পেন, পেরু ও যুক্তরাষ্ট্র এবং আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে বৃটেন, ভারত, জার্মানী, জাপান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ভারতে সামান্য পরিমাণ সীসা পাওয়া যায় রাজস্থানে। ভারতকে এ খনিজ পদার্থের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়।

অভ্র:

অভ্রের ব্যবহার: বৈদ্যুৎতিক শিল্পেই অভ্রের ব্যবহার বেশী। ইহা ছাড়া বেতার টেলিগ্রাফ, মোটর গাড়ী প্রভৃতি শিল্পেও ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা তাপসহ এবং বিদ্যুৎ অপরিবাহী। এজন্য অগ্নিকুণ্ড আলোর চিমনি প্রভৃতি নির্মাণেও ব্যবহৃত হয়। গুঁড়া ও টুকরা অভ্র রং, রবার ও কাগজ প্রস্তুত করিতে ও ব্যবহার হয়।

অভ্রের প্রাপ্তিস্থান: অভ্র উৎপাদনে ভারত প্রথম। ইহা মোট উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। ভারতের বেশীর ভাগ উৎপন্ন হয় বিহারের গয়া, হাজারিবাগ ও মুঙ্গের জেলায়। ইহা ছাড়া অন্ধ্রের নেলোর, মধ্যপ্রদেশের বাস্তার জেলা ও রাজস্থান উল্লেখযোগ্য। অভ্র উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান দক্ষিণ আফ্রিকার। ইহার রোডেশিয়া, ট্রান্সভাল, নাটাল ও অন্তরীপ প্রদেশ প্রধান প্রাপ্তিস্থান ইহা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র (উত্তর ক্যারোলিনা এবং নিউ হ্যাম্পসায়ার রাজ্যে) ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া, নরওয়ে, স্পেন, পর্তুগাল, কানাডা, আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল, অষ্ট্রেলিয়া ও জাপান সামান্য সামান্য উৎপাদন করে। প্রধান অভ্র রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার দেশগুলি এবং আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও জার্মানী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

লবণ:

লবণের ব্যবহার: বহু প্রকার খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধির জন্য লবণ ব্যবহৃত হয়। খাদ্যদ্রব্য হিসাবেও ইহার যথেষ্ট উপকারিতা আছে। ইহা ছাড়া ইহা রাসায়নিক শিল্পে, মাছ, মাংস, মাখন, চামড়া প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্য এবং কাঁচ, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি শিল্পে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লবণ উৎপাদক দেশ : লবণের উৎপত্তি স্থল সমুদ্রের জল, লবণাক্ত হ্রদের জল এবং খনি। লবণ উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জার্মানী, ভারত ফ্রান্স, ইতালি ও স্পেন উল্লেখযোগ্য।

ভারত লবণ উৎপাদনে একটি উল্লেখযোগ্য দেশ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় ৫ কোটি টন লবণ উৎপাদন করে। উহার মধ্যে ভারত উৎপন্ন করে প্রায় ৩৬ লক্ষ টন। ভারত নিজের প্রয়োজন মিটাইয়া প্রায় ২½ লক্ষ টন বিভিন্ন দেশে যথা জাপান, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, নেপাল প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করিয়া থাকে। ভারতের উৎপাদনে শতকরা ৬০ ভাগ পাওয়া যায় সমুদ্রের জল হইতে। ইহাতে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, উড়িষ্যা ও পশ্চিম বঙ্গের নাম উল্লেখযোগ্য।

উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। এখনও শিল্পে লবণের ব্যবহার ততটা অগ্রগতি লাভ করে নাই। লবণের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। উৎপাদিত অঞ্চল হইতে সামান্য লবণ উহাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে রপ্তানি হয়।

Q. 21. Give an accouut of the building materials of the different parts of the world.

(পৃথিবীর গৃহ নির্মাণ উপযোগী দ্রব্যগুলির একটি বিবরণ দাও।)

Ans. গৃহ-নির্মাণ উপযোগী দ্রব্যগুলির মধ্যে বালুকা, কাদা, সিমেণ্ট, চুনাপাথর, গ্রানাইট, বেলেপাথর, ব্যাসাল্ট, মার্বেল, শ্লেট ও এসবেসটস্ প্রধান। কিন্তু এই সমস্ত দ্রব্যাদি ওজনে ভারী এবং দামে সস্তা। সুতরাং ইহাদের উৎপাদিত অঞ্চল এবং বিক্রয় বাজারের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান বেশী হইতে পারে না। এই সমস্ত জিনিস বেশী দূরে পাঠাইতে হইলে পরিবহণ ব্যয় অধিক পড়ে। নিম্নে এই সমস্ত দ্রব্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল

(ক কাদা (Clay): ইহা ইট, টালি ও নানা প্রকার মাটির জিনিস প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। যেখানে বাড়ীঘর, রাস্তা, সেতু ইত্যাদি প্রস্তুতের জন্য ইট ও টালির চাহিদা বেশী সেই সমস্ত অঞ্চলেই উহা প্রস্তুতের জন্য কাদার ব্যবহার বেশী হয়। এভাবে কাদার ব্যবহার পৃথিবীর নানা দেশের শিল্প ও সহরাঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকার মাটির জিনিস তৈয়ারীতে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল, ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চল, চীন ও জাপান সমধিক প্রসিদ্ধ।

(খ) বালুকা (Sand : বালুকা বাড়ীঘর, রাস্তা, সেতু ইত্যাদি নির্মাণের

জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া কাঁচ শিল্পেও ইহার ব্যবহার ব্যাপক। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্র এই শিল্পে সমধিক প্রসিদ্ধ।

(গ) **সিমেণ্ট (Cement):** কাদা ও চূণাপাথরের সংমিশ্রনে সিমেণ্ট প্রস্তুত হয় এবং বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্মাণে ইহার ব্যবহার ব্যাপক। সিমেণ্টের সহিত বালু ও পাথরের কুড়ি মিশ্রিত করিয়া 'কংক্রিট' প্রস্তুত হয়। 'কংক্রিট' খুব শক্ত ও মজবুত। ছাদ মেঝে, সেতু ও ভাল রাস্তা 'কংক্রিট' প্রস্তুত হইতে পারে। সিমেণ্ট ও কংকিটএর ব্যবহার ব্যাপক—শিল্প ও সহরাঞ্চলে বেশী। সুতরাং শিল্পপ্রধান দেশ যথা ইংলণ্ড, জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে প্রচুর সিমেণ্ট উৎপন্ন হয়।

(ঘ) **চুনা পাথর (Limestone):** রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী, রেল লাইনের পাশ দিয়া ছড়ান, লোহার খাদ, জমির সার ও সিমেণ্ট প্রস্তুতের জন্য চূনাপাথরের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পৃথিবার অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র (ইণ্ডিয়ানা) সমধিক প্রসিদ্ধ।

(ঙ) **বেলে পাথর (Sandstone):** ঘরবাড়ী তৈয়ারীর জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং পথঘাট নির্মাণের জন্য নিকৃষ্ট শ্রেণীর বেলেপাথর ব্যবহার হয়। অনেক ঐতিহাসিক ইমারত যেমন আগ্রা দুর্গ নির্মাণে অনেক বেলে পাথরের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পৃথিবীর অনেক দেশে কম বেশী পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(চ) **গ্রানাইট (Granite):** ইহা খুব শক্ত এবং বিভিন্ন রং বিশিষ্ট। ইহা প্রয়োজন মত বিভিন্ন আকারে কাটা চলে এবং 'পলিস' করিলে খুব সুন্দর দেখায়। এজন্য মন্দির, রাজপ্রাসাদ, স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতি নির্মাণে ইহা বেশী ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রেই ইহা বেশী পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সুইডেন, কানাডা অঞ্চলেও পাওয়া যায়।

(ছ) **বাসাল্ট (Basalt) অথবা ট্রাপ (Trap):** ইহা আগ্নেয়গিরি উদ্ভূত এবং খুব শক্ত। ইহা প্রধানতঃ পাকারাস্তা নির্মানে ব্যবহৃত হয়। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রে ইহা প্রচুর পাওয়া যায়।

(জ) **মর্মর পাথর (Marble):** সুন্দর বাড়ীঘর নির্মানের জন্য ইহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। ইহা বাড়ীঘরের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। ইটালির মার্বেলপাথর সর্বশ্রেষ্ঠ ইহা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, স্পেন, বৃটেন ও ভারতেও (রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ) ইহা পাওয়া যায়।

(ঝ) **শ্লেট (Slate):** ইহা ঘরের ছাদ, লিখিবার শ্লেট, বোর্ড, বিলিয়ার্ড টেবিল, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। শ্লেটের গুঁড়া নানাপ্রকার রং, অয়েলক্লথ ও নানাবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহা শক্ত, ঘনীভূত এসিডেও গলে না এবং দীর্ঘস্থায়ী। যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, পাকিস্তান, বৃটেন, আয়ার্ল্যাণ্ড, ইতালি প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায়।

এস্‌বেসটস্ (Asbestos): ইহা আঁশযুক্ত শিলা এবং আবহাওয়া, জল ও আগুনে ইহার ধ্বংস নাই। ইহা উত্তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী। সিমেণ্ট ও এস্‌বেস্‌টস্ সংযোগে ঢেউতোলা পাত তৈয়ারা করিতেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

ইহার উৎপাদনে কানাডা (কুইবেক ৭০%) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া রাশিয়া (১২%), দক্ষিণ আফ্রিকা (৯%), রোডেসিয়া (৭%) এবং ভারত (১%) প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায়। ভারতের উৎপাদন প্রায় ১৩০০টন। উহার প্রাপ্তি স্থান রাজস্থান, অন্ধ্র, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও মহীশূর।

অষ্টম অধ্যায়

ভারতের বহুমুখী নদী পরিকল্পনা

(Multipurpose River Projects of India)

Q. 1. What do you understand by 'Multipurpose River Projects ?' Give a brief account of any one of such projects. (Pre C U 1963)

(বহুমুখী নদী পরিকল্পনা বলিতে কি বুঝ ? এরূপ একটি পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও ।)

Or

Why D. V. P. is called a multipurpose project ? What advantages West Bengal and Bihar are having from it ? (B. U. Entrance, 1963)

(ডি, ভি, পি, কে বহুমুখী পরিকল্পনা বলে কেন ? পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার ইহা হইতে কি উপকার পাইতেছে ?

Or

Give a brief account of the Damodar valley Project mentioning the benefits that have come to the people of the Valley.

(C. U Pre-1962)

(দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায় উহার উপত্যকাবাসীরা যে উপকার পাইতেছে উহা উল্লেখ করিয়া পরিকল্পনাটির বিবরণ লিখ ।)

Ans যে পরিকল্পনা অনুযায়ী নদীর উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ দ্বারা **জলসেচন, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যা নিবারণ, বনোৎপাদন, জলপথে যাতায়াত ও ভ্রমণ, মৎস্য চাষ, ভূমিক্ষয় নিবারণ, ম্যালেরিয়া নিবারণ, অবসর বিনোদন, পরিশ্রুত পানীয় জলসরবরাহ** প্রভৃতি সম্ভব হয় এবং এইভাবে মানুষের সর্বপ্রকার উন্নতির সহায়ক হয় তাহাকে বহুমুখী পরিকল্পনা (Multipurpose Project) বলে ।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা এরূপ একটি বহুমুখী পরিকল্পনা। কেন্দ্রীয়, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সরকারের সহযোগিতায় এই পরিকল্পনার কাজ কয়েক বৎসর পূর্বে আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহার কাজ অনেকটা সমাপ্তির পথে। ইহার কার্য্য সম্পূর্ণ হ লে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার প্রত্যক্ষভাবে এবং সমগ্র দেশ পরোক্ষভাবে বিশেষ উপকৃত হইবে ।

৩৩৬ মাইল দীর্ঘ দামোদর নদ বিহারের ছোটনাগপুরের অন্তর্গত পালামৌ জেলার ৩০০০ ফুট উচ্চ খামারপেত নামক পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ স্থান হইতে

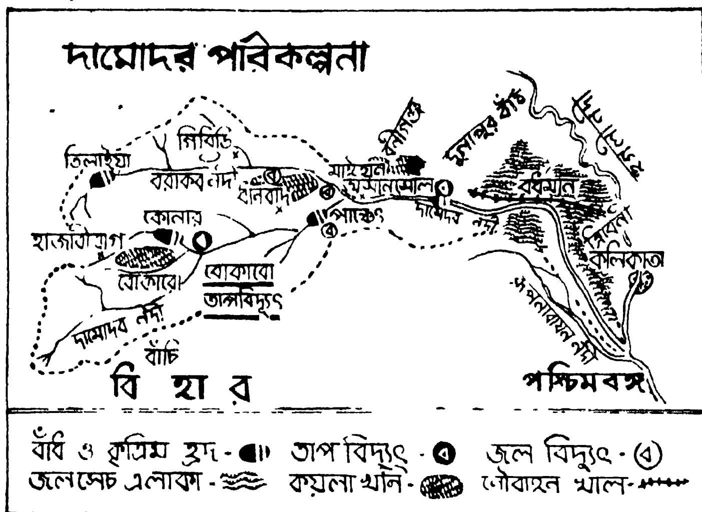
ইহা হাজারীবাগ ও মানভূম জেলায় মালভূমির উপর দিয়া প্রায় ১৮০ মাইল প্রবাহিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় সমভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। বর্ধমান সহর পর্যন্ত ইহা প্রায় পূর্বগামী। এখান হইতে দক্ষিণবাহিনী হইয়া হুগলী ও হাওড়া জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া হুগলী নদীতে পড়িয়াছে। দামোদর বিহারে মালভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত বলিয়া এখানে বেগবতী এবং পশ্চিমবঙ্গে সমভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত বলিয়া এখানে মন্থরগতি। ইহার ফলে বৃষ্টির ও নদীর জলের প্রবাহে আনীত ক্ষয়প্রাপ্ত মাটি পশ্চিমবঙ্গের অংশে নদীগর্ভ ক্রমশঃ ভরাট করিতেছে। এজন্য বৃষ্টিপাত কিছু বেশী হইলে দামোদরে পশ্চিমবঙ্গের অংশে প্রবল বন্যার সৃষ্টি করে। এই বন্যার প্রকোপ প্রায় প্রতি বৎসরই দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহার ফলে ফসল নষ্ট হয়, লোকজন-গরুবাছুর, বাড়ীঘর ভাসিয়া যায়, রাস্তাঘাট, রেলপথ চুরমার হয় এবং লোকের অশেষ দুর্গতির কারণ হয়। দামোদরকে এজন্য দুঃখের নদ River of Sorrow বলা হয়। ইহা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যেই দামোদরের বহুমুখী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। পূর্বে আমাদের এরূপ পরিকল্পনার বিষয় অজ্ঞাত ছিল। আমেরিকার টেনিসি নদীতে এরূপ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হওয়ায় আমাদের দেশে পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রেরণা পাওয়া গিয়াছে। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের (Damodar Valley Corporation—D V C) উপর দামোদর পবিকল্পনা কার্যকরী করার ভার অর্পিত হইয়াছে।

দামোদর পরিকল্পনা দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথমে পর্যায়ে পাঞ্চেৎ, কোনার, তিলাইয়া ও মাইথনে বাঁধ নির্মাণ ও তৎসংলগ্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র (মোট ১০৪ লক্ষ কিঃ ওঃ) স্থাপিত হইবে। বোকারোতে একটি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১৫ লক্ষ কিঃ ওঃ) স্থাপিত হইবে এবং দুর্গাপুরে একটি ব্যারেজ এবং তৎসংলগ্ন সেচ ও নাব্য খাল নির্মাণ হইবে। প্রথম পর্য্যায়ের কাজ ফলপ্রসূ হইলে দ্বিতীয় পর্য্যায়ে আয়ার, বল পাহাড়ী, বোকারো ও বার্মোতে বাধ নির্মাণ ও কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। বর্তমানে প্রথম পর্য্যায়ের কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে। দামোদর পরিকল্পনা হইতে যে উপকার সাধন হইবে এবং হইতেছে নিম্নে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

(১) বন্যা নিয়ন্ত্রণ এই পরিকল্পনায় একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। তিলাইয়াতে যে বাঁধ নির্মিত হইয়াছে তাহার ফলে উহার পশ্চাতে ১৫ মাইল দীর্ঘ হ্রদ সৃষ্টি হইয়াছে, উহা দামোদরের বন্যাকে কতক পরিমাণে দমন করিতেছে। ইহা ছাড়া মাইথনে ও পাঞ্চেতে যে বাঁধ নির্মাণ হইয়াছে তাহাও বন্যা রোধ করিতেছে। পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ হইলে আর বন্যার ভয় থাকিবে না।

(২) ইহা হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন হইবে। তিলাইয়ার ১০০ ফুট উচ্চ বাঁধ

হইতে যে জল নামিতেছে তাহা হইতে ৬ হাজার কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হইতেছে। মাইথন বাঁধ ৬০ হাজার কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিতেছে। পাঞ্চেত বাঁধ হইতেও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হইতেছে। কোনার বাঁধ বোকারো



তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য জল সরবরাহ করিতেছে এবং উক্ত তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিকৃষ্ট শ্রেণীর ও গুড়া কয়লা হইতে ২ লক্ষ ২৫ হাজার কিলোওয়াট তাপ বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিতেছে। ইহা ছাড়া দুর্গাপুরে ও চন্দ্রপুরায় আরও দুইটি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হইতেছে। এখানে তাপ বিদ্যুৎ ও জল বিদ্যুৎ একত্রই ব্যবহৃত হইবে। এজন্য দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন সমস্ত তাপ ও জলবিদ্যুৎ শক্তিকে Gridএর সাহায্যে একটি ব্যাপক সরবরাহের মধ্যে আনিয়াছে। উহা পশ্চিমে ডালমিয়ানগর হইতে পূর্বে কলিকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত। ডালমিয়ানগর, জামসেদপুর, আসানসোল, খড়্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলের কারখানাগুলি এবং বৈদ্যুতিক রেলপথ এই তাপ ও জলবিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ পাইতেছে। খনি অঞ্চলে খনির কাজও বিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে। ৪ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

(৩) ইহা জলসেচন ব্যবস্থা করিবে। দুর্গাপুর বাঁধ শেষ হইয়াছে। ইহার

ফলে উহার পশ্চাতে যে জল জমিয়াছে তাহা শত শত মাইল খালের সাহায্যে বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলায় ৯ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন কার্য্যে লাগিতেছে। ইহার ফলে ৩৫ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য এবং ৩৬ কোটি টাকা মূল্যের অতিরিক্ত পাট উৎপাদনের সুযোগ ঘটিয়াছে। মোট ১০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা পরিকল্পনার লক্ষ্য।

(৪) ইহা জলপথে পণ্য বহনের সুযোগ ঘটাইবে। দুর্গাপুর হইতে ৯০ মাইল দীর্ঘ একটি খাল হুগলী নদীর সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। ফলে জলপথে রানীগঞ্জের কয়লা হুগলী নদী হইয়া কলিকাতায় সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা ছাড়া খনি অঞ্চল ও কলিকাতার মধ্যে যাতায়াত ও অন্য পণ্যাদি চলাচলের সুবিধা হইয়াছে।

(৫) ইহা মৎস্য চাষের সুযোগ দিবে। তিলাইয়া, মাইথন, কোনার প্রভৃতি বাঁধের পিছনে যে জল জমাইয়া রাখা হইয়াছে তাহাতে মৎস্য চাষ হইতেছে।

(৬) ইহা বনোৎপাদনের সুবিধা ঘটাইবে। বাঁধের জলাশয়ের তীরবর্তী অঞ্চলগুলি বনভূমি আবাদের সুযোগ দিয়াছে।

(৭) ইহাতে অবসর বিনোদনের সুযোগ ঘটিবে। বিভিন্ন খালে ও জলাশয়ে সাঁতার কাটা, মাছ ধরা, ভ্রমণের জন্য যাওয়া প্রভৃতি দ্বারা অবসর ও চিত্ত বিনোদনের সুযোগ পাওয়া যাইতেছে এবং অনেকে উক্ত সুযোগ গ্রহণ করিতেছে।

(৮) ইহাতে ম্যালেরিয়া নিবারণ হইবে। নদী, খাল ও বাঁধের জল নিয়মিত প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া কোন স্থানে জল আটকাইয়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হইবে না। ফলে পরিস্রুত জল সরবরাহ, স্বাস্থ্যোন্নতি ও ম্যালেরিয়া নিবারণ হইবে।

(৯) ইহা ভূমিক্ষয় নিবারণ করিবে।

Q. 2 Give a brief account of the Bhakra-Nangal Project of India.

(ভাক্রা-নাঙ্গাল পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও)।

Ans. 'ভাক্রা-নাঙ্গাল' পাঞ্জাবের বহুমুখী নদী উন্নয়ন পরিকল্পনা। পাঞ্জাবে কয়লা বা পেট্রোলিয়াম খনি নাই। সম্প্রতি জ্বালামুখীতে পেট্রোলিয়াম পাইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতও কম। সুতরাং শিল্প-সৃষ্টি, জলসেচ ও অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য বহুমুখী নদী পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে। ১৯০৮ সালে তদানীন্তন পাঞ্জাব গভর্ণর স্যার লুইডেন (Sir Louis dane) প্রথম ইহার প্রয়োজন পাঞ্জাব সরকারকে অবগত করান। কিন্তু উহা কার্য্যকরী করার কোন

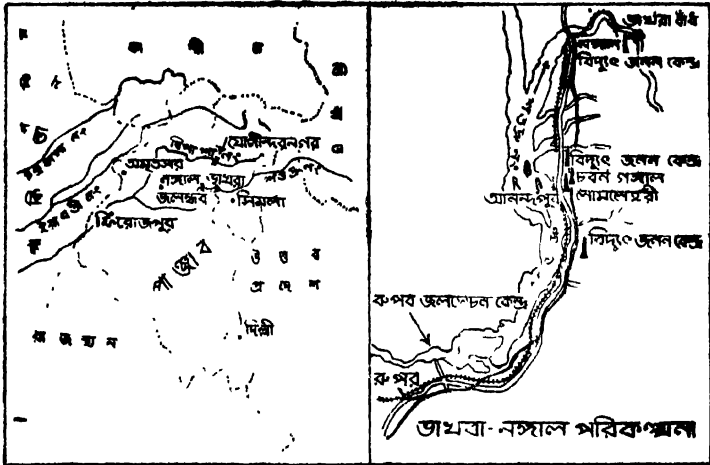
চেষ্টা হয় না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং ১৯৫১ সাল হইতে কার্য্য আরম্ভ হয়।

এই পরিকল্পনায় দুইটি বাঁধ স্থান পাইয়াছে—একটি ভাক্রায় এবং অপরটি নাঙ্গালে। এজন্য ইহার ভাক্রা-নাঙ্গাল নাম হইয়াছে। এই বাঁধ দুইটি শতদ্রু নদীর উপর নির্মিত হইবে। শতদ্রু নদী তিব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া হিমালয় ভেদ করিয়া বিরাট গিরিখাতের ভিতর দিয়া ভারতের পাঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া পাকিস্তানের সিন্ধুনদে পড়িয়াছে। কংক্রিটের বাঁধ দিয়া গিরিখাতে বাড়তি জল আটকাইয়া রাখিয়া জলসেচ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি বহুমুখী কার্য্য সম্পাদন করা এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

প্রথমে নাঙ্গাল বাঁধের কার্য্য আরম্ভ হয় এবং উহার নির্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে। এই বাঁধটি ১০২৯ ফুট দীর্ঘ, ৪০০ ফুট প্রশস্ত এবং ৯১ ফুট উচ্চ। ইহার স্থান ভাক্রা বাঁধ হইতে ৮ মাইল নিম্নে। এই বাঁধের পিছনে বিরাট জলাশয় সৃষ্টি হইয়াছে। স্থানটি চারিদিকে ছোট পাহাড় ঘেরা। এজন্য ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। নাঙ্গাল বাঁধ হইতে ৬৫৭ মাইল দীর্ঘ খাল কাটা হইয়াছে। উহার মধ্যে ৪০ মাইল সিমেণ্ট কংক্রিট দ্বারা তৈয়ারী। এই কংক্রিট খালের নাম নাঙ্গাল হাউডেল খাল (Hvdel canal)। এই খালের গাঙ্গোয়াল ও কোটলা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হইতে ৯৬ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তির উৎপন্ন হইতেছে। নাঙ্গাল বাঁধের প্রধান কাজ এই জলবিদ্যুৎ খালে জল প্রবেশ করান। এই বিদ্যুৎ খাল রূপারের নিকট শেষ। ইহার পর সেচখাল আরম্ভ। এই বিদ্যুতের সাহায্যে ৮০০ সেচের কূপ ও বহু শিল্প কারখানা চলিতেছে এবং ১২৮টী ছোট বড় সহর আলোকিত হইতেছে। এই খাল বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়া শিরহিন্দ খালে নিয়মিত জল সরবরাহ করিতেছে। ইহার ফলে সমগ্র পাঞ্জাবে ও রাজস্থানের মরুময় উত্তর ভাগে নিয়মিত জলসেচ হইতেছে এবং প্রচুর শস্য উৎপাদন হইতেছে।

ভাকরা বাঁধ নির্মাণ স্থান নাঙ্গাল খালের ৮ মাইল উপরে গভীর খাতে। ইহার উচ্চতা ৭৪০ ফুট, দৈর্ঘ্য ১৭০০ ফুট এবং প্রস্থ ১১০০ ফুট। ইহা পৃথিবীর সর্বোচ্চ বাঁধ এবং এযাবৎ কালের উচ্চতম হুভার বাঁধ (যুক্তরাষ্ট্রের) অপেক্ষা ২০ ফুট বেশী উচ্চ। ভাকরা বাঁধের পিছনে ৫০ বর্গ মাইল আয়তনের জলাধার গোবিন্দ সাগর (গুরু গোবিন্দ সিংএর নাম অনুসারে)। ইহার জলধারণ ক্ষমতা ৭৪ লক্ষ ঘন ফুট। এই বাঁধ নির্মাণের জন্য শতদ্রু নদীকে পর্বত ভেদ করাইয়া দুইটি বিরাট সুড়ঙ্গপথে দুই দিকে প্রবাহিত করা হয়। ভাকরা বাঁধের জলের সমতা রক্ষার জন্যও নাঙ্গাল বাঁধ তৈয়ারী হয়।

সমগ্র পরিকল্পনা হইতে ৬৬ লক্ষ একর জমিতে জল সেচ হইবে এবং ৪ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হইবে (নাঙ্গাল ১ লক্ষ ৭০ হাজার এবং ভাকরা ২ লক্ষ ৩০ হাজার)। জলসেচের ফলে ১৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য, ৮ লক্ষ টন তূলা, ৫ লক্ষ টন ইক্ষু এবং ১ লক্ষ টন তৈলবীজ অতিরিক্ত উৎপন্ন হইবে। এই অতিরিক্ত খাদ্যশস্যের মূল্য অনুমান করা হইয়াছে ৯০ কোটি টাকা। ইহা ভারতের বৃহত্তম পরিকল্পনা এবং অন্য কোন পরিকল্পনা দ্বারা এত অধিক ফসল উৎপন্ন হয় নাই।



এই পরিকল্পনা হইতে সমগ্র পাঞ্জাব, রাজস্থান উত্তর ভাগ এবং উত্তর প্রদেশের কতকাংশ উপকৃত হইবে। এখান হইতে উৎপাদিত শক্তির সাহায্যে এ অঞ্চলে আণবিক শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত ভারী জল (heavy water) ও সার উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হইবে এবং কুটির শিল্পেরও উন্নতি হইবে। তবে একথা বলা চলে যে এখনও এমন শিল্প গড়িয়া উঠে নাই যাহার চাহিদা পূরণের জন্য এই পরিকল্পনা প্রয়োজন হইয়াছে। এখনও এমন কোন খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই যাহার ফলে এ অঞ্চল শীঘ্র যান্ত্রিক শিল্পে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। বয়ন শিল্প, কুটির শিল্প এবং নলকূপই এখন ভরসা। সুতরাং যে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া (১৭৪ কোটি টাকা) ইহা রূপায়িত হইতেছে তাহার উপযুক্ত আয় হইতে কিছুটা বিলম্ব হইবে। বর্তমানে ইহার আয় হইতে চলতি ব্যয়ই নির্বাহ হইবে কিনা সন্দেহ।

Q. 3. Write what do you know about Mor Project of West Bengal

(মোর পরিকল্পনা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।)

Ans. ময়ুরাক্ষী নদীর পরিকল্পনা মোর পরিকল্পনা নামে খ্যাত। ১৫০ মাইল দীর্ঘ ময়ুরাক্ষী নদী বিহারের দেওঘরের নিকট ত্রিকূট পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া সাঁওতাল পরগণা, পশ্চিম বাংলার বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথীতে মিশিয়াছে। নিজে ছোট হইলেও ইহার গতিপথে সমান্তরাল-ভাবে ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, বক্রেশ্বর, কোপাই প্রভৃতি কতকগুলি শাখা নদী প্রবাহিত। এই নদীগুলির মিলিত জলধারা প্রায়ই বন্যার সৃষ্টি করিত। ইহা ছাড়া বীরভূম শুষ্ক অঞ্চল। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০ ইঞ্চির নীচে। সুতরাং বন্যা ও জলাভাব উভয়ই দুর্ভিক্ষের কারণ হইয়া থাকে। ইহা প্রতিরোধকল্পে এই পরিকল্পনা। মোর পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চেষ্টায় ও কানাডার সহযোগিতায় সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে।

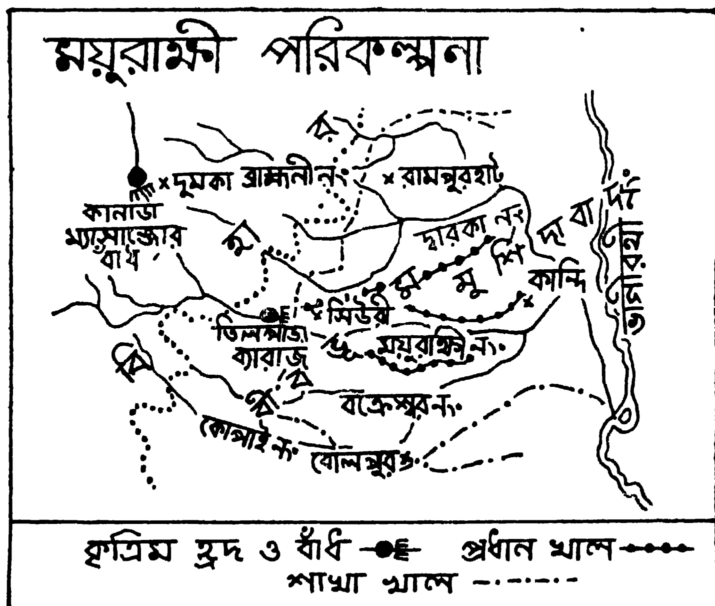
এই পরিকল্পনার দুইটি অংশ।

প্রথম অংশে বিহারে ম্যাসাঞ্জোরে ময়ুরাক্ষী নদীর উপর একটি বাঁধ নির্মিত হইয়াছে।

কানাডার সহযোগিতায় ইহা সফল হইয়াছে বলিয়া সৌহার্দ্য ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ ইহার নামকরণ হইয়াছে কানাডা বাঁধ। এই বাঁধটির দৈর্ঘ্য ২১৭০ ফুট এবং উচ্চতা ১০৫ ফুট। বাঁধের পেছনের জলাধারের আয়তন ২৪ বর্গমাইল। এই বাঁধ হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও জলসেচ উভয় কাজই সম্পন্ন হইবে।

পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশ হইতেছে তিলপাড়া বাঁধ। ইহা ম্যাসেঞ্জোরের ২০ মাইল নীচে এবং বীরভূম জেলার সদর শহর শিউড়ি হইতে ২ মাইল উত্তরে। তিলপাড়া বাঁধ ১২০০ ফুট দীর্ঘ ও ৮০ ফুট প্রশস্ত। উভয় বাঁধের উপর দিয়াই চওড়া রাস্তা আছে। ইহা ছাড়া কোপাই, দ্বারকা, ব্রাহ্মণী, বক্রেশ্বর প্রভৃতি নদীতে ছোট ছোট জলাধার নির্মিত হইয়াছে। তিলপাড়া বাঁধের সহিত উপরিউক্ত জলাধারগুলির সংযোগ আছে এবং প্রয়োজনবোধে তিলপাড়া হইতে ঐসব জলাধারে জল সরবরাহ হইবে। আবার তিলপাড়া বাঁধ মেসোঞ্জোর হইতে জলের অভাব পূরণ করিতে পারিবে। তিলপাড়া বাঁধ হইতে দুই দিকে অনেক সেচ খাল কাটা হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে সেচ খাল পুলের উপর দিয়া অনেক নদী পার হইয়াছে। ঐগুলিকে Aquaduct বলা হয়। কোপাই, বক্রেশ্বর প্রভৃতি নদীতে এরূপ ব্যবস্থা আছে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা দ্বারা বিহারে ৩৫ হাজার এবং পশ্চিমবঙ্গে ৭.২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন চলিবে এবং ৪ হাজার কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা যাইবে। জলসেচের এরূপ সুবিধার ফলে ১০ কোটি টাকা মূল্যের ৩ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন করা সম্ভব হইবে এবং ২৫ হাজার একরের মত পতিত জমি আংশিকভাবে আবাদের উপযুক্ত হইবে। বীরভূম জেলার শুষ্ক অঞ্চলই ইহার



ফলে বেশী উপকার পাইতেছে। ইহা ছাড়া মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমান জেলায়ও উপকৃত হইতেছে। ম্যাসাঞ্জোরের জলবিদ্যুৎ বিহারের বিশেষতঃ ডুমকা শহরে এবং পশ্চিমবঙ্গের শিউড়ি, রামপুরহাট ও নলহাটিতে সরবরাহ হইতেছে। বন্যা নিবারণ, জলসেচ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়া মৎস্য চাষ, পরিস্রুত জল সরবরাহ, ম্যালেরিয়া নিবারণ, অবসর বিনোদন প্রভৃতি সুযোগ সুবিধাও ঘটিয়াছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়া পরিকল্পনার কাজ ১৯৫৫ সালে শেষ হয় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত কাজ ১৯৫৭ সালে শেষ হয়। পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিতে প্রায় ১৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়।

Q 4 Describe some of the important river valley project outside West Bengal and Punjab. Are there any other projects of West Bengal besides the Damodar and the Mor projects ?

(পশ্চিমবঙ্গের ও পাঞ্জাবের বাহিরের কয়েকটি প্রসিদ্ধ নদী উপত্যকা পরিকল্পনার বিবরণ দাও। মোর ও দামোদর ভিন্ন পশ্চিমবঙ্গের কি আর কোন পরিকল্পনা আছে ?

Ans পশ্চিমবঙ্গের ও পাঞ্জাবের বাহিরে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রসিদ্ধ নদী উপত্যকা পরিকল্পনার বর্ণনা দেওয়া হইল।

(১) **মহানদীর হীরাকুঁদ বাঁধ পরিকল্পনা (উড়িষ্যা):** মহানদী মধ্য ভারতের মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া উড়িষ্যার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইহার অববাহিকার আয়তন প্রায় ৫ ,০০০ বর্গ মাইল এবং দামোদরের প্রায় ৭ গুণ। ইহার ব-দ্বীপ অংশে বন্যার প্রকোপ ভয়ানক। এজন্য এই পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী হীরাকুঁদ, টিকারপাড়া ও নারাজে বাঁধ দেওয়া স্থির হয়। হীরাকুঁদের বাঁধের কাজ শেষ হইয়াছে। এই বাঁধের দৈর্ঘ্য ৩½ মাইল—ভারতের দীর্ঘতম বাঁধ। বাঁধের পেছনের জলাশয়ের ৫০ লক্ষ একর ফুট জলধারণের ক্ষমতা। সমগ্র পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইলে ১৯ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ, ২ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। জলসেচনের মূল খাল হইবে ৯২ মাইল এবং উহার শাখা-প্রশাখা হইবে ৪৬০ মাইল। এখন রাজগাংপুরের সিমেন্ট কারখানা রূঢ়কেলার ইস্পাত কারখানা, সম্বলপুরের এ্যালুমিনিয়াম কারখানা প্রভৃতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে। এখন ১½ লক্ষ একর জমিতে জলসেচও চলিতেছে। উড়িষ্যা নানাবিধ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে এ অঞ্চল শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হইবে। বহুমুখী পরিকল্পনার অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও পাওয়া যাইবে।

(২) **কোশী পরিকল্পনা (বিহার)** কোশী নেপাল হইতে উত্থিত হইয়া বিহারের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথীতে মিশিয়াছে। ইহার পুনঃ পুনঃ গতি পরিবর্তন ও ভয়াবহ বন্যার প্রকোপ বর্ণনাতীত। কোশীকে বিহারের দুঃখ বলা হয়। কিন্তু এ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে পারিলে নেপাল ও বিহার অতিমাত্রায় উপকৃত হইবে। সাতটি পর্বে এ পরিকল্পনা শেষ হইবে। এজন্য ইহার কাজ বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইহার প্রথম বাঁধ নির্মিত হইবে, নেপালে ৭৫০ ফুট উচ্চ ছাত্রা গিরিখাতের নিকটে। উহার নাম হইবে নেপাল বাঁধ। কারণ নেপাল সরকার উহা নির্মাণ করিবেন। দ্বিতীয় বাঁধের নাম হইবে

বিহার বাঁধ। উহা নেপাল বিহার সীমান্তে হনুমাননগরে স্থাপিত হইবে। ইহার কাজ কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে এবং ইহা আংশিক ভাবে বন্যা রোধ করিতে পারিবে। বর্ত্তমানে বিহারকে বন্যার হাত হইতে রক্ষার জন্য নদীর উভয় তীরে

ভারতের নদী পরিকল্পনা

■ প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে অংশত: বা সম্পূর্ন কার্যকরী ॥

○ তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কার্যারম্ভ ॥

ক্ষুদ্র ও মধ্যম ✱ নদী পরিকল্পনা

আরব সাগর

সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন

জলসেচ নিযুত একর জমি

বিদ্যুৎ নিযুত কিলোওয়াট

মাটির বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উহা বিহারকে বন্যার প্রকোপ হইতে কতটা রক্ষা করিতে পারিতেছে সন্দেহজনক। ১৯৬১ সালে অক্টোবরে যে বন্যা হইল

উহার ক্ষতি অপূরণীয়। এই ক্ষতির ভার সমগ্র দেশকেই বহন করিতে হইবে। এজন্য কোশী পরিকল্পনা তরান্বিত করা উচিত। উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ হইবে, ৩০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন হইবে, ২১ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। উত্তর বিহারের ভয়াবহ ম্যালেরিয়া দূর হইবে এবং বহুমুখী পরিকল্পনার অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যাইবে।

(৩) **তুঙ্গাভদ্রা ও নাগার্জুনসাগর পরিকল্পনা (অন্ধ্র ও মহীশূর)** তুঙ্গাভদ্রা কৃষ্ণার একটি উপনদী। ইহা অন্ধ্র রাজ্যে অবস্থিত। তবে এই পরিকল্পনা মহীশূর ও অন্ধ্র সরকারের চেষ্টায় সফল হইতেছে এবং উভয় রাজ্যই উপকৃত হইতেছে এবাঁধের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন হইতেছে এবং মহীশূরের দিকে ১২৫ মাইল এবং অন্ধ্রের দিকে ৬৬ মাইল খাল ৮.৩ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করিতেছে। তুঙ্গাভদ্রার বাঁধ বর্তমানে ভারতের বৃহত্তম কংক্রীট বাঁধ। কৃষ্ণা নদীর নাগর্জুন সাগর নামে আর একটি বাঁধ নির্মিত হইতেছে। উহার ফলে ২০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং ৭৫ হাজার কিলোওয়াট জল বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। সঙ্গমেশ্বরমেও আর একটি বাঁধ নির্মিত হইবে এবং উহার ফলে প্রায় ২৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হইবে।

(৪) **মাচকুন্দ পরিকল্পনা (অন্ধ্র ও উড়িষ্যা)** এই পরিকল্পনাটির প্রথম বাঁধ অন্ধ্র ও উড়িষ্যার সীমান্তে জালাপুটে অবস্থিত এবং দ্বিতীয় বাঁধ উহার ১৭ মাইল নিম্নে। ইহাতে জলসেচের প্রচুর সুবিধা ছাড়া ১৭ হাজার কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ শক্তিও উৎপন্ন হইতেছে।

(৫) **রামাপদ সাগর পরিকল্পনা (অন্ধ্র):** এই পরিকল্পনা অনুযায়ী গোদাবরীর উপর রামাপদ সাগরের নিকট যে বাঁধ হইবে তাহাতে ২৭ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং ১১ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে।

(৬) **সম্বল পরিকল্পনা (মধ্য প্রদেশ ও রাজস্থান) :** এই পরিকল্পনা অনুযায়ী গান্ধীনগর বাঁধ, গান্ধী সাগর, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, কোট্রা বাঁধ প্রভৃতি হইতে মধ্য প্রদেশ ও রাজস্থানের ১১ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ ও ৭৫ হাজার কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইবে।

(৭) **রিহাণ্ড পরিকল্পনা:** এ পরিকল্পনায় শোনের উপনদী রিহাণ্ডের উপর বাঁধ দেওয়া হইবে এবং ইহাতে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বিহার উপকৃত হইবে। বাঁধ দেওয়া হইবে পিপরী নামক স্থানে। ইহা ভারতের বৃহত্তম জলাধার সৃষ্টি করিবে এবং উহার আয়তন হইবে ১৮০ বর্গ মাইল। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে ১৯ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হইবে এবং ২৫ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ

উৎপন্ন হইবে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ হইবে, কলিকাতা হইতে বিহার উপত্যকা পর্যন্ত নৌ চলাচলের সুবিধা এবং বহুমুখী পরিকল্পনার অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাইবে। ইহাতে ৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

(৮) ভদ্রা পরিকল্পনা (মহীশূর) : ইহা হইতে ২½ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন ও ৩৩ হাজার কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে।

(৯) তাপ্তী পরিকল্পনা : ইহার কাঁকরাপাড়ায় বাঁধ নির্মিত হইবে এবং ইহা হইতে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট উপকৃত হইবে। এই বাঁধ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহা হইতে ৫১ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন এবং ৪৮ হাজার কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। খালগুলির কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

(১০) নিম্ন ভবানী পরিকল্পনা : ভবানী কাবেরী নদীর উপনদী। ইহার কার্য শেষ হইয়াছে এবং ইহার সাহায্যে ২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং ১০ হাজার কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে।

ইহা ছাড়া গুজরাটের মাহী, মাদ্রাজের কৃষ্ণা-পেনার মহারাষ্ট্রের কয়না (কৃষ্ণার উপনদী) প্রভৃতি পরিকল্পনার কাজ অগ্রসর হইতেছে।

নদী পরিকল্পনাই আজিকার অর্থনৈতিক মুক্তিপ্রদর্শক বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই পরিকল্পনাই আমাদের কৃষিজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনে স্বাবলম্বী করিতে পারিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সুতরাং নদী পরিকল্পনা ভবিষ্যতে ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে বলা চলে।

পশ্চিমবঙ্গের দামোদর ও ময়ূরাক্ষী ভিন্ন বাঁকুড়ার কংশাবতী ও উত্তরবঙ্গের জলঢাকা ও গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য।

Q. 5. "Ganga Barrage Project is essential for saving the port of Calcutta" Comment (C U. Inter 1957)

("কলিকাতা বন্দর রক্ষার জন্য গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা একান্ত আবশ্যক"। আলোচনা কর।

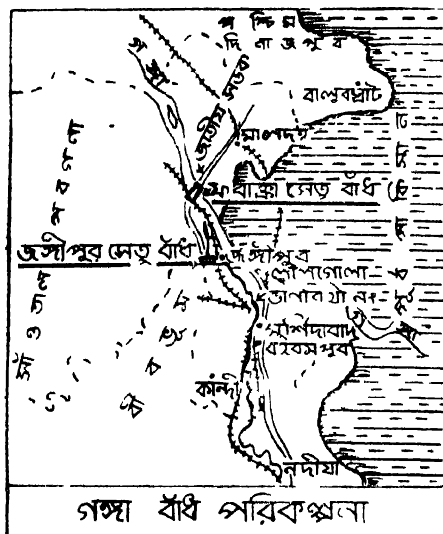
Or

Write short notes-on : Farakka Barrage (C. U. Pre, 1962)

(ফরাক্কা বাঁধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।)

Ans. বর্তমানে কলিকাতা বন্দরের দুর্গতির অন্ত নাই। কলিকাতা যে হুগলী নদীর উপর অবস্থিত তাহার অশেষ দুর্গতির জন্যই কলিকাতা বন্দরের বিপদজনক

অবস্থা। হুগলী নদী পলি পড়িয়া ক্রমেই ভরাট হইয়া আসিতেছে। কলিকাতা বন্দর হুগলী নদীর বামতীরে সমুদ্র হইতে প্রায় ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই হুগলী নদী এতটা অগভীর, ক্ষীণকায়া ও শীর্ণা হইয়া পড়িয়াছে যে ড্রেজার যন্ত্রের সাহায্যে পলিমাটি না সরাইলে এবং অভিজ্ঞ পাইলটের তত্ত্বাবধানে অগ্রসর না হইলে জাহাজ কলিকাতা বন্দরে আসিতে পারে না। এজন্য কলিকাতা বন্দর প্রতিষ্ঠানকে (Calcutta Port Commissioners) প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতে হয়। কলিকাতা উত্তর ভারতের জলপথের দ্বার স্বরূপ। ইহার উপকণ্ঠেই নানাবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। নদীতে জলাভাবের জন্য কলিকাতার সহিত শিল্পাঞ্চলের এবং উত্তর ভারতের সহিত জলপথে যোগাযোগ রক্ষা কঠিন হইয়া পড়িতেছে। কলিকাতায় জল সরবরাহ হুগলী নদী হইতে হইয়া থাকে। নদীতে জলাভাবের জন্য পানীয় জলে লবণের ভাগ বাড়িয়াই চলিয়াছে। এজন্য পানীয় জল যেমন বিস্বাদ হইয়াছে অন্য দিকে নানাবিধ রোগ সৃষ্টি হইতেছে। পরিশ্রুত জল সরবরাহের পরিমাণও কলিকাতা সহরাঞ্চলে দিন দিন কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলে মানুষের স্বাস্থ্যহানি দেখা দিয়াছে। লবণের ভাগ বেশী থাকায় জল পরিশ্রুত করিবার যন্ত্রাদিও তাড়াতাড়ি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহাতে কর্পোরেশনের ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং করদাতাগণ কর বৃদ্ধির চাপে পড়িয়া যাইতেছেন। ইহার ফলে সামাজিক, আর্থিক ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে এক বিপুল বিপর্যয় দেখা দিয়াছে।



গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনা

হুগলী নদীর জলাভাবের ও মজিয়া যাওয়ার কারণ নানাবিধ। মুর্শিদাবাদ জেলায় ফারাক্কার নিকট ভাগীরথী গঙ্গার প্রধান শাখা হিসাবে দক্ষিণে প্রবাহিত। কিন্তু এই ভাগীরথী স্বাভাবিক কারণে মজিয়া যাইতেছে, এবং সরু হইয়া পড়িতেছে।

৪০০ বৎসর পূর্বে ভৌগোলিক কারণবশতঃ গঙ্গার প্রধান স্রোত পদ্মা অভিমুখে ধাবিত হয়। ফলে পদ্মার জলপ্রবাহ বৃদ্ধি পায় কিন্তু ভাগীরথীর জল কমিয়া যায়। ইহার পর হইতেই ভাগীরথীর স্রোতবেগ কমিতে আরম্ভ করে এবং সরু হইতে থাকে। ইহাতে ভাগীরথীতে এবং ভাগীরথীর নিম্নাংশ হুগলীতে পলি সঞ্চয় হইতে থাকে। ইহা ছাড়া দামোদর, অজয়া, ময়ূরাক্ষী, রূপনারায়ণ বর্ষাকাল ভিন্ন খুব কম জলই ভাগীরথীর-হুগলীতে আনিয়া থাকে। জলের পরিবর্তে বালি, কাদা ইত্যাদি প্রচুর ইহারা ভাগীরথী-হুগলীতে নিক্ষেপ করে। দামোদর ও ময়ূরাক্ষীর প্রচুর জল সেচের কার্য্যে ব্যয়িত হয় বলিয়া পূর্বের তুলনায় অনেক কম জল হুগলীতে দিতে পারে। ক্ষুদ্র হুগলীর পক্ষে এ বিরাট ভার বহন করা সাধ্যাতীত। হুগলীর জোয়ার-ভাটায় কিছুটা পলি অপসারিত হইলেও প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং কলিকাতা বন্দরের দুর্দশা হুগলী নদীর দুর্দশার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এরূপ অবস্থায় হুগলীর উন্নতি না হইলে কলিকাতার উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। কলিকাতা বন্দরেব উন্নতির জন্য কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত একটি বিরাট খাল কাটাব প্রস্তাবও ছিল। কিন্তু উহাতে যে ব্যয়, কৃষি জমির ধ্বংস ও অধিবাসীদের অপসারণ প্রয়োজন হইবে তাহাতে নূতন সমস্যাই দেখা দিবে। তাহাতে হুগলী বা উত্তব ভারতের কোন সুরাহাই হইবে না। সুতরাং হুগলী নদীব জলপ্রবাহ বৃদ্ধি করিয়া উহা সহজ নৌবাহন যোগ্য করাই মূল সমস্যা সমাধানেই প্রকৃষ্ট উপায়। এতদ্ উদ্দেশ্যেই গঙ্গাবাঁধ বা ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

গঙ্গাবাঁধ মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কার নিকট তিলডাঙ্গাতে গঙ্গানদীর উপর নির্মিত হইবে। এই স্থানটি মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার সীমান্তে অবস্থিত। এই বাঁধ নির্মাণ শেষ হইলে গঙ্গা নদীর কতকটা জল আটকাইয়া রাখা সম্ভব হইবে এবং বাকীটা পাকিস্তানের পদ্মানদীতে ছাড়িয়া দেওয়া চলিবে। এই আটকান জল একটি খালের সাহায্যে ভাগীরথীতে সরবরাহ করা হইবে। ভাগীরথীর জলপ্রবাহ এইভাবে বৃদ্ধি পাইলে উহার স্রোতবেগও অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভাগীরথী ও হুগলীর বালুচড়া অপসারিত হইয়া সাগরে পড়িবে, নদীর গভীরতা বৃদ্ধি পাইবে এবং উহারা সারা বৎসর নৌবাহনযোগ্য থাকিবে। বড় বড় ষ্টীমার নৌকা অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারিবে। ড্রেজারের ব্যয় হয়ত আর থাকিবে না। থাকিলেও উক্ত ব্যয় অনেক কমিয়া যাইবে। কলিকাতা নগরী নির্মল সুস্বাদু জলের মুখ দেখিবে। অধিবাসীদের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিবে। কর্পোরেশনের জল সরবরাহের ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে না; করদাতাদের

করের লাঘব ঘটিবে। জলঙ্গী, চূর্ণী প্রভৃতি নদীরও জলপ্রবাহ বৃদ্ধি পাইবে এবং উহারাও নানাভাবে উপকৃত হইবে। কলিকাতা হইতে বিহার ও উত্তর প্রদেশেও জলপথে যাতায়াতের কোন অসুবিধা হইবে না। এইভাবে হুগলী নদী রক্ষা পাইলে কলিকাতা বন্দরও রক্ষা পাইবে।

উপরিউক্ত সুবিধা ছাড়া—গঙ্গাবাঁধের উপর রাস্তা ও রেলপথ নির্মিত হইবে। ফলে উত্তর বঙ্গের সহিত দক্ষিণ বঙ্গের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হইবে। মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলা জল সেচনের অনেক সুবিধা পাইবে।

সুতরাং পশ্চিম বঙ্গের উন্নতির জন্য গঙ্গা বাঁধ কত প্রয়োজনীয়। অনেকের মতে গঙ্গা বাঁধ আশানুরূপ ফল দিতে পারিবে না। তাহাদের মতে দেশের ঢাল (slopes) বদলাইয়া গিয়াছে এবং এরূপ অবস্থায় গঙ্গার জল ভাগীরথীতে প্রবেশ করান সহজ হইবে না। গঙ্গা বাঁধ নির্মাণ হইলে পদ্মার জলস্রোত কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। তাই পাকিস্তান এই বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানের ইহাতে বিরুদ্ধতা করা উচিত নয়। কারণ পদ্মার জলস্রোত যদি কিছু কমে তাহাতে উহার উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না। প্রথমতঃ ইহা নিয়মিত জল সরবরাহ পাইবে এবং কীর্তিনাশা পদ্মার ধ্বংস প্রকোপ কমিবে। ভারত সরকার অবশ্য পাকিস্তানের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া কাজে অগ্রসর হইতেছে।

Q. 6. Explain the importance of irrigation in India and describe the various methods of irrigation practised in India.

(B. U. Entrance, 1961)

(ভারতে জল সেচনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর এবং বিভিন্ন প্রণালীর জল সেচন ব্যবস্থা বর্ণনা কর।)

Ans : কৃষিকার্যের জন্য উর্বর জমি যেমন প্রয়োজন, জলেরও তেমন প্রয়োজন। কম বা বেশী হউক জল ভিন্ন কোন ফসল উৎপন্ন হইতে পারে না। কোন কোন শস্য যেমন ধান, পান, পাট, ইক্ষু, চা প্রভৃতির জন্য প্রচুর জল প্রয়োজন। কৃষিকার্যের উপযুক্ত জল বৃষ্টি হইতে পাওয়া যায় কিংবা জলসেচন দ্বারা পাইতে হয়। ভারতে বৃষ্টিপাত কোন অঞ্চলে খুব বেশী (যেমন, আসাম) আবার কোন স্থানে খুব কম (যেমন রাজস্থান)। সুতরাং যে স্থানে বৃষ্টি কম সেখানে জলসেচন নিতান্ত প্রয়োজন। এইভাবে জলসেচনের ফলে পাঞ্জাবের বৃষ্টি বিরল অঞ্চলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইতেছে। ভারতে বৃষ্টিপাত আবার অনিশ্চিত। অনেক সময়ে প্রয়োজনের সময় বৃষ্টিপাত হয় না। আবার যখন প্রয়োজন নাই তখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হইতে দেখা

যায়। এরূপ অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত অঞ্চলে জলসেচন ভিন্ন শস্য উৎপাদন বিঘ্নিত হয়। ভারতে জলসেচ প্রথা এখনও সেরূপ ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে নাই। এজন্য উৎপন্ন শস্য আমাদের প্রয়োজন মিটাইতে পারিতেছে না। প্রতি বৎসরই বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য ও শিল্পের উপযোগী কৃষিজাত কাঁচা মাল যেমন তুলা, পাট প্রভৃতি বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। কৃষিজাত পণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে হইলে অন্যান্য প্রয়োজনের মধ্যে জলসেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন কোন প্রকারেই কম নয়।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকার সেচ ব্যবস্থা চালু আছে, যদিও উহা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

(১) কূপ (Wells): ভারতে প্রায় দেড় কোটি একর জমিতে কূপের সাহায্যে জলসেচন হইয়া থাকে। উহা মোট সিঞ্চিত জমির প্রায় ¼ অংশ। যে সমস্ত অঞ্চলে ভূমিভাগ নরম অথচ বর্ষায় সহজে কূপ ধ্বসিয়া পড়ে না, ভূগর্ভের সামান্য নীচেই জল পাওয়া যায়, কূপ খনন ব্যয় বেশী নহে এবং কূপ হইতে জল তোলা ব্যয়সাধ্য নহে সেখানে কূপের সাহায্যে জলসেচন করা সুবিধাজনক। কপিকল, গো-বাহিত যন্ত্র, পারসিক চক্র প্রভৃতি প্রাচীন প্রথা এবং আধুনিক জল বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে কূপ হইতে জল তুলিয়া মাঠে দেওয়া হয়। বর্তমানে নলকূপ (Tube-well) হইতে জলবিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে জল তোলা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন নদী উন্নয়ন পরিকল্পনা হইতে যে জলবিদ্যুৎ শক্তির উৎপন্ন হয় তাহার কতকটা নলকূপ হইতে জল তোলার কার্যেও ব্যয়িত হয়। নলকূপ সাহায্যে জলসেচ করার অসুবিধাও আছে। ইহার জল বহুদূরে লইয়া যাওয়া যায় না। ইহা ছাড়া এই জল জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে না। ফলে মাঠে সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয়।

উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে কূপের সাহায্যে জলসেচন দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের শতকরা ৯০ ভাগ নলকূপ উত্তর প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) জলাশয় (Tank) ছোট বড় জলাশয় হইতে ডোঙ্গার সাহায্যে অনেকস্থলে এখনও জলসেচ প্রথা প্রচলিত আছে। যে সমস্ত স্থানে ভূমি অসমান সে রকম অনেক স্থানে নীচু স্থানে বা গর্তে জল জমিয়া জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। দাক্ষিণাত্যে এরূপ অনেক জলাশয় আছে। ইহা হইতে জল লইয়া মাঠে জল সেচ করা হয়। বাঁধ দিয়াও নদীর জল বা বৃষ্টির জল দ্বারা সঞ্চিত জলাশয় (Storage Tank) সৃষ্টি করা হয় এবং খালের সাহায্যে উক্ত জলাশয় হইতে জল লইয়াও

মাঠে জল সেচন হইয়া থাকে। অনেক নদীতে এরূপ বাঁধ দিয়া জলাশয় সৃষ্টি হইয়াছে ও দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ, মহীশূর, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যে এইরূপ জল সেচ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। গোদাবরী নদীর উপর বাঁধ দিয়া নাসিকে এক সুন্দর জলাশয় সৃষ্টি করিয়া জলসেচন হইতেছে। উত্তর ভারতেও নানা স্থানে এরূপ জলাশয় সৃষ্টি করা হইয়াছে। প্রায় ৯০ লক্ষ একর জমিতে এরূপ ভাবে জলসেচের

ব্যবস্থা আছে। নদী উন্নয়ন পরিকল্পনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ জলসেচন প্রণালীও বৃদ্ধি পাইতেছে।

(৩) **খাল** (Canal): খাল সাধারণতঃ দুই প্রকারের: (১) **প্লাবন খাল** (Innundation Canal) এবং (২) **নিত্যবহ খাল** (Perennial Canal)।

যে খালে নদীতে জল বৃদ্ধি বা বন্যার উপর জল প্রবেশ নির্ভর করে তাহাকে প্লাবন খাল বলে। প্লাবন খাল বন্যা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং নদীতে জলবৃদ্ধি পাইলে জলসেচনের উপযোগী জল প্রাপ্ত হয়। পশ্চিম্ বঙ্গে ও মধ্য প্রদেশে এই প্রকার খাল দেখিতে পাওয়া যায়।

নিত্যবহ খাল সকল সময়ে জল প্রবেশ করে। নদীর উপর বাঁধ দিয়া জল আটকাইয়া উক্ত জল খালে প্রবেশ করান হয়। ইহার জলপ্রবাহ সারা বৎসরই জল সেচনের কাজে লাগান যায়। পাঞ্জাবের শিরহিন্দ ও পশ্চিম যমুনা খাল, উত্তর প্রদেশের উচ্চ ও নিম্ন গাঙ্গেয় খাল, আগ্রা খাল, সর্দা খাল, প্রভৃতি এই প্রকার নিত্যবহ খাল। দক্ষিণ ভারতেও নদীগুলিতে এরূপ অনেক খাল আছে। বহুমুখী নদী উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী বহু নদীতে এরূপ অনেক খাল খনন করা হইয়াছে। ইহাই বর্তমানে ভারতের প্রধান জলসেচ প্রণালী এবং সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ জমিতে এই উপায়ে জলসেচন হইয়া থাকে। এরূপে সিঞ্চিত জমির পরিমাণ ২ কোটি একরের উপরে। বর্তমানে কর্ষিত জমির প্রায় $\frac{1}{8}$ অংশে মাত্র জলসেচের ব্যবস্থা আছে।

নবম অধ্যায়

মৎস্য আহরণ

(Fishing)

Q. 1. State the characteristics of an ideal fishing ground.
(B. U. Entrance, 1961)

(আদর্শ মৎস্যক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর)।

Or

What are the characteristics of a good fishing ground ? (B U. Entrance, 1963)

(ভাল মৎস্যক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য কি ?)

Or

State the physical characteristics of the principal fishing grounds of the world. Name at least three of such fishing grounds. (Pre . U. 1963)

(প্রধান প্রধান মৎস্যক্ষেত্রগুলির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। কমপক্ষে তিনটি মৎস্যক্ষেত্রের নাম উল্লেখ কর।)

Ans. মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র দুই প্রকার—(১) নদী, খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতি স্বাদুজলের মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র এবং (২ সাগর বা মহাসাগরের লবণাক্ত জলের মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র। এখানে আদর্শ মৎস্যক্ষেত্র বলিতে সাগর বা মহাসাগরের লবণাক্ত জলের মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রকেই বুঝাইতেছে। স্বাদু জলের মৎস্য স্থানীয় প্রয়োজনই সাধারণতঃ মিটাইয়া থাকে। লবণাক্ত সামুদ্রিক মৎস্য স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও প্রবেশ করে। এজন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া সামুদ্রিক মৎস্যই প্রসিদ্ধ। এরূপ সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ দেখিতে পাওয়া যায় :

১। আদর্শ মৎস্যক্ষেত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে—উহা সমুদ্রতীরের নিকটবর্তী অগভীর সমুদ্রে (shallow sea) অবস্থিত। প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য মৎস্যক্ষেত্রগুলি অগভীর মহীসোপানে, উপকূল ভাগ কিংবা মহাদেশের নিকটবর্ত্তী মগ্নচড়া (banks) গুলিতেই অবস্থিত। ইহাদের গভীরতা কোথাও ১২০০ ফুটের বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্যই সমুদ্রের এই স্থানগুলি মৎস্য আহরণে বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়া আছে :

(ক) সমুদ্রের এরূপ অগভীর স্থানে মৎস্যের উপযোগী খাদ্যাদি অধিক মাত্রায় বর্তমান। প্রথমতঃ এই অগভীর অংশে একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ জন্মে। ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকীটও জন্মিয়া থাকে। উক্ত জলকীট ও উদ্ভিদ মৎস্যের লোভনীয় ও পুষ্টিকর খাদ্য। এই সমস্ত উদ্ভিদ ও জলকীট গভীর সমুদ্রে বাঁচিতে পারে না। অগভীর সমুদ্রের সূর্য্যালোক ইহাদের জীবন ধারণের উপায়। তাহা ছাড়া নদী-বাহিত এবং সমুদ্রের অগভীর অংশের সঞ্চিত আবর্জনা ও জীবজন্তুর মৃতদেহ মৎস্যের উপযুক্ত ও প্রিয় খাদ্য। সুতরাং অগভীর অংশে মৎস্যের খাদ্যের প্রাচুর্য্য থাকায় অধিক সংখ্যক মৎস্য এ অঞ্চলে আনাগোনা করিয়া থাকে।

(খ) অগভীর সমুদ্র মৎস্যের ডিম প্রসব করিবার ও উপযুক্ত ক্ষেত্র। এজন্য ডিম প্রসবের জন্যও বহু মৎস্য এ অঞ্চলে আসিয়া থাকে।

(গ) অগভীর সমুদ্রেই অধিকসংখ্যক মৎস্য দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করিয়া থাকে।

২। মৎস্য ক্ষেত্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে উহা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই সমধিক প্রসিদ্ধ অধিকাংশ বড় বড় মৎস্যচারণ ক্ষেত্রগুলি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেই সীমাবদ্ধ। নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্যই উহা সম্ভব হইয়াছে ঃ

(ক) এরূপ জলবায়ু মৎস্য সংরক্ষণের উপযোগী। মৎস্য পচনশীল বলিয়া উষ্ণ জলবায়ুতে দ্রুত নষ্ট হইয়া যায়।

(খ) উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনস্থানে মৎস্যের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। উহা প্রায় সমস্ত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিউফাউন্ল্যাণ্ডের উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের ও শীতল লাব্রাডার স্রোতের ও জাপানের উষ্ণ কিউরোশিও ও শীতল কামচাটকা স্রোতের মিলনস্থান উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(গ) উষ্ণমণ্ডলে নানা রং-বেরংএর অনেক মাছ পাওয়া গেলেও উহাদের অনেক-গুলি অখাদ্য ও বিষাক্ত। নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের অগভীর স্থানেই একজাতীয় সুস্বাদু মৎস্য প্রচুর পাওয়া যায়।

(ঘ) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে উপকূল রেখা অপেক্ষাকৃত বেশী ভগ্ন। এজন্য মৎস্য আহরণের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক বন্দর ও পোতাশ্রয় গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে। এখানে উষ্ণমণ্ডল অপেক্ষা ঝড় ও ঘূর্ণিবাতের প্রকোপ অনেক কম। উষ্ণমণ্ডলে জলজ কীট ও উদ্ভিদ যাহা মাছের প্রিয় খাদ্য উহা ভাল জন্মে না।

(ঙ) মৎস্য আহরণের উপযুক্ত শ্রমিকও এখানে যথেষ্ট। কারণ সমুদ্র সান্নিধ্য হেতু এখানকার লোক সমুদ্রে যাতায়াত করিতে ভয় পায় না। ইহা ছাড়া ইহা ঘনবসতিপূর্ণও বটে। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর জন্য অধিবাসীরা বলিষ্ঠ ও কর্মঠ।

(চ) এখানে মৎস্য আহরণের উপযুক্ত জাহাজ বা নৌকা নির্মাণের উপযোগী কাষ্ঠাদি ও অন্যান্য যন্ত্রাদির সরবরাহের অভাব নাই।

(ছ) এখানে কৃষি উপযোগী ভূমির প্রাচুর্য্য নাই। এজন্য মৎস্য শিকার অধিবাসীদের একটি প্রধান উপজীবিকা।

(জ) এ অঞ্চলে মৎস্য সংরক্ষণের জন্য বরফ সরবরাহ, হিমাগার প্রভৃতির অভাব নাই। ইহা ছাড়া মৎস্য হইতে তৈল নিষ্কাশণ, মৎস্য শুষ্ক করা, টিনে ভর্ত্তি করা, ঔষধ পত্রাদি তৈয়ারী করার শিল্প নৈপুণ্য যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

(ঝ) এখানে সামুদ্রিক মৎস্যের চাহিদা ও বিক্রয় বাজার বর্ত্তমান, উন্নত যানবাহন প্রভৃতিও মৎস্য আহরণে প্রেরণা যোগাইয়া থাকে। পৃথিবীর মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রগুলির মধ্যে উত্তর সাগরের মগ্নচড়া ডগার ব্যাঙ্ক (Doggers Bank), উত্তর-পশ্চিম ইউরোপও জাপানের উপকূলভাগ, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার তীরবর্তী অঞ্চল ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের মগ্নচড়া গ্রাণ্ড ব্যাঙ্ক (Grand Bank) মৎস্যক্ষেত্র হিসাবে পৃথিবীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের সবগুলি উপরিউক্ত অগভীর সমুদ্রের ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

Q 2. Examine the economic importance of shallow seas with regard to fishing (C U. Inter, 1930, 1939, 1940),

(মৎস্য আহরণে অভীর সমুদ্রের অর্থ নৈতিক গুরুত্ব আলোচনা কর।)

Ans. See to Ans. of the first part of the Q. 1

Q. 3. Discuss the causes of development of fishing industry in the temperate zone

(নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে মৎস্যশিল্পের উন্নতির কারণ আলোচনা কর।)

Ans. See to Ans. of the 2nd part of the Q. 1

Q. 4. Describe briefly the principal fishing grounds of the world. (B. U. Entrance 1961).

(পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎস্যক্ষেত্রগুলির সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।)

Or

Describe briefly the principal fishing areas of the world and account for the rapid growth of modern fishing along the shores of Japan. (C. U. Inter. 1956)

(পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎস্যক্ষেত্রগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও এবং জাপানের উপকূলে আধুনিককালের মৎস্য আহরণের দ্রুত উন্নতির কারণ বর্ণনা কর।)

Or

Describe at least two important fishing grounds of the world
(B. U. Entrance. 1963)

(কমপক্ষে দুইটি মৎস্যক্ষেত্রের বিবরণ দাও।)

Ans. নিম্নে প্রধান প্রধান মৎস্যক্ষেত্রগুলির বিবরণ দেওয়া হইল :

(১) **উত্তর সাগর ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহ :** উত্তর সাগরের ডগার ব্যাঙ্ক, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও ব্রিটীশ দ্বীপপুঞ্জের তীরবর্তী অগভীর সমুদ্র এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চল আইসল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মৎস্যক্ষেত্রটি পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ। ইহা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। তাহা ছাড়া এ অঞ্চলের পশ্চিমে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিক দিয়া উষ্ণ আটলাণ্টিক স্রোত এবং তলদেশ দিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে শীতল আর্কটিক স্রোত প্রবাহিত। এ অঞ্চলে লোকবসতি ঘন, কৃষিযোগ্য ভূমি কম, উপকূলভাগ ভগ্ন, অনেক নদী আসিয়া পড়িয়াছে এবং অনেক জাহাজ যাতায়াত করে। এখানে বহু বন্দর, পোতাশ্রয়, মৎস্য ধরিবার, মৎস্য সংরক্ষণ ও ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা আছে। ফলে মৎস্য আহরণে ও মৎস্য শিল্পে এ অঞ্চল বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এ অঞ্চলের মধ্যে গ্রেটব্রিটেন মৎস্য ব্যবসায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে এবং পৃথিবীর মধ্যে মৎস্য আহরণ শিল্পে জাপানের পরেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইংলণ্ডের বিলিংসগেট শহর এখানকার সুপ্রসিদ্ধ মৎস্য ব্যবসার কেন্দ্র। ইহা ছাড়া যে সমস্ত বন্দর মৎস্য ব্যবসায়ে লিপ্ত তাহাদের মধ্যে গ্রেটব্রিটেনের পূর্ব উপকূলে স্কটল্যাণ্ডে উইক, সারউইক, ফ্রেজারবার্গ পিটারহেড, স্টোনওয়ে, লীথ, থারসো, এবার্ডিন, ইংলণ্ডে হাল, গ্রিমসবী, ইয়ারমাউথ, লোয়েষ্টফট, লণ্ডন, ইংলণ্ডের পশ্চিম উপকূলের মিলফোর্ট, ফ্রিট্উড ও ওয়েলসের কার্ডিফ উল্লেখযোগ্য। এখানে কড, হেরিং, ম্যাকারেল, স্যামন, হ্যালিবাট, লবষ্টার প্রভৃতি মৎস্য ধৃত হইয়া থাকে। এ অঞ্চলে নরওয়ে, আইসল্যাণ্ড ও ফ্রান্স মৎস্যশিকারে সমধিক প্রসিদ্ধ। পৃথিবীতে উৎপন্ন তিমি (whale) মৎস্যের তৈলের অর্ধেক নরওয়ে সরবরাহ করিয়া থাকে। ইহার বার্গেন প্রসিদ্ধ মৎস্যশিকার কেন্দ্র। আইসল্যাণ্ডের অধিবাসীরা মাথাপিছু সবচেয়ে বেশী মাছ ধরিয়া থাকে। ইহা তাহাদের প্রধান উপজীবিকা। উত্তর সাগরের মৎস্য সম্পদ হ্রাস পাইতে থাকিলে আইসল্যাণ্ডের তটভাগ প্রাধান্যলাভ করিতে থাকে।

(২) **নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, লাব্রাডার, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল সংলগ্ন আটলান্টিক মহাসাগর :** উত্তর সাগরের মত এখানে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের সন্নিকটে গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক, এবং যুক্তরাষ্ট্রের সন্নিকটে জর্জেস ব্যাঙ্ক মগ্নচড়া অবস্থিত। ইহা ছাড়া

এ অঞ্চলের উপকূলভাগ ভগ্ন, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত, উষ্ণ উপসাগরীয় ও শীতল লাব্রাডার স্রোতের মিলনস্থল ও তীরবর্তী অঞ্চল সমূহের নদী মোহনা অগভীর। এ অঞ্চলও একটি বিশিষ্ট মৎস্যচারণ ক্ষেত্র। কড্, ম্যাকারেল, হেরিং, হ্যালিবাট প্রভৃতি মাছ ধৃত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া গলদাচিংড়ি, কাঁকড়া, ঝিনুকও পাওয়া যায়। সেণ্টজন, হ্যালিফাক্স, মণ্ট্রিল, বোষ্টন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য মৎস্য বন্দর। কানাডার লোকবসতি কম বলিয়া বিদেশে বহু মাছ রপ্তানি করিতে পারে। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে কৃষির উপযোগী ভূমি কম। এজন্য মৎস্য শিকার ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। যুক্তরাষ্ট্র মৎস্য আহরণে সমধিক প্রসিদ্ধ।

(৩) **উত্তর আমেরিকার প্রশান্ত-মহাসাগরীয় উপকূল :** এই অঞ্চল আলাস্কা হইতে ক্যালিফোর্ণিয়া পর্যান্ত বিস্তৃত এ অঞ্চলের সমুদ্রের অগভীর অংশ ছাড়া স্কিনা, ফ্রেজার, কলম্বিয়া প্রভৃতি নদী মোহনাতেও প্রচুর মাছ ধৃত হয়। এ অঞ্চল স্যামন মাছের জন্য প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া হেরিং কড্, টেবল ফিস, হ্যালিবাট, সার্ডিন প্রভৃতি মাছ ধৃত হয়। ভিক্টোরিয়া, সিটকা, প্রিন্সরুপার্ট, পোর্টল্যাণ্ড, ভ্যাঙ্কুবার প্রভৃতি ইহার প্রসিদ্ধ মৎস্যবন্দর। এ অঞ্চলও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত এবং এখানে মৎস্য ধরার অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আছে।

(৪) **জাপানের তীর সংলগ্ন সমুদ্র :** এ অঞ্চলের মৎস্যক্ষেত্র জাপানের হকাইডো, হনসু, কিউরাইল, কোরিয়া ও শাখালিনের নিকটবর্তী সমুদ্রে বিস্তৃত। এ অঞ্চল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত, অগভীর, কিউরোসিও ও শীতল কামচাটকা স্রোতের মিলনস্থল। এখানকার অধিবাসীরা কর্মঠ এবং কৃষির উপযোগী ভূমি এখানেও কম। এজন্য এখানকার অধিবাসীদের মৎস্য শিকার একটি প্রধান উপজীবিকা এবং প্রায় ২৫।৩০ লক্ষ লোক ইহাতে নিযুক্ত। জাপান সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী মাছ ধরিয়া থাকে। তবে ধৃত মৎস্যের শতকরা ৮০ ভাগ স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইতে লাগে। সুতরাং মৎস্যের বৈদেশিক বাণিজ্য ধৃত মৎস্যের তুলনায় কম। কড, হেরিং, ম্যাকারেল, স্যামন, কাঁকড়া, বনিটো, টুনা প্রভৃতি মাছ ধৃত হয়। খাদ্যের অনুপযুক্ত অনেক মাছ জমিতে সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এখানে অনেক মুক্তাও ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত হয়। ভ্লাডিভষ্টক অঞ্চলে এবং কিউরাইল দ্বীপের সন্নিকটে রাশিয়ার মাছ ধরা জাহাজের তৎপরতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। চীনের ভগ্ন উপকূলও মৎস্য শিকারে প্রসিদ্ধ। অনুকূল পরিবেশ, বিজ্ঞানের উন্নতি, মৎস্যের স্থানীয় চাহিদা, সরকারের আনুকূল্য, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণের জন্য জাপান বর্তমানে মৎস্য শিকারে দ্রুত উন্নতিলাভ করিতেছে।

উপরিউক্ত অঞ্চলগুলি ছাড়া ভারত, রাশিয়া, গ্রীণল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ

আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও মৎস্যক্ষেত্র আছে। অগভীর সমুদ্র ছাড়া গভীর সমুদ্রেও মৎস্য শিকার হয়। এ বিষয়েও জাপানীরা বিশেষ পটু। এই ভাবে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে অনেক তিমি ও হাঙ্গর ধৃত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাৎসরিক মাথাপিছু ধৃত মৎস্যের পরিমাণ ও উহার ব্যবহার নিম্নে দেওয়া হইল :—

ধৃত মৎস্যের পরিমাণ		ধৃত মৎস্যের ব্যবহার	
জাপান	১১১ পাউণ্ড	জাপান	২৩ কিলোগ্রাম
কানাডা	১০৯ ”	নরওয়ে	১৯ ”
ডেনমার্ক	৬৩ ”	যুক্তরাজ্য	১০ ”
যুক্তরাজ্য	৪৯ ”	পঃ জার্মানী	৭ ”
যুক্তরাষ্ট্র	৩৮ ”	ইসরাইল	৭ ”
রাশিয়া	১৮ ”	মিশর	৬ ”
ভারত	৪ ”	যুক্তরাষ্ট্র	৫ ”
		অষ্ট্রেলিয়া	৪ ”
		আর্জেন্টিনা	২ ”
		পাকিস্তান	২ ”
		ভারত	১ ”

মৎস্যের উৎপাদন—(১৯৬০)

মোট উৎপাদন—৩·৭৫ কোটি টন।

জাপান	৬১·৯০ লক্ষ টন	ভারত	১৪·০০ লক্ষ টন
চীন	৫০·০০ ” ”	ব্রিটেন ('৫৮)	১০·০০ ” ”
রাশিয়া	৩০·০০ ” ”	কানাডা ('৫৮)	১০·০০ ” ”
যুক্তরাষ্ট্র	২৮·০০ ” ”	জার্মানী ('৫৭)	৭·০০ ” ”
নরওয়ে	১৬·০০ ” ”	স্পেন ('৫৭)	৭·০০ ” ”

ইন্দোনেশিয়া ('৫৭) ৬·০০ লক্ষ টন

Q. 5. Mention the principal products obtained from fish.
(C. U. Inter. 1945, 1947)

(মৎস্য হইতে প্রাপ্ত প্রধান দ্রব্যগুলি উল্লেখ কর)

Ans. মৎস্য আমাদের নিম্নলিখিত প্রয়োজন ও দ্রব্যের অভাবপূরণ করিয়া থাকে।

এক কিলোমিটারে যতটা মাছ ধরা হয় তাহা কিলোগ্রামে দেখান হয়েছে

পৃথিবীর মৎস্যচারণ ক্ষেত্র

প্রধান  অপ্রধান 

(১) মৎস্য প্রধানতঃ খাদ্যের জন্যই ধরা হয়। টাটকা মৎস্য টিনে ভর্তি, শুষ্ক ও লবণাক্ত অবস্থায় আমাদের খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়।

(২) বিষাক্ত ও অখাদ্য মৎস্য এবং মৎস্যের অপ্রয়োজনীয় অংশ জমিতে সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(৩) কড, শীল, তিমি প্রভৃতি মৎস্যের তৈল ঔষধ প্রস্তুত করিতে, যেমন কডের যকৃত তৈল (Cod liver oil), হাঙ্গর তৈল (Shark oil) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাডা সাবান প্রস্তুত করিতে, চামডা ট্যান করিতে ও অন্যান্য শিল্পে ইহাদের তৈল ব্যবহৃত হয়।

(৩) বড বড মৎস্যের অস্থি, চামডা, মেদ (Fat), লেজ প্রভৃতিও বিভিন্ন প্রয়োজনে লাগিযা থাকে। যেমন গোলাকার লম্বা লেজযুক্ত একপ্রকার মাছের লেজ চাবুক তৈয়ারী করাতে ব্যবহৃত হয়।

(৪) মৎস্য শিকারের আনুসঙ্গিক হিসাবে মুক্তা (Pearl), প্রবাল (Coral), শঙ্খ (Conch Shell) প্রভৃতি ধৃত হয় এবং মূল্যবান দ্রব্য হিসাবে আদরণীয়। সমুদ্র হইতে উত্তোলিত ইসিংগ্লাস (Isinglass), স্পঞ্জ (Spongo) প্রভৃতিও নানা কাজে লাগিয়া থাকে। মাছের আঁশও নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। জাপানে ঝিনুকের সাহায্যে কৃত্রিম মুক্তা উৎপাদন হইযা থাকে। স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইয়া সামুদ্রিক মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও প্রবেশ করিয়া থাকে। কানাডা, নরওয়ে ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড মৎস্যাদি রপ্তানিতে বিশেষ প্রসিদ্ধ। গ্রেটব্রিটেন ও জাপান কিছু রপ্তানি করিয়া থাকে। ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স প্রভৃতি প্রধান আমদানিকারক দেশ।

Q. 6. State the conditions necessary for the development of the fishing industry and the provinces in our country which possess such facilities. Do you think that West Bengal possesses such facilities ? (C. U. Inter, 1943, 1948)

(মৎস্য শিল্পের উন্নতির জন্য কোন্ কোন্ অবস্থা প্রয়োজনীয় এবং আমাদের দেশের কোন্ কোন্ প্রদেশে ঐরূপ অবস্থা আছে তাহা উল্লেখ কর। পশ্চিমবঙ্গের এরূপ সুবিধা আছে কি ?)

Or

Discuss the present position of India's fishing industry with special reference to West Bengal.

(পশ্চিমবঙ্গের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া ভারতের মৎস্যশিল্পের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা কর।)

Ans. প্রথম অংশ বিস্তৃত উত্তর Q. 1-এ দ্রষ্টব্য।

মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র সাধারণতঃ তিনপ্রকার :

(১) অভ্যন্তরস্থ নদী, নালা, খাল, বিল প্রভৃতি স্বাদুজলের মৎস্যক্ষেত্র।

(২) উপকূলীয় অগভীর সমুদ্রের মৎস্যক্ষেত্র।

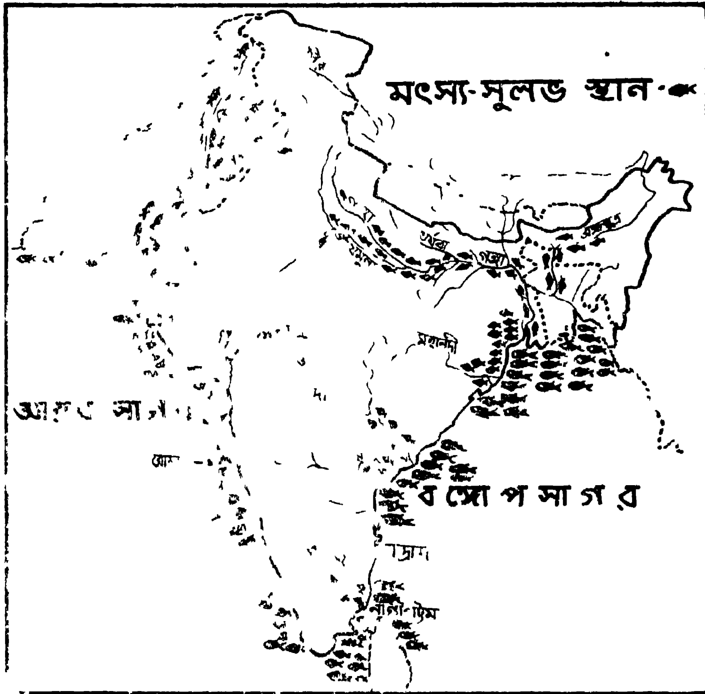
(৩) গভীর বহিঃসমুদ্রের মৎস্য ক্ষেত্র।

(১) **আভ্যন্তরীণ স্বাদুজলের মৎস্য ক্ষেত্র** : ভারতের অভ্যন্তরে মরুভূমি ও দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া প্রত্যেক রাজ্যেই বহু নদী, নালা, খাল, বিল প্রভৃতি আছে। পশ্চিমবঙ্গেও ইহাদের অভাব নাই। এই স্বাদু জলের রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিশ, কই, মাগুর প্রভৃতি মাছ ভারতীয়দের অত্যন্ত প্রিয়। ইহার চাহিদাও সর্বাধিক কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহার যোগান খুবই কম। ইহা ভারতের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ⅞ অংশ। ইহার কারণ আভ্যন্তরীণ জলাশয়গুলিতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মাছের চাষ আবাদ এখনও ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয় নাই। অনেক নদী, নালা, পুকুর, ইত্যাদি মজিয়া গিয়াছে। এইভাবে মাছের যোগান কম হইতে চলিযাছে কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গেই ইহা ভয়াবহতা সবচেয়ে বেশী, যদিও এই রাজ্যে সবচেয়ে বেশী মাছ উৎপন্ন হয়। ইহার কারণ পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ লোক মৎস্যভোজী।

(২) **উপকূলীয় মৎস্য ক্ষেত্র** : ভারতের উপকূল রেখা ৩০০০ মাইলের উপরে দীর্ঘ। ইহার পশ্চিম উপকূলে আরব সাগর এবং পূর্ব উপকূলে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, কেরালা, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। বহু নদনদী ও নদীনালা সংযুক্ত ব-দ্বীপ অঞ্চল উপকূলের সন্নিকটেই অবস্থিত। এ কারণে উপকূলে মৎস্যশিকার খুবই বিস্তৃত। যদিও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলই উপকূলীয় মৎস্য শিকারে প্রসিদ্ধ, কারণ ঐ অঞ্চলেই অধিকাংশ সুস্বাদু মৎস্যের আবাসস্থল, ভারতের উপকূল সমুদ্রে নানাবিধ মৎস্যের অভাব নাই। কিন্তু উপকূলে আশানুরূপ মৎস্য শিকার এখনও ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয় নাই। ইহার প্রথম কারণ হইতেছে ভারতের অধিবাসীদের অনেকেই সামুদ্রিক মাছ পছন্দ করেন না। তাহা ছাড়া মৎস্যের নানাবিধ ব্যবহার, লবণ, বরফ, ঠাণ্ডাঘর ও দ্রুত চালান দেওয়ার, মাছ ধরিবার প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, নৌকার ও ধীবরদের শিক্ষার অভাবের জন্য উপকূলীয় মৎস্য শিকার বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী চেষ্টায় সামুদ্রিক মাছ কিছুটা ধৃত হইতেছে। বঙ্গোপসাগর ছাড়া সুন্দরবনের বদ্বীপ অঞ্চল উৎকৃষ্ট মৎস্য উৎপাদন ক্ষেত্র। কিন্তু মৎস্য উৎপাদনে আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারে নাই। সুস্বাদু সামুদ্রিক মাছ যাহা ধৃত হইতেছে তাহার মধ্যে পমফ্রেট, শ্যামন, ম্যাকারেল, ভেট্‌কি, ইলিশ, চিংড়ি, বাইন প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য ; হাঙরও কিছু কিছু ধৃত হইয়া থাকে এবং উহার তৈল ঔষধ প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

মাদ্রাজ, নাগাপত্তম, বিশাখাপত্তনম, মসলিপত্তনম, কোচিন, কালিকট, ম্যাঙ্গালোর, বোম্বাই প্রভৃতি প্রসিদ্ধ উপকূলীয় মৎস্য শিকার কেন্দ্র।

(৩) **গভীর বহিঃসমুদ্রের মৎস্য ক্ষেত্র:** বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের দূরবর্তী অঞ্চল ও ভারত মহাসাগর ভারতের গভীর বহিঃসমুদ্র মৎস্য শিকার ক্ষেত্র। কিন্তু এ অঞ্চলে মৎস্য শিকার মোটেই প্রসার লাভ করে নাই। অভিজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রাপ্ত



ধীবরের জাহাজের, সংরক্ষণ ব্যবস্থার ও যন্ত্রাদির অভাবের জন্য বহিঃসমুদ্রে মৎস্য শিকারে ভারত এখনও পশ্চাৎপদ।

মোটের উপর উপকূলভাগ ও সমুদ্রের মাত্র শতকরা ১০ ভাগ স্থানে বর্তমানে ভারতে মৎস্য ধৃত হইয়া থাকে। ভারতের শতকরা ৪২ জন অধিবাসী মৎস্যভোজী। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাৎসরিক গড়ে জনপ্রতি মৎস্যের ব্যবহার নিম্নরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

কেরালা	১২ পাউণ্ড	আসাম	৬ পাউণ্ড
পশ্চিমবঙ্গ	১৩ "	উড়িষ্যা	৫ "
বোম্বাই	৭ "	পাঞ্জাব	৯ "

বিহার ২ পাউণ্ড

ভারতে মোট মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ১৪ লক্ষ টন (১৯৬০)। ধৃত মৎস্যের তিনভাগ সামুদ্রিক মৎস্য এবং একভাগ স্বাদুজলের মৎস্য। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মৎস্যের উৎপাদনের উন্নতির জন্য গবেষণাগার স্থাপন, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও ধীবরদের শিক্ষা প্রভৃতি ব্যবস্থা চলিতেছে। ইহার ফলে অদূর ভবিষ্যতে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Q. 7. Write short note on :

(a) Fishing in the Indian Union. (pre-C. U. 1962)

(সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও : (ক) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মৎস্য শিকার।)

Ans : Q. 6 এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

দশম অধ্যায়

পরিবহণ ও বাণিজ্যপথ

(Transport and Trade Routes)

Q. 1. Describe the importance of Transport in the economic activities of men.

(মানুষের অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপে পরিবহণের গুরুত্ব বর্ণনা কর।)

Ans : পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ সব দেশে সমান বা একরূপ নয়। আবার মানুষের সম্ভোগ স্পৃহারও অন্ত নাই। এ জন্য যে দেশে প্রয়োজনের তুলনায় কোন দ্রব্য অধিক উৎপন্ন হয় সে দেশ হইতে চাহিদা অনুযায়ী ঘাটতি এলাকায় উক্ত দ্রব্য প্রেরিত হয়। এইভাবে দ্রব্য বিনিময়ের প্রয়োজনে ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। এই দ্রব্য বিনিময় আবার বিভিন্ন প্রকার পরিবহণ ব্যবস্থার অস্তিত্ব ভিন্ন সম্ভব নয়। সুতরাং পরিবহণ পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম।

(২) পরিবহণ পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে প্রয়োজনের তুলনায় কোন দেশের পণ্য উৎপাদন ও উহার গতিবেগ বৃদ্ধি করে। কানাডা বা অষ্ট্রেলিয়া তাহার প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী গম উৎপন্ন করিতেছে। পরিবহণের সাহায্যে উদ্বৃত্ত গম বিদেশে চালান দেওয়ার সুবিধা আছে বলিয়া উহাদের পক্ষে প্রয়োজনের তুলনায় বেশী গম উৎপন্ন করা বা উহার গতিবেগ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে। অনুরূপভাবে ভারতের পাটজাত দ্রব্য, লাক্ষা, চা ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি বা বিদেশে রপ্তানি করা পরিবহণের সুবিধা আছে বলিয়াই সম্ভব হইতেছে। হিমালয় পর্বত অনেক প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। কিন্তু দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পরিবহণের অসুবিধার জন্য উক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষের ভোগে কমই লাগিতেছে। কানাডার পশ্চিমাঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ বা কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি রেলপথ নির্মিত হওয়ার পূর্বে সম্ভব হয় নাই। রেলপথ নির্মিত হওয়ার পরে মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চলের নানাবিধ পণ্য উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করে এবং কানাডারও অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতে থাকে।

(৩) পরিবহণ ভৌগোলিক শ্রম বিভাগের (Division of Labour) পরম সহায়ক। পরিবহণের সুবিধা থাকায় পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ অঞ্চল বিশেষ বিশেষ পণ্য উৎপাদনে মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছে এবং যথেষ্ট কৃতিত্বও

দেখাইয়াছে। মালয়ের রবারের আবাদ, ব্রেজিলের কফি উৎপাদন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যানবাহনের অসুবিধার জন্য বন্য রবার উৎপাদন হ্রাস পায় এবং উক্ত পরিবহণ ব্যবস্থার সুযোগ লইয়া আবাদী রবার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

(৪) পরিবহণ ব্যবস্থা কোন অঞ্চলে কোন প্রকার শিল্পাগার স্থাপনেও পরম সহায়ক। কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, শ্রমিক আমদানি এবং উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে পাঠানোর সুবিধা না থাকিলে কোন স্থানে শিল্পালয় স্থাপন হওয়া সম্ভব নয়। পরিবহণের সুবিধার জন্যই পৃথিবীর বা দেশের বিভিন্ন স্থান বিভিন্ন শিল্পে বিশেষ বিশেষ উন্নত হইতে পারিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বোম্বাইয়ের বা ম্যানচেষ্টারের বস্ত্রশিল্প, পশ্চিম বঙ্গের পাট শিল্প প্রভৃতি উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(৫) দুর্গম স্থানের প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ বা অজ্ঞাত ও অখ্যাত স্থানের সমৃদ্ধি পরিবহণের ফলেই সম্ভব। দুর্গম দক্ষিণ-আফ্রিকার বা পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্ণ আহরণ, মরুময় চিলির নাইট্রেট আহরণ প্রভৃতি পরিবহণের ফলেই সম্ভব হইয়াছে।

(৬) পরিবহণ দুর্ভিক্ষ নিবারণেও পরম সহায়ক। কোন স্থানে খাদ্যের অভাব ঘটিলে উদ্বৃত্ত এলাকা হইতে পরিবহণ ব্যবস্থার সুযোগ থাকিলে অনায়াসে খাদ্য প্রেরণ করিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা চলে।

(৭) ইহা দেশরক্ষার পক্ষেও নিতান্ত প্রয়োজন। সৈন্য ও রসদ পরিবহণ ব্যবস্থার সুবিধা না থাকিলে তাড়াতাড়ি একস্থান হইতে অন্যস্থানে পাঠান এবং শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব নহে।

(৮) পরিবহণই আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য, সহযোগিতা বা ভাবের আদান প্রদানের ভিত্তি স্বরূপ। পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ার ফলেই এখন আর কোন দেশই অধিক দূর বলিয়া মনে হয় না। ছয়মাসের রাস্তা উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থায় ছয় দিনে পৌছান সম্ভব হয়। এইভাবে যাতায়াতের ফলে পরস্পরের মধ্যে মেলামেশা, ভাবের আদান প্রদান, সহযোগিতা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সুগম হয়।

এইভাবে পরিবহণ বিভিন্ন উপায়ে মানুষের অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। মোট কথা পরিবহণ ব্যবস্থা পণ্য উৎপাদন, বণ্টন লোক চলাচল ব্যাপারে দেশের রক্তচলাচলবাহী শিরা উপশিরার মত কাজ করিয়া লোকের অর্থনৈতিক দেহকে সজীব ও সতেজ রাখে।

Q. 2, Describe briefly the different means of Transport
(বিভিন্ন প্রকার পরিবহণ ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।)

Ans. দেশের ভৌগোলিক অবস্থার উপর উহার পরিবহণ ব্যবস্থা নির্ভর করে। এজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নরূপ পরিবহণ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

স্থলপথে মানুষ, পশু, মোটর, রেল প্রভৃতি পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও পরিবহণ কার্য্যে লিপ্ত আছে। স্বল্পদূরত্বের মধ্যে যেখানে অন্য যানবাহন নাই যেমন রেল ষ্টেশন হইতে ষ্টিমার ষ্টেশনে বা জাহাজ ঘাটায় বা অন্য কোন যানে মালপত্র উঠাইতে হইলে মানুষ পরিবহণের কাজ করিয়া থাকে। নিরক্ষীয় বনভূমিতে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক স্থলে, হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে এখনও মানুষ মাল বহনের কাজ করিয়া থাকে। মানুষ পিঠে বা মাথায়, রিকসা বা ঠেলাগাড়ীতে করিয়া মাল বহন করিয়া থাকে।

পশুও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভার বহনের কাজ করিয়া থাকে। পশ্চিম ইউরোপে ঘোড়া, মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে ষাঁড়, দক্ষিণ ইউরোপের সমতল স্থানে গাধা, পার্বত্য অঞ্চলে অশ্বতর, মরুভূমিতে উট, মধ্য এশিয়ায় বা হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে ইয়াক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হাতি, আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চলে লামা মেরু অঞ্চলে বল্গাহরিণ ও কুকুর প্রভৃতি জন্তু ভারবাহী জন্তু হিসাবে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কোন কোন স্থলে জন্তুর পিঠে মাল বা মানুষ বাহিত হয়, আবার উহাদের সাহায্যে গাড়ী টানা হয়। মানুষ বা পশুর সাহায্যে চলাচল কিছুটা ব্যয়সাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ।

মোটরগাড়ীও বর্তমানে পরিবহণে বিশেষ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যেখানে লোকের চলাচল উপযোগী পাকা বা কাঁচা রাস্তা আছে সেখানেই শুধু মোটর চলিতে পারে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ১ কোটি মাইল মোটর চলার উপযোগী রাস্তা আছে। ইহাতে দ্রুত মাল বা যাত্রী চলাচল করিতে পারে এবং ব্যয়ও মানুষ বা পশু পরিবহণ অপেক্ষা কম। মোটর চলাচল ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ। সেখানে প্রতি ৪ জন ব্যক্তির একখানা করিয়া মোটর আছে। ইহার পর গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া ইতালি প্রভৃতি দেশেও মোটর চলাচল ব্যবস্থা উন্নত। ভারতও ইদানিং এদিকে বিশেষ অগ্রসর হইতেছে। তবে বর্তমানে গড়ে ১৫০০ লোকের একখানা করিয়া মোটর গাড়ী আছে। অনেক সহরাঞ্চলে মোটর বাস ছাড়া, ট্রামগাড়ীর প্রচলনও দেখিতে পাওয়া যায়। ট্রামগাড়ী চলাচলে কলিকাতা নগরী প্রসিদ্ধ।

রেলপথও পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহাতে বহুল পরিমাণে ভারী জিনিস ও বহু লোকজন একযোগে বহু দূরবর্তী স্থানে স্বল্পব্যয়ে চলাচল করিতে পারে। তবে ইহার জন্য রেল লাইন চাই। শুধু রাস্তায় মোটরের মত ইহা চলাচল করিতে পারে না। রেলপথ নির্মাণ ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশী। রেলপথের উন্নতিও যুক্তরাষ্ট্রেই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়—মোট রেলপথের প্রায় ⅓ অংশ। ইউরোপেও রেলপথ বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছে। আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকা এ বিষয়ে অনেক পিছনে।

এশিয়ার বিরল বসতিপূর্ণ পশ্চিমাঞ্চলে রেলপথ বিশেষ বিস্তারলাভ করে নাই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারত, জাপান ও চীন ছাড়া ঘনবসতিপূর্ণ অন্যত্র এখনও রেলপথ বিশেষ বিস্তার লাভ করে নাই।

জলপথের নদী, খাল, হ্রদ প্রভৃতিতে ষ্টিমার ও নৌকা চলাচলের প্রধান বাহন। কিন্তু সমুদ্রপথে জাহাজই প্রধান যান। দেশের অভ্যন্তর ছাড়া জলপথে বিভিন্ন দেশের সহিত জাহাজে করিয়া অনেকদিন হইতে পণ্য ও যাত্রী বহন হইয়া আসিতেছে। ইদানিংকালে ইহা সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা মোটর বা রেল অপেক্ষা ধীরগামী হইলেও ইহাতে পরিবহণ ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম।

আকাশপথ বর্তমান যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আকাশপথে বিমানে সর্বাপেক্ষা অল্প সময়ে যাতায়াত চলে। তবে ইহাতে ব্যয় বেশ কিছু বেশী। ধনী ব্যক্তি বা মূল্যবান জিনিস ভিন্ন ইহাতে চলাচল এখনও ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে নাই। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষা ও দেশরক্ষা ব্যাপারেও বিমান বিশেষ কার্য্যকরী।

Q. 3. Discuss the comparative merits of land, marine and air routes. Mention the goods suitable for each.

(স্থলপথ, সমুদ্রপথ ও আকাশপথের মধ্যে তুলনামূলক সুবিধাগুলি আলোচনা কর। প্রত্যেক পথে যে সমস্ত জিনিস চলাচলের উপযুক্ত উল্লেখ কর।)

Ans : See to Ans. of Q. 2.

Q. 4. Discuss the geographical and economic conditions suitable for the development of railways.

(রেলের উন্নতির জন্য যে ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা উপযুক্ত তাহা আলোচনা কর।

Ans : বর্তমান যুগে স্থলপথে পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে রেলপথই সমধিক প্রসিদ্ধ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রেলপথ বিস্তার লাভ করিলেও ইহা সকল স্থানে সমভাবে বণ্টিত হইতে পারে নাই। এজন্য ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাই অনেকাংশে দায়ী। কারণ রেলপথ বিস্তারের জন্য কতকগুলি অনুকূল ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রয়োজন। নিম্নে উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল:

(১) ভূ-প্রকৃতি: রেলপথ স্থাপনের পক্ষে সমতলভূমি বা নদী উপত্যকাই অনুকূল ভূপ্রকৃতি। এখানে সহজে রেলপথ নির্মিত হইতে পারে। এজন্য ভারতের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা গাঙ্গেয় সমতলভূমিতেই রেলপথের বিস্তার বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। সমভূমি আবার নদীবহুল হইলে বহু অর্থব্যয়ে পুল নির্মাণ করিতে হয়। আবার নদীর ভাঙ্গা গড়া কার্যের জন্য পুলও অনেক ক্ষেত্রে ধ্বসিয়া পড়িয়া যায়। এজন্য নদীবহুল পূর্ব পাকিস্তানে রেলপথ বিশেষ বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। আবার পার্বত্য অঞ্চল দুর্গম, উঁচু-নীচু ও কঠিন শিলা গঠিত বলিয়া রেলপথ নির্মাণ কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল। এজন্য ভারতের হিমালয় বা আসামের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে, তিব্বত, আফগানিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে রেলপথ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। পার্বত্য অঞ্চলে অত্যধিক ব্যয়ে রেলপথ নির্মিত হইলে সে অঞ্চলের রেলভাড়াও স্বাভাবিকভাবে বেশী ধার্য্য হয়। কানাডার রকি পর্বতের কিকিংহর্সপাসের রেলপথের ভাড়া উহার সমভূমি অঞ্চলের রেলপথের ভাড়ার তিনগুণ। আমাদের দেশে দার্জিলিং, সিমলা, উতকামাণ্ড প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলের রেলভাড়া অপেক্ষাকৃত বেশী। বদ্বীপ অঞ্চলেও অত্যধিক নদী নালা ও নরম মাটির জন্য রেল নির্মাণ সুবিধাজনক নহে। সুতরাং ভূপ্রকৃতির দিক দিয়া বিচার করিলে অপেক্ষাকৃত শক্ত মাটি ও বিরল নদীনালাযুক্ত সমভূমিই রেলপথ নির্মাণের সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক স্থান।

জলবায়ু: নাতিশীতোষ্ণ স্বল্পবারিপাতযুক্ত জলবায়ু রেলপথ নির্মাণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। অত্যধিক শীতল বরফাবৃত স্থানে, নিবিড় বন জঙ্গল ও অত্যধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত স্থানে ও মেরু অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ ও পরিচালন ব্যয় অত্যধিক ব্যয়সাধ্য ও কষ্টসাধ্য। তুষারাবৃত স্থানে বরফ জমিয়া রেলপথ অকেজো করিয়া ফেলে। মরুভূমির বালুঝড়ও রেলপথকে অকেজো করে। এজন্য কানাডা ও রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলে, গ্রীণল্যাণ্ডে, আরব ও সাহারার মরুভূমিতে, নিরক্ষীয় অস্বাস্থ্যকর বনভূমি অঞ্চলে প্রতিকূল জলবায়ুর জন্য রেলপথ নির্মাণ সম্ভব হইতেছে না।

(৩) অর্থনৈতিক কারণ: উপরিউক্ত ভৌগোলিক কারণ ছাড়া অর্থনৈতিক কারণও রেলপথ নির্মাণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। রেলপথ স্থাপন

ও উহা পরিচালন ব্যয় মোটেই কম নয়। সুতরাং যে সমস্ত স্থানে যাত্রী ও মাল বহনের আয় হইতে রেলপথ স্থাপনের মূলধনীয় ব্যয়ের উপর সুদ ও পরিচালন ব্যয় নির্বাহের জন্য উপযুক্ত আয় না হয় সেস্থানে রেলপথ স্থাপন লাভজনক হয় না। ফলে রেলপথ নির্মাণ ও বিস্তার লাভ করিতে পারে না। দেশরক্ষা বা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য রেলপথ নির্মিত হইতে পারে, কিন্তু এজন্য সরকারকেই প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হয়। এরূপ ব্যয় করিবার ক্ষমতা সরকারের না থাকিলে রেলপথ নির্মাণ হইতে পারে না। সুতরাং জনবহুল সমৃদ্ধ অঞ্চলেই রেলপথ নির্মাণ সহজসাধ্য। কোন কোন বিরল বসতিপূর্ণ অঞ্চলে বিশেষ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য রেলপথ নির্মিত হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণ ও হীরক খনি অঞ্চল, অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্ণখনি অঞ্চল, চিলির নাইট্রেট খনি অঞ্চল প্রভৃতি উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অনুকূল অর্থনৈতিক কারণবশত উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে রেলপথ যথেষ্ট বিস্তারলাভ করিয়াছে। ভারত, চীন, জাপান ছাড়া প্রতিকূল অর্থনৈতিক পরিবেশের জন্য এসিয়া মহাদেশের অন্যান্য স্থানে রেলপথ বিশেষ বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। পৃথিবীর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশী রেলপথ—২ লক্ষ ২৫ হাজার মাইল। রাশিয়া ও কানাডার স্থান ইহার পরে। আয়তনের তুলনায় ভারতে রেলপথ খুব বেশী নয়—প্রায় ৩৬ হাজার মাইল।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থার জন্য রেলপথের গেজ (Gauge) বিভিন্ন হয়। দুইটি লাইনের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্বকে 'গেজ' বলে। এইভাবে রেলপথকে ব্রড গেজ (৫' ৬"), ষ্টাণ্ডার্ড গেজ (৪' ৮½'), মিটার গেজ (৩' ৬"); ন্যারো গেজ (২' ৬) প্রভৃতি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। পার্বত্য অঞ্চলে ন্যারো গেজ, সমভূমিতে ব্রড বা ষ্টাণ্ডার্ড গেজের রেলপথ দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও দেশের বিভিন্ন গেজের রেলপথ থাকিলে সরাসরি মাল চলাচলে অসুবিধা হয় এবং মাল উঠা-নামান ব্যয় বেশী পড়ে এবং বার বার মাল ও যাত্রী উঠা-নামা করিতে গেলে মালের ক্ষতি হয় এবং যাত্রীদেরও হয়রানি হইতে হয়।

Q. 5. Describe some of the Trans Continental Railways of the world

(কয়েকটি মহাদেশ-অতিক্রমী রেলপথ বর্ণনা কর।)

Ans: নিম্নে কয়েকটি প্রধান মহাদেশ-অতিক্রমী রেলপথের বর্ণনা দেওয়া হইল।

ইউরেশিয়া

১। **ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ:** ইহা পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ। লম্বায় ৫৫০০ মাইল। লেনিনগ্রাড হইতে ব্লাডিভষ্টক পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা লেনিনগ্রাড হইতে মস্কো হইয়া ইউরাল পর্বত পার হইয়া শিল্প প্রধান নগর কুইবিশেভ, তৈল-কেন্দ্র উফা ও অন্যান্য শিল্প প্রধান সহর সার্ভলোভস্ক ওমস্ক, নভোসাইবিরস্ক কুসবাস কয়লাখনি, ওবি ও ইনেসি নদী অতিক্রম করিয়া বৈকাল হ্রদের ইরকুটস্ক ও পরে চিটা হইয়া আমুর অববাহিকা ধরিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে ব্লাডিভষ্টক পৌঁছিয়াছে। ইহার এক শাখা এখান হইতে হারবিন ও মুকডেন হইয়া পিকিং গিয়াছে। মস্কো হইতে পশ্চিমদিকে ইহা বার্লিন ও অন্যান্য ইউরোপীয় সহরের সহিত সংযুক্ত। এই রেলপথ দিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যাইতে ৯ দিন সময় লাগে এবং দুইখানা গাড়ী পাশাপাশি যাইতে পারে। রাশিয়ার জারের রাজ্য শাসনের জন্য এবং নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের সুদূর পূর্বদিকে পাঠানোর জন্য নির্মিত হইলেও বর্তমানে ইহার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অসীম। ইহাতে প্রথমতঃ সাইবেরিয়ার কয়লা, কাঠ, পশুলোম, রাশিয়ার গম ও অন্যান্য শিল্পজাত ও খনিজ দ্রব্য রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া ইহা পশ্চিম ইউরোপের সহিত পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। লেনিনগ্রাড হইতে একবার মাত্র রেল বদলাইয়া ইহার সাহায্যে পিকিং যাওয়া যায়। চীনের ও রাশিয়ার মধ্যে রাজনৈতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগাযোগ সবাপেক্ষা বেশী। এজন্য অন্যদেশের কথা বাদ দিলেও এই রেলপথের জন্য উভয় দেশই বিশেষ উপকৃত। আবার সাইবেরিয়ার কৃষিশিল্পের ও লোক বসতির প্রসার এই রেলপথের জন্যই দ্রুত সম্ভব হইয়াছে।

২। **ট্রান্স-কাস্পিয়ান রেলপথ:** ইহা রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম রেলপথ এবং রাশিয়া ও মধ্য এশিয়ার মধ্যে সংযোগসূত্র। কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী ক্রাসনোভোডস্ক হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং তুর্কিস্থানের তুলা অঞ্চলের মধ্য দিয়া মার্ভ, সমরখন্দ ও বোখারো হইয়া তাসখন্দ পর্যন্ত গিয়াছে। তাসখন্দ হইতে ইহা আবার উত্তর দিকে আরব সাগরের পূর্বদিক দিয়া ওরেনবার্গ হইয়া কুইবিশেভে গিয়া ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথের সহিত যুক্ত হইয়াছে। মার্ভ হইতে ইহার একটি শাখা আফগান সীমান্তে কুসক পর্যন্ত গিয়াছে। কুসক হইতে পারস্য সীমান্তের জহিদান পর্যন্ত ৪০০ মাইল পথ রেলপথ দ্বারা যুক্ত হইলে এই রেলপথের সাহায্যে রাশিয়া হইতে ভারতে রেলপথে আসা যাইবে, কারণ জহিদানের সহিত পাকিস্তান হইয়া ভারতীয় রেলপথ সংযুক্ত। এই রেলপথ দিয়া কার্পাস তুলা, খনিজ তৈল, বীট চিনি, গম ও নানাবিধ শিল্প দ্রব্য আদান-প্রদান হইয়া থাকে।

৩। **ট্রান্স ককেশীয় রেলপথ:** এই রেলপথ রাশিয়ার মস্কো হইতে কুর্স্ক ও খারকোভ হইয়া দক্ষিণে কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত তৈলকেন্দ্র বাকু পর্যন্ত গিয়াছে। ইহার এক শাখা বাকু হইতে কৃষ্ণ সাগরের তীরে বাটুম পর্যন্ত গিয়াছে। বাকু অঞ্চলের খনিজ তৈল, লৌহ, কয়লা, কাস্পিয়ান সাগরের মৎস্য প্রভৃতি এই রেলপথ দিয়া প্রধানতঃ চালান হয়।

৪। **ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেস:** ইহা ঠিক একটি মাত্র রেলপথ নহে। কতকগুলি রেলপথের সমষ্টি। ইহাদের সাহায্যে প্যারী হইতে মিউনিক, ভিয়েনা, বুদাপেস্ত, বেলগ্রেড প্রভৃতি সহর দিয়া তুরস্কের ইস্তাবুল পর্যন্ত যাতায়াত করা যায়। ইহা প্রায় ২০০০ মাইল দীর্ঘ। ভবিষ্যতে পারস্য উপসাগরের তীরে বসরা পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইহা বাগদাদ রেলের সহিত সংযুক্ত। এজন্য ইহার সাহায্যে ইউরোপ হইতে আরবের মক্কা পর্যন্ত যাতায়াত করা চলে। নানা প্রকার খনিজ, শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্য এই পথে আদান-প্রদান হইয়া থাকে।

উত্তর আমেরিকা (কানাডা):

কানাডায় নিম্নলিখিত দুইটি মহাদেশ-অতিক্রমী রেলপথ বর্তমান:

৫। **ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথ:** এই রেলপথ প্রশান্ত মহাসাগরের তীর হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫০০ মাইল। ইহা প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত ভাঙ্কুবার বন্দর হইতে আরম্ভ হইয়া ফ্রেজার ও থমসন নদীর উপত্যকার উপর দিয়া কিকিংহস গিরিপথ, মেডিসিন হাট ও রেজিনা হইয়া উইনিপেগ সহরে পৌছিয়াছে। ইহার অপর একশাখা ক্রোনেষ্ট গিরিপথ দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। গিরিপথের সুউচ্চ রকি পর্বতের অংশ বিভিন্ন অরণ্য ও খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ। তথা হইতে যখন ইহা সমভূমিতে নামিয়াছে সেখানে এই রেলপথ প্রেয়ারি প্রান্তর, আলবার্টার খনিজ তৈল ও বাসস্থি গম ক্ষেত্র, ম্যানিটোবা ও সাসকাচুয়ানের গম ক্ষেত্র প্রভৃতির মধ্য দিয়া বৃহত্তম গমের বাজার উইনিপেগ সহরে আসিয়াছে। উইনিপেগে কানাডিয়ান ন্যাশন্যাল রেলপথের সহিতও ইহা মিলিত হইয়াছে। এখান হইতে রেলপথটি হ্রদ অঞ্চলের উত্তর দিক দিয়া ফোর্ট উইলিয়াম, পোর্ট আর্থার, অটোয়া, মণ্ট্রিল হইয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীরে বরফমুক্ত হ্যালিফাক্স বন্দর পর্যন্ত গিয়াছে। মণ্ট্রিল হইতে এক শাখা কুউবেক পর্যন্ত গিয়া কানাডিয়ান-ন্যাশনাল রেলপথের সহিত মিশিয়াছে। এ অঞ্চলে ইহা অণ্টারিওর নিকেল, এ্যাসবেস্টস্ ও কোবাল্ট খনি, কাষ্ঠমণ্ড ও লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অঞ্চলের মধ্য দিয়া গিয়াছে। নোভাস্কোসিয়ার খনিজ সম্পদও এ রেলপথের আয়ত্তের মধ্যে। হ্যালিফাক্স বন্দর গম রপ্তানির জন্য প্রসিদ্ধ

ইহা ছাড়া মৎস্য, কাঠ ও হ্রদ অঞ্চলের শিল্পজাত দ্রব্যাদিও এই বন্দর দিয়া রপ্তানি হয়। লিভারপুল হইতে চীন ও জাপানে যাইতে এই রেলপথে গেলে ১২০০ মাইল দূরত্ব কম হয়।

৬। **কানাডিয়ান ন্যাশনাল রেলপথ :** এই রেলপথ কানাডার প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে প্রিন্স রুপার্ট হইতে আরম্ভ হইয়া ভাঙ্কুবার হইয়া ফ্রেজার ও ও থমসন নদীর উপত্যকা ধরিয়া ইয়োলোহেড গিরিপথ অতিক্রম করিয়া এডমণ্টনে আসিয়াছে। তথা হইতে উইনিপেগে আসিয়া কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই পথে ইহা প্রধানতঃ সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্যভূমির মধ্য দিয়া গিয়াছে। উইনিপেগের পর ইহা ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথের উত্তর দিয়া গম ক্ষেত্র, খনিজ অঞ্চল ও কাষ্ঠ অঞ্চল দিয়া কুইবেকে আসিয়াছে। তথা হইতে ইহার একটি শাখা হ্যালিফাক্স বন্দরে গিয়াছে। এই রেলপথেও খনিজদ্রব্য কাষ্ঠমণ্ড, মৎস্য, গম, শিল্পজাত প্রভৃতি দ্রব্য বাহিত হয়। নূতন উপনিবেশ স্থাপন ও প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য সরকার কর্তৃক ইহা বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০০ মাইল। কানাডার আয়তনের তুলনায় রেলপথ মোটেই পর্যাপ্ত নহে। তবে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথের পরেই ইহাদের স্থান। এই রেলপথ দুইটি হাডসন বে রেলপথের সহিত যুক্ত। 'হাডসন বে রেলপথ, উইনিপেগ হইতে পোর্ট চার্চিল পর্যান্ত গিয়াছে। উত্তর দিক দিয়া জিনিস আমদানি-রপ্তানি ব্যাপারে ইহা গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ।

কানাডার আর্থিক উন্নতিতে রেলপথগুলি বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অন্যান্য দেশে সাধারণতঃ আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রেলপথের নির্মাণ ও প্রসার আরম্ভ হয়। কিন্তু কানাডাতে রেলপথের নির্মাণ কার্য্যই প্রথমে আরম্ভ হয়। পরে এই রেলপথ আর্থিক উন্নতি বিধানে যথেষ্ট সহায়তা করে।

ইউরোপ হইতে প্রথমতঃ লোক আসিয়া পূর্ব উপকূলে বসবাস করিতে থাকে। তৎকালের কানাডার যাহা কিছু উন্নতি সবই পূর্ব উপকূলে সীমাবদ্ধ থাকে। জলবায়ু ও যাতায়াতের প্রতিকূল অবস্থা বিদ্যমান থাকায় মধ্য ও পশ্চিম উপকূলের প্রদেশগুলির সহিত কোন যোগাযোগই ছিল না। ফলে মধ্য ও পশ্চিমের দেশগুলির উন্নতি স্থগিত থাকে। ক্রমে ক্রমে উক্ত অঞ্চলের সহিত যোগ সাধন করার উদ্দেশ্যে রেলপথ নির্মিত হইতে থাকে। রেলপথের পশ্চিমমুখী প্রসারের ফলে এতদঅঞ্চলে ক্রমশঃ লোকসংখ্যা, গমের চাষ, খনিজ দ্রব্য আহরণ ও শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

শীতকালে কানাডায় জলপথ বরফাবৃত হইয়া পড়ে বলিয়া অভ্যন্তরস্থ ও পশ্চিমের

দেশগুলির ব্যবসা-বাণিজ্য রেলপথের উপর নির্ভর করে। বিদেশে মাল প্রেরণের জন্যও রেলপথগুলি বিশেষ কার্য্যকরী। কালক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত এইভাবে রেলপথের দ্বারা যোগসাধন হওয়ায় কানাডার নানাবিধ শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যিক উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। রেলপথ নির্মাণের দ্বারা এইভাবে পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সহিত যোগসাধন না হইলে কানাডার আর্থিক উন্নতি এতদূর প্রসারলাভ করিত কিনা সন্দেহ। রেলপথের কল্যাণে এবংবিধ উন্নতি সম্ভব হওয়ায় কানাডাকে **রেলপথের অবদান** (Canada is the making of railways) বলা হয়।

উত্তর আমেরিকা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ঃ

রেলপথ বিস্তার এই দেশেই সর্বাধিক। এই দেশের সকল অংশই রেলপথ দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। তবে এই সমস্ত রেলপথগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি মহাদেশ অতিক্রমী রেলপথ হিসাবে খ্যাত। ইহারা পূর্বদিকের উপকূল হইতে পশ্চিমদিকের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিয়া উভয় অঞ্চলের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে।

১। **নদার্ণ প্যাসিফিক রেলপথ** ঃ এই রেলপথ পূর্বদিকের নিউইয়র্ক হইতে পশ্চিমদিকের সিটল পর্য্যন্ত প্রসারিত। ইহা নিউইয়র্ক হইতে মক ও হডসন নদীর উপত্যকা দিয়া এ্যাপেলেশিয়ান পর্বত পার হইয়া চিকাগো, সেণ্টপল, বিসমার্ক, হেলেনা প্রভৃতি সহর হইয়া পশ্চিমে সিটল পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহার মূল ষ্টেশন মধ্যবর্তী অঞ্চলের সেণ্টপল। এই রেলপথ বিভিন্ন দিকেও জালের মত অন্যান্য সহরের সহিত সংযুক্ত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০০ মাইল।

এই রেলপথটির গুরুত্ব অসীম। পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে যাইতে ইহা বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের সম্মুখীন হয়। নিম্নে উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

(ক) প্রথমতঃ ইহা পূর্ব উপকূলের সমভূমি, মক-হাডসন নদী উপত্যকা, এ্যাপেলেশিয়ান পর্বতমালা, বৃহৎ হ্রদ অঞ্চল, প্রেইরি অঞ্চল, রকির মালভূমি ও পার্বত্য অঞ্চল এবং পশ্চিমের নদী উপত্যকা প্রভৃতি নানাপ্রকার ভূপ্রকৃতির উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

(খ) পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত বিভিন্ন ভূ-প্রকৃতির সম্মুখীন হইলেও ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ুর বৈচিত্র্যও কম নয়। ইহার উপকূল অংশে চৈনিক জলবায়ু দৃষ্ট হয়। ইহার এ্যাপোলেশিয়ান পার্বত্য অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত শীতল জলবায়ু। মধ্যভাগে মহাদেশীয় জলবায়ু এবং উহার অপেক্ষাকৃত পশ্চিমে মরুপ্রকৃতির জলবায়ু, রকি পার্বত্য অঞ্চলে শীতল জলবায়ু এবং পশ্চিম উপকূলে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর কিছুটা পাওয়া যায়।

(গ) জলবায়ুর ও ভূ-প্রকৃতির পার্থক্য হেতু স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও কৃষিজাত দ্রব্যাদিরও বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব উপকূলের মিশ্রকৃষি, এ্যাপলেশিয়ান অঞ্চলের অরণ্য, মধ্য ভাগের ভুটা ও গম, ইহার অপেক্ষাকৃত পশ্চিমের প্রেইরি তৃণভূমি অঞ্চলের পশুচারণ, রকির পার্বত্য ও মালভূমি অঞ্চলের অরণ্য এবং পশ্চিমের নদী উপত্যকার কৃষি এবং সমুদ্রে ও নদী মোহনায় মৎস্য আহরণ প্রভৃতি ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য।

(ঘ) ইহার বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন প্রকার খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ। ইহার মধ্যে পূর্বাঞ্চলে লৌহ, কয়লা, খনিজ তৈল ও জলবিদ্যুৎ এবং পশ্চিমাঞ্চলে সোনা, রূপা, সীসা, দস্তা উৎপাদন প্রভৃতি সমধিক উল্লেখযোগ্য।

(ঙ) উপরিউক্ত অবস্থাগুলির জন্য এ অঞ্চল কৃষি ও শিল্পে বিশেষ সমৃদ্ধ। শিল্পের মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, যন্ত্রপাতি, মাংস সংরক্ষণ, কাগজ, জাহাজ নির্মাণ শিল্প প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এ অঞ্চলে ক্লিভল্যাণ্ড, ডেট্রয়েট, গ্যারি, চিকাগো, মিলওয়াকি প্রভৃতি বড় বড় শিল্পকেন্দ্রগুলিও অবস্থিত। এই রেলপথের সাহায্যে বিভিন্ন পণ্য আমদানি রপ্তানির সুযোগ-সুবিধা থাকায় ইহার অর্থনৈতিক উন্নতি সহজসাধ্য হইয়াছে।

ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেলপথ : ইহার প্রধান পথ নিউইয়র্ক হইতে চিকাগো, ওমাহা, অগডেন প্রভৃতি সহর দিয়া লবণ হ্রদ পার হইয়া সানফ্রান্সিসকো পর্যন্ত গিয়াছে। ইহাও উত্তরে ও দক্ষিণে বিভিন্ন সহরের সহিত সংযুক্ত এবং মধ্যপথে পূর্ব হইতে পশ্চিম যাওয়ার প্রধান পথ। ইহার দৈর্ঘ্যও ২০০০ মাইলের উপরে। এই রেলপথের দুই পার্শ্বে বিভিন্ন কৃষিজ ও খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ। এই সমস্ত সম্পদ রেলপথে বাহিত হইয়া অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক হইয়াছে।

৯। **সাদার্ণ প্যাসিফিক রেলপথ :** এই রেলপথ নিউইয়র্ক হইতে ওয়াশিংটন, আটলান্টা প্রভৃতি হইয়া নিউঅর্লিয়েন্স গিয়াছে। তথা হইতে মিসিসিপি অববাহিকা ধরিয়া উত্তর দিকে সেণ্টলুইস গিয়া কানসাস সিটি, শাস্তাফে প্রভৃতি হইয়া লস এঞ্জেলস্ গিয়াছে। তথায় ইহা অবশ্য উত্তর দিকে সানফ্রান্সিস্কো, পোর্টল্যাণ্ড, সিটল প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত। দক্ষিণ দিকেও ইহার শাখা প্রসারিত। এই রেলপথের উভয়দিকও বিভিন্ন কৃষিজ ও খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ।

দক্ষিণ আমেরিকা

১০। **চিলি-আর্জেণ্টাইন রেলপথ :** ইহাই দক্ষিণ আমেরিকার একমাত্র মহাদেশ অতিক্রমী রেলপথ। ইহা দৈর্ঘ্য প্রায় ৯০০ মাইল : ইহা আর্জেন্টিনার

রাজধানী বুয়েনস এয়ার্স হইতে রোজারিও, মেণ্ডোজা প্রভৃতি হইয়া ১০,০০০ ফুটের উপর উচ্চ উসপল্লতা গিরিপথ দিয়া আন্দিজ অতিক্রম করিয়া চিলির ভলথারাইসো পর্যন্ত বিস্তৃত। চিলির ও আর্জেন্টিনার কৃষিজ, খনিজ ও প্রাণীজ সম্পদ পরিবহণে এই রেলপথ বিশেষ প্রয়োজনীয়। আর্জেন্টিনার গম, বীট, চিলির নাইট্রেট্, তামা



প্রভৃতি ইহার উল্লেখযোগ্য পরিবহণ সামগ্রী। তবে ইহা আন্দিজ অঞ্চলে মিটার গেজ এবং সমভূমিতে প্রশস্ত গেজে নির্মিত বলিয়া সরাসরি মাল চলাচলের পক্ষে অসুবিধাজনক।

আফ্রিকা

১১। **কেপ-কাইরো পথ**ঃ আফিকার দক্ষিণ হইতে উত্তরে আসিবার ইহাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য সোজা পথ। এই পথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৯০০০ মাইল। ইহা রেলপথ, স্থলপথ ও জলপথের সমষ্টি। এ পথে কেপটাউন হইতে বুলওয়েও লিভিংষ্টোন, প্রিটোরিয়া ও এলিজাবেথভিল হইয়া বেলজিয়ান কঙ্গোর শেষ সীমা পর্যন্ত রেলপথে যাওয়া যায়। এলিজাবেথভিল হইতে নদীপথে ও স্থলপথে ভিক্টোরিয়া হ্রদ পর্যন্ত যাওয়া চলে। তাহার পর মোটর যোগে নাইল গর্জ (Nile Gorge) পর্যন্ত যাওয়া চলে। নাইল গর্জ হইতে খার্টুম পর্য্যন্ত ষ্টিমারে যাওয়া যায়। খার্টুম হইতে ওয়াদি হাইফা পর্য্যন্ত রেলপথ আছে। সেখান হইতে নদীপথে পুনরায় সেলাল যাইতে হয়। সেখান হইতে রেলপথে আবার কাইরো পর্য্যন্ত যাওয়া চলে। দক্ষিণ আফ্রিকার খনিজ সম্পদ, মধ্য আফ্রিকার খনিজ ও বনজ সম্পদ, সুদান ও মিশরের কৃষি সম্পদ এই পথে বাহিত হইয়া থাকে।

অষ্ট্রেলিয়া

১২। **ট্রান্স-অষ্ট্রেলিয়ান রেলপথঃ** এই রেলপথ পূর্ব দিকের সিডনি হইতে মেলবোর্ণ, এডিলেড, পোর্ট আগাষ্টা কালগুর্লি ও কুলগার্ডি হইয়া পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার পার্থ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সিডনি হ'তে ইহার এক শাখা উত্তরে ব্রিসবেন, রকহাম্পটন হইয়া ক্লনকারী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার কালগুর্লি ও কুলগার্ডি স্বর্ণখনির জন্য প্রসিদ্ধ। দক্ষিণে পোর্ট আগাষ্টা হইতে এক শাখা মধ্যভাগে এলিস্ স্প্রিং পর্য্যন্ত গিয়াছে। উক্ত রেলপথ দ্বারাই প্রধানতঃ অষ্ট্রেলিয়ার কৃষিজ, প্রাণীজ ও খনিজ সম্পদ বিভিন্ন দেশে রপ্তানির জন্য বিভিন্ন বন্দরে প্রেরিত হয়।

Q 6 Describe any two Trans-continental railway routes of the world **(C.U. Pre-1961)**

(পৃথিবীর যে কোন দুইটি মহাদেশ অতিক্রান্ত রেলপথের বর্ণনা দাও।)

Ans. Q 5 এর উত্তরের যে কোন দুইটি লিখ।

Q 7. Describe a trans-continental railway route across United states and explain the differences in natural productions.

(যুক্তরাষ্ট্রের একটি মহাদেশ অতিক্রান্ত রেলপথ বর্ণনা কর এবং উক্ত পথের স্বাভাবিক উৎপন্ন দ্রব্যের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।)

Ans. Q 5এর ৭নং (নর্দার্ণ প্যাসিফিক রেলপথ) লিখ।

Q. 8. Discuss the factors which have influenced the development of Railway routes in India Also state the principal Railway systems now in operation in India. **(C.U. Inter, 1954)**

(ভারতের রেলপথের উন্নতিতে যে সকল বিষয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার আলোচনা কর। বর্তমানে ভারতের যে বিভিন্ন প্রকার রেলপথ আছে তাহাও উল্লেখ কর।)

Ans ভারতের রেলপথের উন্নতিতে ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব কার্য্যকরী। ভৌগোলিক দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে উত্তর ভারতের সমভূমি ও উপকূলের সমভূমি রেলপথ নির্মাণের পক্ষে অধিক সুবিধাজনক। এ অঞ্চলের জলবায়ু ও রেলপথ নির্মাণের পক্ষে প্রতিবন্ধক নহে। এজন্য এই সমস্ত অঞ্চলেই রেলপথ অধিক বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং উন্নতি লাভ করিয়াছে। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল বা দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ অসুবিধাজনক।

এজন্য ঐ সমস্ত অঞ্চলে রেলপথ বেশী বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। অর্থ নৈতিক দিক দিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। উত্তর ভারত ও সমভূমি অঞ্চল এ বিষয়ে অগ্রণী ইহা ছাড়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল খনিজ ও বনজ সম্পদে পরিপূর্ণ। শিল্পের উপযোগী কাঁচা মালেরও অভাব নাই। এজন্য নানাপ্রকার শিল্প উন্নতি লাভ করিতেছে। দেশটির আয়তনও নেহাৎ কম নয়। এজন্য বিভিন্ন অঞ্চলে মাল ও লোক চলাচলের সুবিধার জন্য রেলপথ নির্মাণের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। রাজনৈতিক কারণও রেলপথ বিস্তারে কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত দ্রুত সৈন্য ও রসদ চলাচলের জন্য রেলপথের বিস্তার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এইভাবে বিভিন্ন বিষয়গুলি ভারতের রেলপথ বিস্তারে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বর্তমানে ভারতে প্রায় ৩৬ হাজার মাইল রেলপথ আছে। ভারতের মত বিশাল ও ঘনবসতিপূর্ণ দেশের পক্ষে এই রেলপথ প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। পরিবহণের অপ্রাচুর্য্যের জন্য মাল চলাচল যে ঠিকমত হইতেছে না উহা আমরা নিত্যই দেখিতে পাইতেছি। রেলে চলাচল ব্যাপারে যে লোকের ভিড় সহ্য করিতে হয় উহাও কম বেদনাদায়ক নহে। ভারতের রেলপথ যুক্তরাষ্ট্র, কানাড়া প্রভৃতি উন্নত দেশগুলির তুলনায় খুব কম। সুতরাং দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য আরও অধিক রেলপথ বিস্তার আশু প্রয়োজন। ইহা ছাড়া রেলগাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধিও প্রয়োজন।

বর্তমানে ভারতে নিম্নলিখিত ৮টি আঞ্চলিক ভিত্তিতে রেলপথগুলি পুনর্গঠিত :

(১) উত্তর রেলপথ (Northern Railway): ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৩৩৪ মাইল। ইহার সদর কার্য্যালয় দিল্লীতে অবস্থিত। এই রেলপথ পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লী, উত্তর ও পূর্ব রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশের উত্তর ভাগ দিয়া পূর্ব দিকে বারাণসী পর্য্যন্ত প্রসারিত। উপরি উক্ত অঞ্চলের কার্পাস, চিনি, গম, জোয়ার, বাজরা, পশম, তৈলবীজ, লবণ পশুচর্ম এবং কার্পাস, কাচ, চর্ম, ইক্ষু প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য এই রেলপথ দ্বারা বাহিত হয়। সুতরাং এতদঞ্চলের শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে কার্পাস, পশম, চর্ম, কাচ, খেলার সরঞ্জাম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পাঞ্জাবের অমৃতসর, লুধিয়ানা, দিল্লী, উত্তর প্রদেশের কানপুর, আগ্রা প্রভৃতি এই রেলপথের উপর অবস্থিত উল্লেখযোগ্য স্থান।

(২). উত্তর-পূর্ব রেলপথ (North-Eastern Railway): ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০৬০ মাইল। ইহার সদর কার্য্যালয় গোরক্ষপুরে অবস্থিত। এই রেলপথ উত্তর প্রদেশের এবং বিহারের উত্তরভাগ দিয়া বিস্তৃত। ইক্ষু, তামাক, চা, পাট,

খনিজ তৈল, বেত, কমলা, আনারস, চূন, সিমেন্ট, কয়লা, কাঠ, ধান প্র তি এই রেলপথ দ্বারা বাহিত হয়। এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ ও বারাণসীতে ইহা উত্তর রেলপথের সহিত যুক্ত। উত্তর প্রদেশের শর্করা, কার্পাস, বিহারের পাট, শর্করা প্রভৃতি শিল্পাঞ্চল এই রেলপথের উপর নির্ভর করে। লক্ষ্ণৌ, গোরক্ষপুর প্রভৃতি এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শিল্পপ্রধান শহর।

(৩) **উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ (North East Frontier Raiwav):** ইহার দৈর্ঘ্য ১৭৩৮ মাইল। ইহার সদর কার্য্যালয় পাণ্ডুতে অবস্থিত। ইহা বিহারের সামান্য অংশ, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ ও আসামের মধ্য দিয়া বিস্তৃত। উক্ত অঞ্চলের পাট, চা খনিজ তৈল, কমলা, আনারস, ইক্ষু তামাক, ধান, বেত, চূন, সিমেন্ট, কয়লা কাঠ প্রভৃতি এই রেলপথ দ্বারা বাহিত হয়। উত্তরবঙ্গ ও আসামের চা এবং আসামের খনিজ তৈল, সিমেন্ট প্রভৃতি শিল্প ইহার দ্বারা উপকৃত। ইহা কাটিহারে উত্তর পূর্ব রেলপথ এবং সাহেবগঞ্জে পূর্ব রেলপথের সহিত সংযুক্ত। এই রেলপথে আসাম হইতে মনিহারী ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব রেলপথ দিয়া কলিকাতা পর্য্যন্ত যাতায়াত ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আসাম হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত এই পথ আসাম লিঙ্ক (Assam Link) নামে পরিচিত। শিলিগুড়, আলিপুরদুয়ার, তেজপুর, জোড়হাট, লামডিং শিলচর প্রভৃতি এই রেলপথের উপর অবস্থিত।

(৪) **পূর্ব রেলপথ** (Eastern Railwav): ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৩২১ মাইল। ইহার সদর কার্য্যালয় কলিকাতা। ইহা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তর প্রদেশের কিয়দংশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত। কয়লা, লৌহ আকরিক, চাউল, পাট ইক্ষু, চা, তৈলবীজ প্রভৃতি এই রেলপথের প্রধান বাহিত পণ্য। পশ্চিমবঙ্গের লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, পাট, কার্পাস, রাসায়নিক দ্রব্য কাগজ রেলইঞ্জিন প্রভৃতি বিহারের কয়লা, লৌহ, ইক্ষু প্রভৃতি শিল্প এই রেলপথের দ্বারা উপকৃত। ইহা ভারতের উল্লেখযোগ্য শিল্পাঞ্চলের উপর দিয়া গিয়াছে। কলিকাতা, আসানসোল, মধুপুর, গয়া, মোগলসরাই এই রেলপথের উপর অবস্থিত।

(৫) **দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ** (South-Eastern Railway): ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৪২৪ মাইল। ইহার সদর কার্য্যালয় কলিকাতা। ইহা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রের কিয়দংশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত। ইহার প্রধান শাখা হাওড়া হইতে নাগপুর ও ওয়ালটেয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত। কয়লা, লৌহ, ইস্পাত, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, চুনাপাথর, চাউল পাট, কাঠ, লাক্ষা প্রভৃতি এই রেলপথের প্রধান পরিবহণ পণ্য। টাটা, রাউরকেলা ও ভিলাই লৌহ ইস্পাত, কাটনির সিমেন্ট,

মুরির অ্যালুমিনিয়াম, ঘাটশিলার তাম্র প্রভৃতি শিল্প এই রেলপথের দ্বারা উপকৃত। খড়্গপুর, ভুবনেশ্বর, পুরী, সম্বলপুর, বিশাখাপত্তনম, রায়পুর, নাগপুর, জব্বলপুর, বিলাসপুর, কাটনি, টাটা প্রভৃতি এই রেলপথের উল্লেখযোগ্য স্থান।



(৮) মধ্য রেলপথ (Central Railway): ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫২৯৬ মাইল। ইহারা সদর কার্যালয় বোম্বাইতে অবস্থিত। এই রেলপথ মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, মহীশূরের উত্তরাংশ, মহারাষ্ট্রের মধ্যাংশ ও মাদ্রাজের পশ্চিমাংশ দিয়া বিস্তৃত। কার্পাস, গম, চিনি, তৈলবীজ, জোয়ার, বাজরা, চামরা, ম্যাঙ্গানিজ, কাঠ প্রভৃতি এই রেলপথের

পরিবহণ পণ্য। কার্পাস সিমেণ্ট, চিনি, খনিজ, রাসায়নিক প্রভৃতি এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শিল্প ও ই রেলপথের দ্বারা উপকৃত। গোয়ালিয়র, ঝাঁসী, ভূপাল, বোম্বাই, পুনা রাইচুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য স্থান এই রেলপথের উপর অবস্থিত। ইহা দিল্লী ও এলাহাবাদে উত্তর রেলপথের সহিত নাগপুরে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের সহিত এবং পুনায় দক্ষিণ রেলপথের সহিত সংযুক্ত

(৭) **পশ্চিম রেলপথ** (Western Railway): ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০১৩ মাইল। ইহার সদর কার্য্যালয় বোম্বাইতে। গুজরাট, মহারাষ্ট্রের উত্তরাংশ, রাজস্থানের দক্ষিণাংশ এবং মধ্যপ্রদেশ দিয়া এই রেলপথ বিস্তৃত। কার্পাস, কার্পাসজাত দ্রব্য, লবণ চিনি খনিজ ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি এই রেলপথের পরিবহণ পণ্য। বোম্বাই ও আমেদাবাদের কার্পাস, লবণ, রাসায়নিক দ্রব্য চিনি প্রভৃতি এবং রাজস্থানের খনিজ দ্রব্য এই রেলপথের উল্লেখযোগ্য শিল্প। আমেদাবাদ, কান্দলা, রাজকোট, বরোদা, সুরাট, আজমীঢ, কোটা প্রভৃতি এই রেলপথের উল্লেখযোগ্য স্থান।

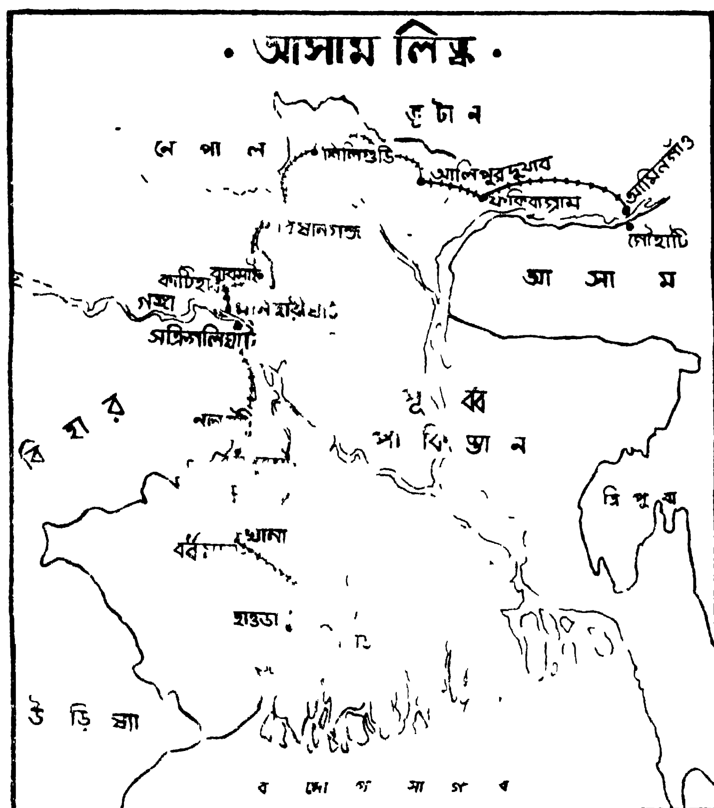
(৮) **দক্ষিণ রেলপথ** (Southern Railway): ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬ ০০ মাইল। ইহার সদর কার্য্যালয় মাদ্রাজে। এই রেলপথে চাউল, গম, কার্পাস, চীনাবাদাম, তৈলবীজ, লবণ, চিনি, তামাক, কাঠ, চা, কফি, মশলা, লৌহ ও ইস্পাত, স্বর্ণ, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ চামড়া প্রভৃতি পরিবাহিত হয়। এই রেলপথে মাদ্রাজের কার্পাস শিল্প, বাঙ্গালোরের বিমানপোত শিল্প, ভদ্রাবতীর লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাঙ্গালোর, বাঙ্গালোর কোজিকোড (কালিকট) কোচিন ত্রিবান্দ্রম, মাদুরা, পণ্ডিচেরী প্রভৃতি এই রেলপথের উল্লেখযোগ্য স্থান।

Q. 9 State how railway communication is maintained between Calcutta and Assam after the partition, Describe the route with its importance

(দেশ ভাগ হওয়ার পর কলিকাতা ও আসামের মধ্যে রেলপথের যোগাযোগ কিভাবে স্থাপন হইয়াছে উল্লেখ কর। গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়া ঐ পথের বর্ণনা দাও।)

Ans কলিকাতা ও আসামের মধ্যে বর্তমানে আসাম লিঙ্ক (Assam link) রেলপথ দ্বারা যোগাযোগ রক্ষিত হইতেছে। এই রেলপথ প্রথমতঃ কলিকাতা হইতে সাহেবগঞ্জ হইয়া সক্রিগলিঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অংশ পূর্ব রেলপথের অন্তর্গত। তথা হইতে ষ্টিমারে গঙ্গা পার হইয়া মনিহারীঘাট হইতে পুনরায় রেলপথ আরম্ভ হইয়াছে। তথা হইতে ইহা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের অংশ মনিহারীঘাট হইতে

কাটিহার, কিষণগঞ্জ প্রভৃতি হইয়া এই রেলপথ শিলিগুড়ি গিয়াছে। শিলিগুড়ি হইতে বাগরাকোট, মাদারীহাট, হাসিমারা, আলিপুরদুয়ার, ফকিরগ্রাম, রঙ্গিয়া, আমিনগাও প্রভৃতি হইয়া পাণ্ডু পর্যন্ত গিয়াছে। এই রেলপথ দিয়া এখন কলিকাতা হইতে গৌহাটী যাওয়া চলে। ইহার দূরত্ব প্রায় ৬৪০ মাইল। দেশ বিভাগ হওয়ার



পূর্বে সারাসরি এই রেলপথ ছিল না। তখন কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত রেলপথে এবং তথা হইতে ষ্টিমারে চাঁদপুর গিয়া পুনরায় রেলপথে যাইতে হইত। এই পথে কলিকাতা হইতে গৌহাটির দূরত্ব ছিল ৪৭০ মাইল। এই রেলপথের গুরুত্ব

বর্তমানে অসীম। কারণ দেশ বিভাগের পর আসামের সহিত ভারতের অন্যান্য অংশের সরাসরি রেলপথ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তখন পাকিস্তানের ভিতর দিয়া ছাড়া রেলপথে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ভিন্ন দেশের মধ্য দিয়া এইভাবে যাত্রী ও পণ্য চলাচল বহুভাবেই বিঘ্নিত হইত। উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি কুচবিহার প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলেও পাকিস্তানের মধ্য দিয়া যাইতে হইত। যে পথে এখন আসাম লিঙ্ক' রেলপথ তৈয়ারী হইয়াছে উহা হিমালয়ের পাদদেশের দুর্গম ও দুরতিক্রম্য স্থান। এরূপ স্থান দিয়া রেলপথ নির্মাণ যে সম্ভব হইয়াছে উহা ভারতীয়দের কৃতিত্বেরই পরিচয় দিতেছে। এই রেলপথ ভিন্ন আসামের ও উত্তর বঙ্গের চা ও অন্যান্য কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ কোনক্রমেই সুষ্ঠুভাবে পরিবহণ সম্ভব হইত না। ইহা এইভাবে অর্থনৈতিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়াছে। ইহা ছাড়া এই পথের রাজনৈতিক গুরুত্বও কম নহে। আসাম সীমান্তে প্রয়োজনের সময় সৈন্য ও রসদ চলাচলও এই রেলপথ ভিন্ন বিঘ্নিত হইত। তবে এই পথের কতকগুলি অসুবিধাও আছে। ইহাতে সময় বেশী লাগে। মনিহারীঘাটে এবং সক্রিকলিঘাটে মালপত্র ও যাত্রীর উঠানামার প্রয়োজন হয়। বর্ষাকালে প্রবল বন্যায়ও অনেক ক্ষেত্রে যাতায়াত বিঘ্নিত হয়। গঙ্গাবাধ পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে এই পথের দূরত্ব কমান সম্ভব হইবে এবং সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করাও সম্ভব হইবে।

Q 10 Describe briefly the importance of Suez Canal route, as a highway of commerce (Pre-C.U. 1963)

সংক্ষেপে সুয়েজ খাল পথের বর্ণনা দাও।)

Ans : নিম্নে সুয়েজ খাল পথের বর্ণনা দেওয়া হইল :

এই পথ উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, ভূমধ্যসাগরতীরস্থ স্থান, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, এশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের সহিত জলপথে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে। সুয়েজ যোজক কাটিয়া খাল তৈয়ারী করার পর হইতে এ পথের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার পূর্বে সমুদ্রপথে ইউরোপ হইতে এশিয়া বা অষ্ট্রেলিয়া যাইতে হইলে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া আসিতে হইত।

সুয়েজ খাল কাটা আরম্ভ হয় ১৮৫৯ সালে এবং উহাতে প্রথম জাহাজ চলাচল আরম্ভ হয় ১৮৬৯ সালে। ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার ফার্ডিণ্যাণ্ড ডি লেসেপ্সের নেতৃত্বে এই খাল কাটা হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে ১০ মাইল। ইহার বিস্তার ১৫০ ফুট এবং গভীরতা ৩৩ ফুটের কম নয়। খালটি ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যে অবস্থিত তিনটি লবণাক্ত হ্রদকেও সংযুক্ত করিয়াছে। ইহা মিশর দেশের মরুময় নেগেভ মরুভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত। বর্তমানে ইহা মিশর সরকারের সম্পত্তি। পূর্বে ইহার উপর

বৃটিশের ও ফরাসীর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। এই খাল কাটার ফলে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যাইতেছে :

(১) ইহা এশিয়া, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের মধ্যে দূরত্ব কমাইয়া দিয়াছে। লণ্ডন হইতে বোম্বাইয়ের দূরত্ব উত্তমাশা অন্তরীপ পথে ১১২০০ মাইল কিন্তু সুয়েজ পথে ৬৩০০ মাইল। লণ্ডন হইতে কলিকাতার দূরত্ব উত্তমাশা অন্তরীপ পথে ১০৫০০ মাইল, কিন্তু সুয়েজপথে ৭৫০০ মাইল। ইহা লণ্ডন ও ইয়োকোহামার মধ্যে দূরত্ব ৩০০০ মাইল এবং লণ্ডন ও সিডনির মধ্যে দূরত্ব ১০০০ মাইল কমাইয়াছে।

(২) এই পথে অনেক ভাল ও বড় বন্দর আছে। উহাদের মধ্যে **লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের মধ্যে** জিব্রাল্টার, মার্সাই, জেনোয়া, আলেকজান্দ্রিয়া, পোর্ট সৈয়দ, এডেন, করাচী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া লিভারপুল, এন্টোয়ার্প, রটারডাম, ওডেসা, মোম্বাসা, কলম্বো, কলিকাতা, রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, হংকং, ইয়োকোহামা' সিডনি, মেলবোর্ণ প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য। এই বন্দরগুলির অবস্থানের জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে প্রচুর মাল আমদানি-রপ্তানি হইতে পারে। মাল সহজে উঠান-নামানো সম্ভব হয় এবং জাহাজের ইন্ধনের কোন অভাব হয় না।

(৩) দূরত্ব কমিয়া যাওয়ায় এবং ভাল বন্দরের সুযোগ-সুবিধা থাকায় সম্ভোগকারী-গণ অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে এবং অল্প সময়ের মধ্যে জিনিসপত্র পাইতে পারে।

(৪) আন্তর্জাতিক আইনানুসারে যুদ্ধ ও শান্তির সময় বিভিন্ন দেশের জাহাজ এই পথে নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারে।

(৫) এই পথ বৃটিশ ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের যে পূব দিকের বৈদেশিক অধিকৃত স্থানগুলি আছে তাহার প্রধানতম যোগাযোগ পথ।

(৬) মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসম্পদ আহরণ ও বন্টনেও এই পথ বিশেষ কার্য্যকরী। ইউরোপের প্রয়োজনের প্রায় ৮৫ ভাগ পেট্রোলিয়াম সুয়েজ পথে প্রেরিত হয়।

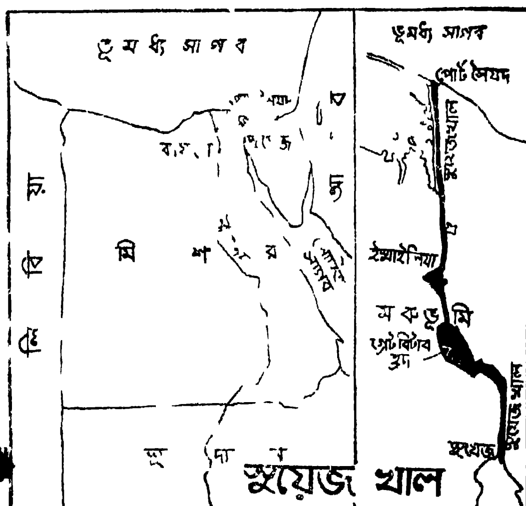
(৭) এই পথে জাহাজ লণ্ডন এবং ইউরোপের অন্যান্য বন্দর হইতে যাত্রা করিয়া জিব্রাল্টার প্রণালী দিয়া ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করে। উহা জিব্রাল্টার বন্দর হইয়া মার্সাই, মাল্টা, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি বন্দর দিয়া সুয়েজ বন্দরে আসে। তৎপর লোহিত সাগর পার হইয়া এডেন বন্দরে পৌঁছায়। এডেন হইতে এক শাখা পূর্ব আফ্রিকার মোম্বাসা, ডার-এস-সালাম ও মোজাম্বিক হইয়া ডারবান পর্যন্ত যায়। এক শাখা করাচী হইয়া বোম্বাই আসে।

বোম্বাই হইতে তৎপর কলম্বো যায়। এডেন হইতে সরাসরি বোম্বাই কিংবা কলম্বোতেও জাহাজ যাতায়াত করে। কলম্বো হইতে কলিকাতা, রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, হংকং, ইয়োকোহামা এবং ফ্রিমান্টল, মেলবোর্ণ, সিডনি, ওয়েলিংটন প্রভৃতি স্থানে যায়। সুতরাং এই পথ সর্বাধিক স্থান এবং লোকের সংস্পর্শে আসে।

(৮) এই পথের প্রধান পণ্যদ্রব্যের মধ্যে এশিয়ার চা, পাট, তামাক, তৈলবীজ, চামড়া, অভ্র, খনিজ তৈল, রবার, ম্যাঙ্গানিজ, তুলা, চিনি, কাঠ প্রভৃতি, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড হইতে গম, পশম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, পূর্ব আফ্রিকার চা, তুলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত পণ্য ইউরোপের ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে যায়। ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে নানা জাতীয় শিল্পদ্রব্য যেমন বস্ত্র, ইস্পাত, যানবাহন, রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, গম প্রভৃতি প্রয়োজনমত প্রাচ্যের দেশগুলিতে আসিয়া থাকে। তবে এই পথের নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলিও আছে :

(১) এই পথে সুয়েজ খালের কর দিতে হয় এবং এজন্য 'লাইনার' জাহাজই বেশী চলে। কারণ লাইনারের গতিবেগ বেশী। যে পণ্যের ও যাত্রীদের দ্রুত চলাচল প্রয়োজন তাহারাই বেশী ভাড়া দিয়া এ পথে যাতায়াত করে। অষ্ট্রেলিয়া হইতে আগত 'ট্রাম্প' জাহাজ মাশুল কমের জন্য উত্তমাশা অন্তরীপ পথেই বেশী যাতায়াত করে।

(২) খালটি খুব বেশী চওড়া না হওয়ায় অধুনা নির্মিত বড় বড় জাহাজ এই খাল দিয়া যাইতে পারে না এবং খালটি পার হইতে বেশী সময় লাগে। বর্তমানে অবশ্য অবস্থার অনেকটা উন্নতি হইতেছে। পূর্বে যেখানে ৩২ ঘণ্টা সময় লাগিত এখন সেখানে ১২ ঘণ্টা সময় লাগে। দৈনিক প্রায় ৫০ খানা জাহাজ



ইহাতে যাতায়াত করিতে পারে এবং ৪০০০০ টনের জাহাজও যাইতে পারে। ভাড়াও পূর্বাপেক্ষা কমান হইয়াছে।

Q. 11. Describe the ocean route from Bombay to London via Suez canal. Mention three important ports of call on the way and the commodities available for export from these ports.

(সুয়েজখাল পথে বোম্বাই হইতে লণ্ডন পর্যন্ত সমুদ্রপথ বর্ণনা কর। উক্ত পথের তিনটি প্রধান বন্দরের নাম এবং উক্ত বন্দরগুলি হইতে যে পণ্য রপ্তানি হয় তাহা উল্লেখ কর।)

Ans : See to Ans, of Q. 10.

Q. 12. Describe the comimercial importance of Panama Canal.

(পানামা খালের বাণিজ্যিক গুরুত্ব বর্ণনা কর।)

Ans : পানামা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে বিস্তৃত ৭০০ মাইল দীর্ঘ একটি সংকীর্ণ যোজক। ইহার মধ্য দিয়া একটি খাল কাটিয়া আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে সংযুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত খাল পানামা খাল নামে পরিচিত। এই খাল কাটার পূর্বে আমেরিকার পূর্ব পার্শ্ব ও পশ্চিম পার্শ্বের মধ্যে জলপথে যাতায়াত করিতে হইলে দক্ষিণ আমেরিকার হর্ণ অন্তরীপ ঘুরিয়া যাইতে হইত।

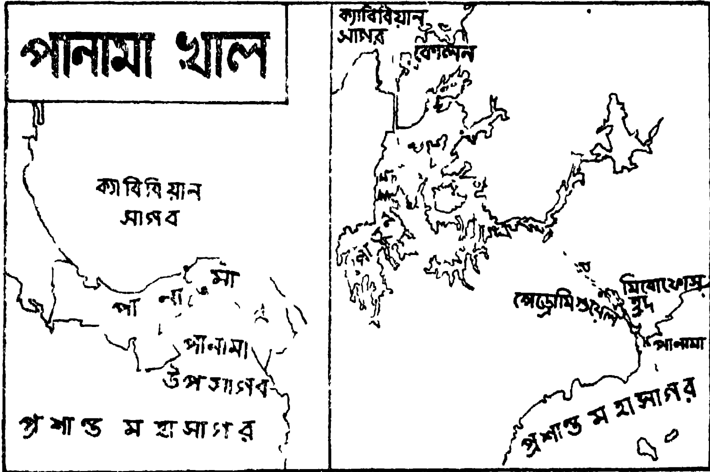
সুয়েজ খাল কাটার পর এই খাল কাটার কথা চিন্তা করা হয় এবং এজন্য পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৯০৭ সালে এই খাল কাটা আরম্ভ হয় এবং ১৯১৪ সালের ১৫ই আগষ্ট ইহা জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টায় এই খাল কাটা সম্পূর্ণ হয় এবং উহা উক্ত সরকারের সম্পত্তি।

এই খালের দৈর্ঘ্য ৫০ মাইল, প্রস্থ ৩০০ হইতে ১০০০ ফুট এবং গভীরতা ৪১ ফুটের কম নয়। এই খাল দ্বারা পানামা যোজকে অবস্থিত মিরাফ্লোরস ও গাটুর্ন নামে দুইটি হ্রদকে সংযুক্ত করা হইয়াছে। খালটি পানামা যোজকের পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া কাটা হইয়াছে। এজন্য এ খাল সুয়েজের মত সমুদ্র সমতলে অবস্থিত নহে। ১২টি অর্গলের (Lock gate) মাধ্যমে এবং বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের সাহায্যে এই পথে জাহাজ যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত হয়। জাহাজগুলিকে মিরাফ্লোরস হ্রদে ৫৫ ফুট এবং গাটুন হ্রদে প্রায় ৮৫ ফুট উচ্চে তুলিতে হয় এবং উহার পরে আবার ধাপে ধাপে অর্গল দিয়া নামাইতে হয়। এই খাল অতিক্রম করিতে প্রায় ৬ হইতে ৮ ঘণ্টা সময় লাগে এবং ইহাতে দৈনিক ৪৮টি জাহাজ যাতায়াত করিতে পারে।

এই খাল কাটার ফলে নিম্নলিখিত **সুবিধাগুলির সৃষ্টি হইয়াছে :**

(১) ইহা উত্তর আমেরিকার আটলান্টিক উপকূল এবং দক্ষিণ আমেরিকার

প্রশান্ত উপকূলের মধ্যে অনেক দূরত্ব কমাইয়া দিয়াছে। নিউইয়র্ক হইতে ভ্যাল প্যারাইসোর দূরত্ব হর্ণ অন্তরীপ ঘুরিয়া ম্যাজেলীন প্রণালী পথে ৮৪০০ মাইল কিন্তু পানামা পথে ৪৬০০ মাইল। উহার ফলে আমেরিকার পূর্ব উপকূলের সহিত পশ্চিম উপকূলের জলপথ বাণিজ্য যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে।



(২) ইহার ফলে নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান ও উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের মধ্যেও উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলের এবং উত্তর পশ্চিম ইউরোপের দূরত্ব কমিয়া গিয়াছে। নিউইয়র্ক হইতে ওয়েলিংটনের (নিউজিল্যাণ্ড) দূরত্ব ম্যাজেলান প্রণালী পথে ১১৩০০ মাইল, কিন্তু পানামা পথে ৮৫০০ মাইল। নিউইয়র্ক [illegible] সিডনির দূরত্ব সুয়েজ পথে ১৩৪০০ মাইল কিন্তু পানামা পথে ৯৭০০ মাইল। [illegible] হইতে ওয়েলিংটনের দূরত্ব সুয়েজপথে ১২৫০০ মাইল কিন্তু পানামা পথে [illegible]ল। উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল ও পশ্চিম উপকূলের মধ্যে দূরত্বও [illegible] মাইল কমিয়া গিয়াছে। নিউইয়র্ক হইতে ইয়োকোহামার দূরত্ব সুয়েজ [illegible] মাইল কিন্তু পানামা পথে ৯৭০০ মাইল। সুতরাং এই খাল কাটাতে সামুদ্রিক বাণিজ্যের নূতন পথ সৃষ্টি হইয়াছে এবং ফলে নানাদিক দিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে। হাওয়াই ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অর্থনৈতিক উন্নতিও যে ইহার ফলে বৃদ্ধি পাইয়াছে একথা অনস্বীকার্য্য।

(৩) ইহার ব্যবসায়িক গুরুত্ব ছাড়া রাজনৈতিক গুরুত্বও কম নয়। প্রয়োজনের সময় যুদ্ধ-জাহাজও আটলান্টিক মহাসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরে দ্রুত যাতায়াত করিতে পারে।

কিন্তু ইহার নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলিও আছে :

(১) ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে সুয়েজখালের মত ইহা ততটা গুরুত্ব লাভ করিতে পারে নাই। কারণ এই পথ সুয়েজের মত ঘনবসতিপূর্ণ শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত দেশগুলির মধ্য দিয়া যায় নাই।

(২) জাপান বা অষ্ট্রেলিয়ার দিকে যাইতে জাহাজগুলিকে বিস্তৃত প্রশান্ত-মহাসাগর পার হইতে হয়। এখানে উপযুক্ত সংখ্যক বন্দর বা পোতাশ্রয় নাই এবং আরোহীও চালকদের বিলক্ষণ বৈচিত্র্যবিহীনভাবে অনেকদিন কাটাইতে হয়।

(৩) পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যদিয়া বিস্তৃত বলিয়া অর্গলের সাহায্যে জাহাজ উঠানো-নামানো ব্যয়ও কম নয় এবং উহা সময় সাপেক্ষ।

(৪) এই খাল প্রকৃত প্রস্তাবে আমেরিকার খাল। আমেরিকা বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহাতে বেশী উপকৃত হইয়াছে। পানামা খাল দিয়া জাহাজ চলাচলের পরিমাণ প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ টন। উহার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিমাণ ৯০ লক্ষ টন এবং ব্রিটেনের ৫০ লক্ষ টন। তবে সুয়েজ জাতীয়করণের পর মিশরের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন অনেক দেশ ইউরোপ হইতে অষ্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে যাইতে পানামা পথ ব্যবহার করিতেছেন। এই দিক দিয়া বিচার করিলে পানামাপথের গুরুত্ব দিনদিন বাড়িবে বই কমিবে না।

Q. 13. Make a comparative study between the Suez Canal route and the Panama Canal route.

(সুয়েজ ও পানামার খালপথের একটি তুলনামূলক বিবরণ দা

নিম্নে সুয়েজ ও পানামা খালপথের তুলনামূলক বিচার করা হইল :

সুয়েজ খাল	পানামা খা[illegible]
১। ইহার দৈর্ঘ্য ১০১ মাইল। অর্গল না থাকায় ১২ ঘণ্টায় জাহাজ পার হইতে পারে।	১। ইহার দৈর্ঘ্য ৫০ মা[illegible] ১২টি অর্গল থাকায় ৬ হইতে ৮ ঘণ্টা সময় লাগে।

সুয়েজ খাল

২। ইহার বিস্তার ১৫০ ফুট ও গভীরতা ৩৬ ফুট। ইহাতে খুব বড জাহাজ চলাচল করিতে পারে না।

৩। ইহাতে গ্রেটব্রিটেন বেশী সুবিধাপ্রাপ্ত। ইহাতে যত জাহাজ চলাচল কবে তাহাব অর্ধেক গ্রেট-ব্রিটেনের।

৪। এই পথে অনেক ঘন বসতিপূর্ণ ও শিল্প-সমৃদ্ধ দেশ আছে।

৫। উত্তমাশা অন্তরীপ পথ ইহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী।

৬ ইহার কর বেশী।

৭। এই পথের উল্লেখযোগ্য পণ্য ভারতের চা পাটজাত দ্রব্য, চামডা তুলা, তৈলবীজ, সিংহলেব চা, পাকিস্তানের তূলা চামডা ও পাট, অষ্ট্রেলিযার গম, পশম, মাংস, মালয় ও ইন্দোনেশিযাব রবার পূর্ব আফ্রিকার চা ও তুলা, আবব, ইরাক ও ইরাণের তৈল, ইউবোপ ও আমেরিকার যন্ত্রপাতি, শিল্পদ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি।

৮। ইহা এখন মিশবের কিন্তু আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে যুদ্ধের সময়ও সকল জাতির জাহাজ চলাচলের অধিকার আছে।

পানামা খাল

২। ইহার বিস্তার ৩০০ হইতে ১০০০ ফুট এবং গভীরতা ৪১ ফুট। ইহাতে বড জাহাজ চলাচল করিতে পারে।

৩। ইহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেশী সুবিধাপ্রাপ্ত। ইহাতে যত জাহাজ চলাচল করে তাহাতে শতকরা ৪০ ভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।

৪। এই পথে ঘন বসতিপূর্ণ ও শিল্প-সমৃদ্ধ দেশ সেরূপ নাই।

৫। হর্ণ অন্তরীপ পথ ইহার সেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী নহে।

৬। ইহার কব কম।

৭। এই পথেব উল্লেখযোগ্য পণ্য কালিফোর্নিয়ার তৈল ও ফল, ভ্যাঙ্কু-বারের কাঠ ও মাছ, চিলির তামা ও নাইট্রেট বলিভিয়ার টিন, হাওয়াই ও ফিজির চিনি, জাপানের রেশম, নিউজিল্যাণ্ডের দুগ্ধজাত দ্রব্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের যন্ত্রপাতি, বস্ত্র, ঔষধ, গম, রাসায়নিক দ্রব্য, কানাডার কাগজ ও গম প্রভৃতি।

৮। ইহার মালিক যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু সুয়েজের মত কোন আন্তর্জাতিক নিয়ম নাই।

Q. 14. Describe the importance of the North Atlantic Ocean as a highway of Commerce. (C U. Inter, 1957, Pre. 1962)

(প্রধান বাণিজ্যপথ হিসাবে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের গুরুত্ব বর্ণনা কর।)

Or

Describe the importance of the North Atlantic Ocean route as a highway of commerce mentioning the important parts of call and commodities carried (B U. Entrance, 1963)

(প্রধান বাণিজ্যপথ হিসাবে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের গুরুত্ব বর্ণনা কর এবং বাণিজ্যে নিযুক্ত প্রধান প্রধান বন্দর ও বাহিত দ্রব গুলি উল্লেখ কর।

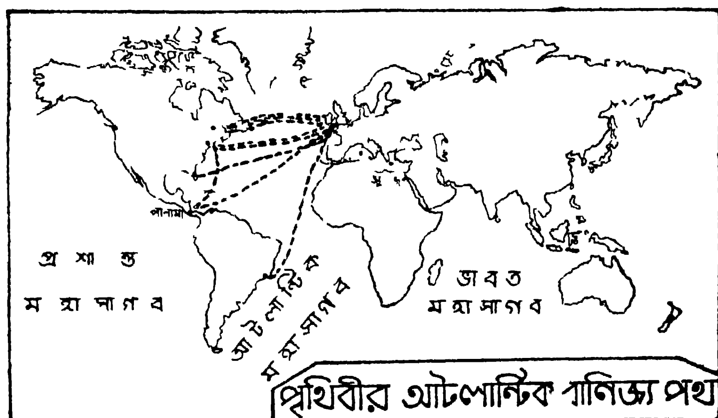
Ans উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর বাণিজ্যের দিক দিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইহা আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান বাণিজ্যপথ। বাণিজ্যপথ হিসাবে ইহার প্রাধান্য নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য সম্ভব হইয়াছে।

(১) এই মহাসাগরের একদিকে শিল্পোন্নত জনবহুল ইউরোপ এবং অপরদিকে কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধিশালী উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা। ইহার উভয়দিকের দেশগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যে অত্যন্ত উন্নত। সমুদ্রে যাতায়াত ইহারা অনেকদিন ধরিয়াই করিয়া আসিতেছে। কলম্বসের উত্তর আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব হইতেই নরওয়ের অনেকে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও ল্যাব্রাডরে মৎস্য শিকারের জন্য যাইত। সুতরাং এই পথে যাতায়াত অনেকদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পণ্য আদান-প্রদানও দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে ক্ষুদ্র-বৃহৎ হাজার হাজার জাহাজ পণ্যসম্ভার লইয়া এই পথে যাতায়াত করিতেছে।

(২) পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে কারখানার অভাব নাই। কিন্তু ইহাদের কাঁচামালের সংস্থান সেরূপ নাই। পক্ষান্তরে উত্তর আমেরিকার কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ইউরোপের তুলনায় লোকসংখ্যার ঘনত্ব কম। অথচ কৃষিজ [illegible] অরণ্যজ ও প্রাণিজ প্রভৃতি কাঁচামালে সমৃদ্ধ এবং তুলনায় অনেক বেশী উৎপন্ন [illegible] ইহা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা শিল্পসমৃদ্ধও বটে। আমেরিকা ইস্পাত দ্রব্য, [illegible] তৈল, কাগজ বস্ত্র, তুলা, গম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, যব, ভুট্টা, কাষ্ঠমণ্ড, কাঠ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ইউরোপের দিকে রপ্তানি করে। পক্ষান্তরে আমেরিকা প্রচুর পরিমাণে যন্ত্রাদি, বিলাসদ্রব্য, চা, পাট, ম্যাঙ্গানিজ, খনিজ তৈল, মদ প্রভৃতি ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ হইতে এই পথে প্রচুর আমদানি করে। ফলে এ পথে দ্রব্যসম্ভারের প্রাচুর্য্য

ঘটিয়া থাকে। উন্নত জীবনমান ও ঘনবসতির জন্য বিনিময়যোগ্য পণ্যের পরিমাণ সব সময়েই বেশী।

(৩) এই পথে বাণিজ্যে নিযুক্ত বন্দরগুলির মধ্যে ইউরোপের গ্লাসগো, লিভারপুল ম্যাঞ্চেষ্টার, সাদাম্পটন, লণ্ডন, আমষ্টারডাম, রটারডাম, হামবুর্গ, ব্রেমেন, আস্তোয়ার্প, লা হাবার, শেরবুগ ও লিসবন এবং উত্তর আমেরিকার হ্যালিফ্যাক্স, সেণ্টজন, কুইবেক, মন্ট্রিল, বোষ্টন নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া বাল্টিমোর, চার্লষ্টন, গ্যালভেষ্টন, নিউ আর্লিয়ন্স প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই বন্দরগুলির প্রায় সমস্তই উৎকৃষ্ট ও স্বাভাবিক পোতাশ্রয়যুক্ত। সুতরাং এই পথে ভাল বন্দরের সংখ্যাও প্রচুর। তাহা ছাড়া প্রায় সমস্ত বন্দরগুলি একটি বৃহৎ বৃত্তাংশে অবস্থিত। এজন্য জাহাজগুলি হ্রস্বতম পথে



পৃথিবীর আটলাণ্টিক বাণিজ্য পথ

যাতায়াত করিতে পারে। ইহা ছাড়া পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজগুলিও অনায়াসে এই পথে যাতায়াত করিতে পারে।

(৪) এই পথে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দ্বীপপুঞ্জ বা মগ্নচড়ার সংখ্যা কম। এজন্য বড় বড় জাহাজ নিরাপদে চলাচল করিবার সুযোগ পায়।

(৫) এ পথের অনেক স্থলেই ইন্ধনের যোগান আছে। এজন্য জাহাজের পথে কোন সময়েই ইন্ধনের অভাব বোধ করিতে হয় না। তবে এই পথের অসুবিধা-গুলির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য:

(১) এই পথে কুয়াশার প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। ইহা মাঝে মাঝে ভাসমান হিমশৈলও দৃষ্টিগোচর হয়। এরূপ অবস্থা জাহাজ চলাচলের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। বিখ্যাত 'টাইটানিক' জাহাজ এরূপ হিমশৈলে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াই নিমজ্জিত হইয়াছিল। অবশ্য বর্তমানকালে বিজ্ঞানের উন্নতি হওয়ায় 'রাডার' যন্ত্রাদির সাহায্যে হিমশৈল এড়াইয়া চলা যাইতে পারে।

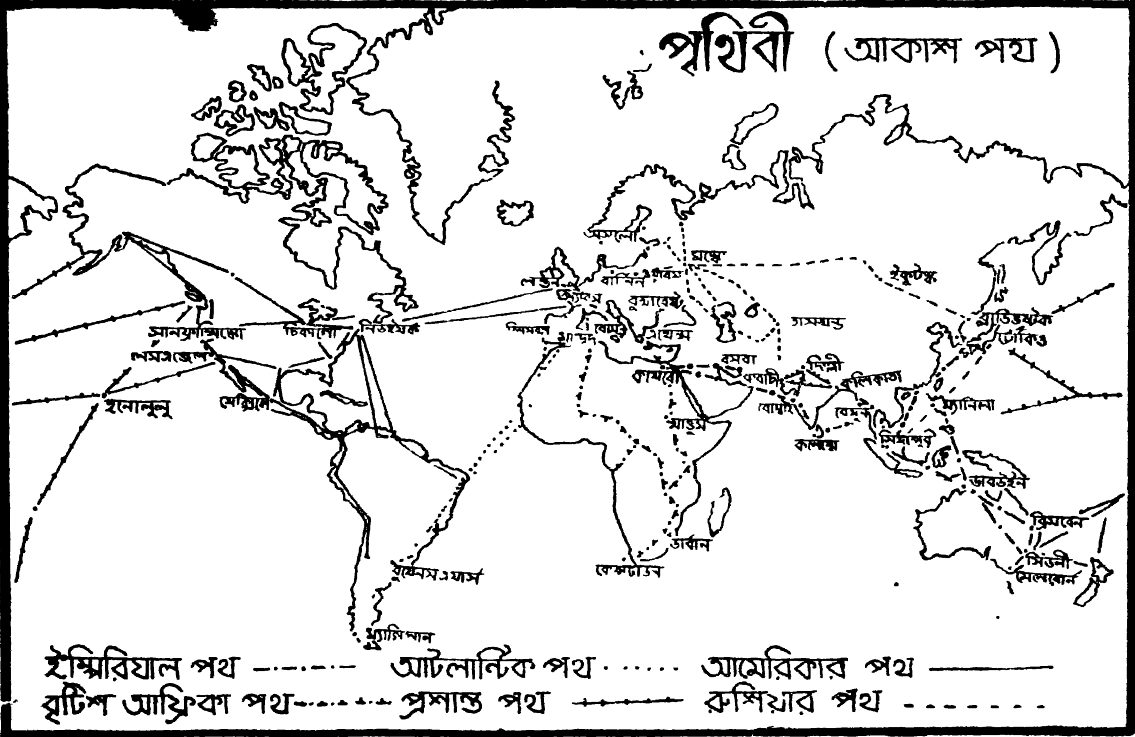
(২) শীতকালে বরফ জমার ফলে সেণ্টলরেন্স নদীর উপর অবস্থিত মন্ট্রিল, কুইবেক প্রভৃতি বন্দরে জাহাজ চলাচল করিতে পারে না।

Q. 15. Give a brief account of the chief air routes of the world.

(সংক্ষেপে পৃথিবীর আকাশ পথের বিবরণ দাও।)

Ans বর্তমান যুগের দ্রুততম যান হইতেছে বিমান। ইহার সাহায্যে সবচেয়ে কম সময়ে একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া চলে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঝড়, বাদল, কুয়াশা প্রভৃতি ছাড়া পাহাড়, পর্বত, নদী, নালা ইহার চলাচলে কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না। বিমানে চলাচল ব্যয় অন্যান্য যান অপেক্ষা বেশী। এজন্য অর্থবান ব্যক্তি ভিন্ন ইহাতে যাতায়াত করিতে পারে না। ইহার ফলে ব্যবসা জগতে ইহার বহুল প্রচার এখনও সম্ভব হয় নাই। কেবলমাত্র মূল্যবান জিনিস, চিঠি-পত্রাদি, ধনী ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের বহন করার কার্যেই ইহা বেশী ব্যবহৃত হইতেছে। এই ব্যবহার সীমাবদ্ধ থাকিলেও পৃথিবীর সর্বত্রই কমবেশী বিমানে যাতায়াতের সুবিধা আছে। যুক্তরাষ্ট্র, জার্মাণী, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড প্রভৃতি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নত দেশগুলিতেই বিমান চলাচল ব্যবস্থা বেশী উন্নত দেখা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের উপর দিয়া যে পথে বিমান চলাচল হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পথগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(১) **ইউরোপ, এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যবর্তী বিমানপথ :** এই পথে বিমান চলাচল প্রধানতঃ বৃটিশ, ফরাসী, ওলন্দাজ, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ভারত প্রভৃতি দেশের বিমান দ্বারা পরিচালিত হয়। বৃটিশের বিমান এই পথে প্রধানতঃ [illegible] হইতে প্যারী, মার্সাই, এথেন্স, আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো বাগদাদ, করাচী, যোধপুর, দিল্লী, কলিকাতা, রেঙ্গুন, ব্যাংকক্, সিঙ্গাপুর, জাকার্তা, ডারউইন, ব্রিসবেন, সিডনি, মেলবোর্ণ ও এডিলেড পর্যন্ত যাতায়াত করে। সিঙ্গাপুর হইতে ইহার এক শাখা, হংকং, সাংহাই হইয়া টোকিও পর্যন্ত যাতায়াত করিয়া থাকে। এই পথে যাতায়াত ব্যাপারে বৃটিশ ওভারসীজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন (B. O. A. C.) বিশেষ


পৃথিবী (আকাশ পথ)
অসলো
মস্কো
বার্লিন
লণ্ডন
বুখারেস্ট
ইর্কুটস্ক
তাসখন্দ
ভ্লাডিভস্টক
টোকিও
এথেন্স
বসরা
দিল্লী
কলিকাতা
করাচী
কায়রো
বোম্বাই
ম্যানিলা
সিঙ্গাপুর
কলম্বো
ডারউইন
ব্রিসবেন
সিডনী
মেলবোর্ন
ডার্বান
কেপটাউন
নিউইয়র্ক
চিকাগো
স্যানফ্রান্সিস্কো
লসএঞ্জেলস
হনোলুলু
মেক্সিকো
বুয়েনস এয়ার্স
ম্যাজিলান
ইম্পিরিয়াল পথ
আটলান্টিক পথ
আমেরিকার পথ
বৃটিশ আফ্রিকা পথ
প্রশান্ত পথ
রুশিয়ার পথ

উল্লেখযোগ্য। ফরাসী ও ওলন্দাজ বিমানগুলিও মোটামুটি এপথে যাতায়াত করিয়া থাকে। ওলন্দাজের রয়েল ডাচ এয়ার লাইনস (K. L. M) এবং ফ্রান্সের এয়ার ফ্রান্স (A F) বিমান প্রতিষ্ঠান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(২) **ইউরোপ এবং আফ্রিকার মধ্যবর্তী বিমানপথ:** এই পথ বৃটিশ, ফরাসী ও ইতালীর বিমান দ্বারা পরিচালিত। বৃটিশের বিমান প্রধানতঃ ইংলণ্ডের সাদাম্পটন হইতে আলেকজান্দ্রিয়া ও খার্টুম হইয়া পশ্চিম আফ্রিকার লাগোস ও দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন পর্যন্ত যাতায়াত করে। ফরাসী বিমান প্যারী হইতে আলেকজান্দ্রিয়া ও খার্টুম হইয়া পশ্চিম আফ্রিকার বা ষ্ট ও মাদাগাস্কার পর্য্যন্ত চলাচল করে। ইতালীর বিমান রোম হইতে ত্রিপলি, কায়রো প্রভৃতি হইয়া আবিসিনিয়ার আদ্দিস আবাবা পর্যন্ত যায়।

(৩) **ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যবর্তী বিমানপথ:** এই পথের প্রধান শাখাগুলি লণ্ডন হইতে গাম্বিয়া হইয়া অটোয়া ও নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত, প্যারী হইতে লিসবন, এজোর্স বারমুণ্ডা হইয়া নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত এবং ষ্টকহলম ও অসলো হইতে গাম্বিয়া হইয়া অটোয়া ও নিউইয়র্ক পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার এক শাখা লণ্ডন, প্যারী প্রভৃতি হইতে ডাকার হইয়া দক্ষিণ আমেরিকার পারনাম কিউকো, রিওডিজেনেরো, বুয়েনশ এয়াস ও সান্তিয়াগো পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

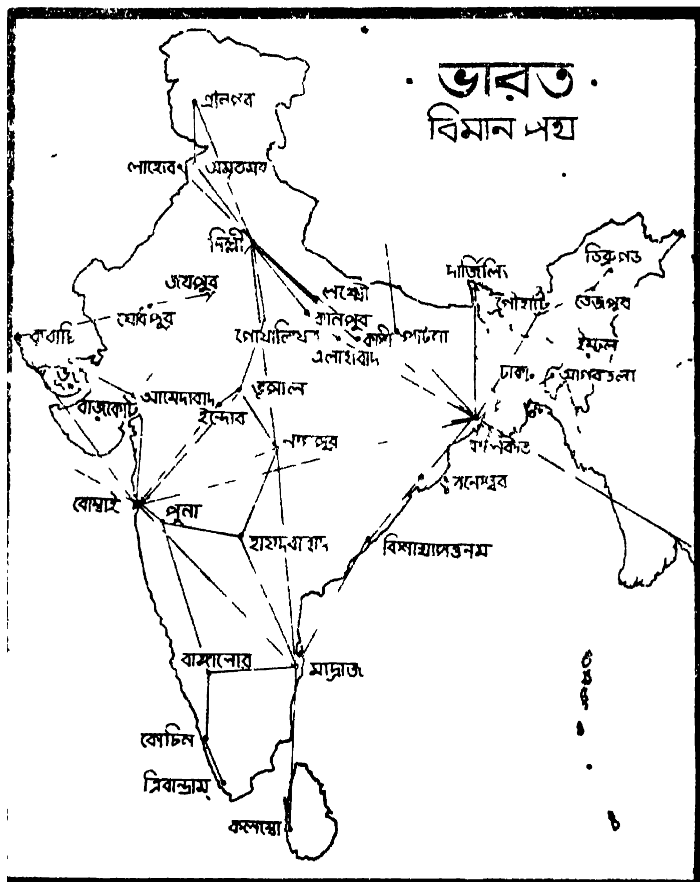
(৪) **আমেরিকা হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া এশিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিমানপথ:** ইহার এক শাখা সানফ্রান্সিস্‌কো ও লস্ এঞ্জেলস্ হইতে হনলুলু হইয়া ম্যানিলা সাংহাই সিঙ্গাপুর দিয়া নিউজিল্যাণ্ড পর্য্যন্ত প্রসারিত। অপর একটি শাখা সীটল হইতে কানাডার পশ্চিম উপকূল ধরিয়া টোকিও ও সাংহাই পর্য্যন্ত গিয়াছে।

(৫) **উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্তী বিমানপথ:** ইহার প্রধান শাখা নিউইয়র্ক হইতে ফ্লোরিডা, কিউবা হাইতি, ত্রিণিদাদ হইয়া বুয়েনস আয়াস পর্যন্ত গিয়াছে। অপর একটি শাখা নিউইয়র্ক, কিউবা, ভলপ্যারাইসো ও মেণ্ডোজা হইয়া বুয়েনস আয়ার্স গিয়াছে।

(৬) **পশ্চিম ইউরোপ হইতে রাশিয়া হইয়া পূর্ব এশিয়ার বিমানপথ:** এই পথ প্রধানতঃ মস্কো হইতে কাজাক, ওমস্ক, নভোসাইবিবিস্কি, ইর্খুটস্ক, চিতা, খাবারোভস্ক প্রভৃতি হইয়া ভাডিভস্টক পর্য্যন্ত গিয়াছে। মস্কো হইতে টাসকেণ্ট হইয়া দিল্লী পর্যন্ত বিমান চলাচল করে।

(৭) **ভারতীয় বিমানপথ:** ভারতের সহিত উপরিউক্ত পথে বিভিন্ন দেশের

সহিত বিমান চলাচল হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া ইহার অভ্যন্তর ভাগের বিভিন্ন অংশের সহিত নিয়মিত বিমান চলাচল হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে কলিকাতা-



দিল্লী কলিকাতা-মাদ্রাজ, কলিকাতা-নাগপুর বোম্বাই, বোম্বাই-যোধপুর দিল্লী; বোম্বাই বাঙ্গালোর-মাদ্রাজ, কলিকাতা গৌহাটি, কলিকাতা-বাগডোগরা; কলিকাতা আগরতলা-শিলচর-ইম্ফল, দিল্লী-শ্রীনগর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

একাদশ অধ্যায়

বন্দর, বাণিজ্যকেন্দ্র, নগর ও সহর

(Ports, Trade Centres, Cities and Towns)

Q. 1 What is a Port? What are the conditions that favour the development of good sea port? Illustrate your answer with one conspicuous example from each continent. (C. U. Inter. 1947, 1952)

(বন্দর কাহাকে বলে? ভাল সামুদ্রিক বন্দরের উন্নতি কি কি অবস্থার উপর নির্ভর করে? প্রত্যেক মহাদেশ হইতে একটি বিশিষ্ট উদাহরণসহ উত্তর লিখ।)

Or

What are the chief factors that contribute to the development of ports? Illustrate your answer with special reference to the Indian Union.

(বন্দরের উন্নতির জন্য কি কি অবস্থা প্রয়োজন? ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে উদাহরণসহ উত্তর লিখ।)

(C. U. Pre, 1962)

Or

What are the Characteristics of a good sea port? Give two examples from India to illustrate your answer (B. U. Entrance, 1963)

(ভাল বন্দরের বৈশিষ্ট্য কি? ভারত হইতে দুইটি উদাহরণ সহ উত্তর লিখ।)

Ans: জলভাগ ও স্থলভাগের সন্ধিস্থলে যে স্থানে ষ্টীমার বা জাহাজ হইতে মালপত্র নামাইবার এবং উহাতে উঠাইবার ব্যবস্থা থাকে তাহাকে **বন্দর** (Port) বলে। বন্দর জলভাগ ও স্থলভাগের দ্বারস্বরূপ কাজ করিয়া থাকে। এরূপ

জলভাগের তীরে বন্দর গঠিত হয় তদনুসারে উহার নাম হইয়া থাকে। যেমন, সমুদ্র তীরে অবস্থিত হইলে সামুদ্রিক বন্দর, নদী তীরে অবস্থিত হইলে নদী বন্দর হ্রদের তীরে অবস্থিত হইলে হ্রদ বন্দর ইত্যাদি নামকরণ হইয়া থাকে।

ভাল সামুদ্রিক বন্দর গড়িয়া উঠিবার এবং উহার উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি থাকা প্রয়োজন :

(১) পোতাশ্রয় (Harbour): যে স্থানে জাহাজ নিরাপদে অবস্থান করিতে পারে তাহাকে পোতাশ্রয় বলে। জাহাজের নিরাপদ অবস্থানের জন্য পোতাশ্রয়ের নিম্নলিখিত গুণ থাকা আবশ্যক :

(ক) ইহাকে সমুদ্রস্রোত, ঝড়ঝঞ্ঝা ও তরঙ্গ বিক্ষেপ মুক্ত হইতে হইবে। এজন্য তটরেখা ভগ্ন, অথচ গভীর ও প্রশস্ত খাঁড়ি-যুক্ত হওয়া উচিত।

(খ) উহাতে জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত জলের গভীরতা থাকা আবশ্যক। লণ্ডন বোম্বাই, করাচী, সিডনি, নিউইয়র্ক, স্যানফ্রান্সিসকো প্রভৃতি বন্দরের পোতাশ্রয়গুলির জলের এরূপ গভীরতা আছে বলিয়া উহারা সামুদ্রিক বন্দর হিসাবে বিশেষ উন্নত।

(গ) পোতাশ্রয়কে সারাবৎসর বরফ ও কুয়াশা মুক্ত হইতে হয়। কানাডা বা রাশিয়ার উত্তরাঞ্চল এরূপ বরফাবৃত ও কুয়াশাচ্ছন্ন বলিয়া সেখানে ভাল বন্দর গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

(ঘ) একসঙ্গে একাধিক জাহাজ চলাফেরার উপযুক্ত প্রশস্ততাও ইহাতে থাকা প্রয়োজন।

(ঙ) উন্মুক্ত সমুদ্র এবং পোতাশ্রয়ের প্রবেশমুখ বালুচড়া বা অন্যান্য বিঘ্নবিহীন ও এক সমতলে অবস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বোম্বাই বা হংকংএ জাহাজ সহজেই প্রবেশ করিতে পারে কিন্তু কলিকাতা বন্দরে জাহাজ প্রবেশ করিতে হইলে অভিজ্ঞ পাইলটের সাহায্যে সাবধানতার সহিত অগ্রসর হইতে হয়।

(২) প্রশস্ত স্থলভাগ (Wide land space): জাহাজ বা জাহাজ হইতে মালপত্র ও যাত্রী উঠা-নামার জন্য বন্দরের জল ভাগের তীরবর্তী স্থান যথেষ্ট প্রশস্ত না হইলে বন্দরের উন্নতি হইতে পারে না। কারণ বন্দরের আয় যাহার উপর বন্দরের উন্নতি নির্ভর করে তাহার জন্য প্রচুর মাল ও যাত্রী চলাচল প্রয়োজন। এজন্য মাল মজুত রাখার জন্য উপযুক্ত ছাউনী বা গুদাম ঘর, যাত্রীদের আহার বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত, সুপেয় জলের ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রয়োজন। জাহাজের প্রয়োজনীয় ইন্ধন দ্রব্য সরবরাহ, মেরামতের উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রভৃতির

জন্য যথেষ্ট স্থানের প্রয়োজন। স্বল্পপরিসর স্থানে বন্দরের নানাবিধ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা কখনই সম্ভব নয়। এরূপ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করিতে হইলে স্থানটি স্বাস্থ্যকর এবং সমতল স্থানে অবস্থিত হওয়া অত্যাবশ্যক। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক বন্দর হাডসন নদীর মুখে ম্যানহাট্টান দ্বীপের উপর অবস্থিত হইলেও উক্ত নদীর উভয় তীরে নিউজার্সি ও ম্যানহাট্টানের ও লং দ্বীপে উপরও বিস্তৃত। এজন্য বহুসংখ্যক জাহাজ এখানে একসঙ্গে যাতায়াত করিতে পারে এবং জাহাজ রাখিবার মত নানা প্রকার ডক আছে এবং বন্দরের নানাবিধ প্রয়োজন মিটাইবার মত সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা থাকায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বন্দর বলিয়া পরিগণিত। পক্ষান্তরে কলিকাতা বৃহৎ বন্দর সন্দেহ নাই, কিন্তু বর্তমানে স্থানাভাব জন্য হলদিয়াতে বন্দর গঠনের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বন্দরের উন্নতি ও প্রসারের জন্য যে বিস্তৃত এলাকা প্রয়োজন ইহা সর্ব্বাদিসম্মত।

(৩) **পশ্চাৎভূমি (Hinterland) :** যে বন্দরের মাধ্যমে কোন অঞ্চলের পণ্য বিদেশে প্রেরিত হয় এবং বিদেশ হইতে আনীত পণ্য উক্ত অঞ্চলে বণ্টিত হয় সেই অঞ্চলকে উক্ত বন্দরের **পশ্চাৎভূমি** বলে। যেমন কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্য প্রদেশে পণ্য আদান-প্রদান হইয়া থাকে। এজন্য এই বিস্তৃত এলাকা কলিকাতার পশ্চাৎভূমি। বন্দরের উন্নতি পশ্চাৎভূমির শ্রীবৃদ্ধি ও বিস্তারের উপর নির্ভর করে। কলিকাতা বন্দরের পশ্চাৎভূমি বিস্তৃত এলাকা জুড়িয়া এবং উহা নানাবিধ পণ্যসম্ভারে সমৃদ্ধ বলিয়া উহা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। পক্ষান্তরে দক্ষিণ আমেরিকার প্যারা বন্দরের পশ্চাৎভূমি নিরক্ষীয় অঞ্চলের বনভূমি সমাচ্ছন্ন। এজন্য উহা বাণিজ্যিক পণ্যে সমৃদ্ধ নহে। ফলে উক্ত বন্দর বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। পশ্চাৎভূমির সমৃদ্ধি উক্ত অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য, জনবহুলতা, শিল্পোন্নতি, উত্তম যানবাহন ব্যবস্থা এবং পণ্যের যোগান ও চাহিদার উপর নির্ভর করে। এই-গুলির অনুকূল অবস্থা বর্তমান থাকিলে পশ্চাৎভূমি সমৃদ্ধ হয় এবং বন্দরেরও উন্নতি হয়। কলিকাতা, বোম্বাই, লণ্ডন, হামবুর্গ, নিউইয়র্ক, সিডনি, হংকং, সাংহাই প্রভৃতি বন্দর সমৃদ্ধ পশ্চাৎভূমির জন্য উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে।

Q. 2 "River ports play a vital role in the economic development of a country" Discuss. (C.U. Inter 1956)

(**নদীবন্দর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা আলোচনা কর।**)

Ans : নদীর তীরে অবস্থিত বন্দরকে **নদীবন্দর (River Port)** বলে। উহা

দুই প্রকারের হইতে পারে—(১) দেশাভ্যন্তরস্থ নদীবন্দর যেমন, এলাহাবাদ, পাটনা, গোয়ালন্দ প্রভৃতি এবং (২) সমুদ্রসন্নিকট নদীবন্দর যেমন, কলিকাতা, রেঙ্গুন, লণ্ডন, হামবুর্গ প্রভৃতি। দেশাভ্যন্তরস্থ নদীবন্দরে সামুদ্রিক বড় বড় জাহাজ সাধারণতঃ যাতায়াত করে না এবং উক্ত বন্দর মারফৎ সরাসরি সমুদ্রগামী জাহাজে বিদেশের সহিত পণ্য আদান-প্রদান হয় না। সমুদ্র সন্নিকটে অবস্থিত নদীবন্দরে বড় বড় সামুদ্রিক জাহাজ ও ষ্টীমার উভয়ই চলাচল করিয়া থাকে। দেশের অভ্যন্তরের এবং বিদেশের সহিত এই বন্দরগুলির সরাসরি যোগাযোগ থাকে।

নদীবন্দরের গুরুত্ব সামুদ্রিক বন্দর অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়। অনেকক্ষেত্রে বরং ইহার গুরুত্বই সর্বাধিক।

নদীবন্দর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পরম সহায়ক। একদিকে ইহা দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে। ফলে ইহার মাধ্যমে দেশের দূর অভ্যন্তরে যাত্রী ও মাল স্বল্পব্যয়ে প্রেরিত হইতে পারে। ভারী ও স্বল্প মূল্যের পণ্য নদীপথে ষ্টীমারে বা নৌকায় একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া যায়। এইভাবে দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্য সুসম্পন্ন হয়। এই বন্দর এবং সমুদ্র সন্নিকটে অবস্থিত বন্দর উভয়ের মধ্যেও নদীপথে নৌকায় বা ষ্টীমারে পণ্য চলাচল হইয়া থাকে। ফলে দেশের অভ্যন্তরের সহিত বহির্বাণিজ্যের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। দেশের অভ্যন্তরে নদীবন্দরের অভাব থাকিলে পণ্য বা যাত্রী স্থলপথে বা রেলপথে চলাচল করিতে পারে। ইহা অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল। গোয়ালন্দ বা চাঁদপুরের মত নদী বন্দর থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সম্ভব হইতেছে। অনুরূপ ভারতের গঙ্গার উপর অবস্থিত এলাহাবাদ ও পাটনা চীনের ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপর অবস্থিত হ্যাংকাও, ফ্রান্সের সেইন নদীর উপর অবস্থিত প্যারী ও লিয়ঁ, জার্মানীর রাইননদীর উপর অবস্থিত ডাসেলর্ডফ, মিশরের নীল নদীর উপর অবস্থিত কাইরো প্রভৃতি বিখ্যাত নদীবন্দর এবং উহারা উক্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতির পরম সহায়ক।

সমুদ্র সন্নিকটে অবস্থিত নদীবন্দরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আরও অধিক। ইহারা দেশের ও বিদেশের মধ্যে মাল ও যাত্রী চলাচলের দ্বারস্বরূপ। এই সমস্ত বন্দরের সহিত স্থলপথের ও জলপথের যোগাযোগ থাকে। ফলে মাল বদল করা ইহাদের প্রধান কাজ হইয়া পড়ে। নদীপথে ও রেলপথে অনেক পণ্য উহার পার্শ্ববর্তী এবং সুদূর অঞ্চল হইতে কলিকাতা বন্দরে আসিয়া থাকে এবং উক্ত অঞ্চলে অনুরূপভাবে হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত কলিকাতা বন্দর হইতে মাল সরবরাহ হইয়া থাকে। এইভাবে কলিকাতা বন্দর দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়তা করিয়া আসিতেছে

এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পথ সুগম করিতেছে। অনুরূপভাবে টেমসের তীরবর্তী লণ্ডন, রাইনের তীরবর্তী রটারডাম, এলব নদীর তীরের হামবুর্গ, সেণ্ট লরেন্সের তীরে মণ্ট্রিল প্রভৃতি বন্দর উহাদের পার্শ্ববর্তী এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতির পরম সহায়ক হিসাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ইহা ছাড়া বড বড বহু সামুদ্রিক বন্দর নদীর মোহনার নিকটবর্তী স্থানেই অবস্থিত এবং নদীপথের সহিত সংযুক্ত। বিভিন্ন দেশের উন্নতিশীল বন্দরগুলির দিকে দৃষ্টি দিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে উহাদের অনেকগুলি নদী বন্দর। ঐ বন্দরগুলি ভিন্ন সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিও সম্ভব হয় নাই। তবে নদী বন্দরকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির উল্লেখযোগ্য অবদান হইতে হইলে উহার নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকা অবশ্য প্রয়োজন।

(১) যে নদীর তীরে বন্দরটি গঠিত হইবে তাহাতে প্রচুর গভীর জল থাকা প্রয়োজন। নদীতে জোয়ার-ভাটা খেলিলে আরও ভাল। ইহাতে বড় বড় জাহাজ জোয়ারের সময় নদীপথে বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে।

(২) নদীর গতিপথ অযথা বেশী আঁকাবাঁকা না হয়। ইহাতে নদীপথে এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরের দূরত্ব বাড়িয়া যায় এবং বালুচড়ার সৃষ্টি হয়।

(৩) নদী তীরবর্তী স্থান বন্দর গঠনের উপযুক্ত প্রশস্ত সমতলভূমিযুক্ত হওয়া চাই। ইহাতে মাল উঠান-নামানোর এবং সঞ্চিত রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা যথা মালগুদাম, ডক প্রভৃতি নির্মাণ করা সম্ভব হয় এবং উক্ত সমতল স্থানে রেল ষ্টেশন নির্মাণ করাও সম্ভব হয়।

(৪) সারা বৎসর নদীতে জল থাকা এবং শীতকালে বরফমুক্ত থাকা প্রয়োজন। ইহাতে নদী সুনাব্য থাকে।

(৫) বন্দরের পশ্চাৎভূমি সমৃদ্ধশালী ও জনবহুল হওয়া আবশ্যক এবং অভ্যন্তরের সহিত স্থলপথে ও রেলপথে বন্দরের যোগাযোগ থাকা চাই।

Q. 3. "The importance of a port depends mainly upon the extent and productiveness of its hinterland." Discuss.

(C. U. Inter, 1940)

(বন্দরের প্রাধান্য যে উহার পশ্চাৎভূমির আয়তন ও সমৃদ্ধির উপর নির্ভর করে উহা আলোচনা কর।)

Ans. যে বন্দর কোনও অঞ্চলের আমদানি-রপ্তানির কাজ সম্পন্ন করিয়া থাকে উক্ত অঞ্চলকে ঐ বন্দরের **পশ্চাৎভূমি** (Hinterland) বলে। কলিকাতা

বন্দর, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলের আমদানি-রপ্তানির কাজ সম্পন্ন করিয়া থাকে। এজন্য এই স্থানগুলি কলিকাতা বন্দরের পশ্চাৎভূমি। অবশ্য একই পশ্চাৎভূমির একাধিক বন্দর থাকিতে পারে। মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের আমদানি রপ্তানির অনেক কাজ বিশাখাপত্তনম বন্দর দিয়াও সম্পন্ন হয়। সুতরাং উহারা বিশাখাপত্তনমেরও পশ্চাৎভূমি।

বন্দরের উন্নতি, মাল ও যাত্রী চলাচলের উপর নির্ভরশীল। যে বন্দর দিয়া যত বেশী মাল ও যাত্রী চলাচল হইবে সে বন্দরের আয় তত বেশী হইবে। আয় যত বেশী হইবে বন্দরের উন্নতি ও সমৃদ্ধি ততোধিক হইবে। বন্দরের উন্নতি আমরা এইভাবেই বিচার করিয়া থাকি। লণ্ডন পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বিশেষ উন্নতিশীল বন্দর বলিয়া পরিগণিত। মাল ও যাত্রীর ব্যাপকতার জন্যই তাহার এই সুখ্যাতি। অনুরূপে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক পৃথিবীর দ্বিতীয় বন্দর বলিয়া বিখ্যাত। পক্ষান্তরে দক্ষিণ আমেরিকার প্যারা বন্দর বা আফ্রিকার লোয়াণ্ডা বা ফ্রিটাউন্ বন্দরে সেরূপ সুখ্যাতি নাই। মাল ও যাত্রীর চলাচলের সেরূপ ব্যাপকতা নাই বলিয়া উক্ত বন্দরগুলি আশানুরূপ সুখ্যাতি অর্জন করিতে পারে নাই।

কিন্তু বন্দরের গঠন ও উন্নতি পোতাশ্রয়, স্থলভাগের প্রশস্ততা ও পশ্চাৎভূমির উপর নির্ভর করে। উহাদের মধ্যে পশ্চাৎভূমির গুরুত্বই সর্বাধিক। কারণ মাল ও যাত্রীর ব্যাপকতা যাহার উপর বন্দরের উন্নতি ও প্রাধান্য নির্ভর করে উহা আবার পশ্চাৎভূমির সমৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। বন্দরের মাধ্যমে যে মাল বিদেশে রপ্তানি হয় উহা পশ্চাৎভূমি হইতেই আসিয়া থাকে। আবার যে মাল বন্দরের মাধ্যমে বিদেশ হইতে আমদানি হয় উহাও পশ্চাৎভূমিতেই বণ্টিত হয়। অনুরূপে যে লোক কোন বন্দর দিয়া আসে উহারা পশ্চাৎভূমিতেই বসবাস করিতে যায় এবং যে লোকজন বিদেশে যায় তাহারাও পশ্চাৎভূমি হইতে আসিয়া থাকে। সুতরাং পশ্চাৎভূমি যোগান ও চাহিদা এবং লোক চলাচলের উপর বন্দরের পণ্যের ও যাত্রীর প্রাচুর্য্য নির্ভর করে। পশ্চাৎভূমি বিস্তৃত হইলে, উহার লোকবসতি ঘন হইলে এবং বিবিধ প্রাকৃতিক ও শিল্প সম্পদে সমৃদ্ধ হইলে এবং উহাতে স্থলপথে, রেলপথে ও জলপথে যাতায়াতের ভাল বন্দোবস্ত থাকিলে পণ্য ও লোক চলাচল বৃদ্ধি পায়, পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং এইভাবে বন্দরের মাধ্যমে পণ্য ও লোক চলাচল বৃদ্ধি পাইয়া উহার উন্নতি ঘটায়। পশ্চাৎভূমি মরুময় হইলে, কিংবা লোকবসতি বিরল হইলে পণ্যের বা লোক চলাচলের কোনটার আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলে বন্দরেরও উন্নতি হয় না। সুতরাং পশ্চাৎভূমির আয়তন ও সমৃদ্ধির উপরই যে বন্দরের উন্নতি

ও প্রাধান্য একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। নিম্নে কয়েকটি বন্দরের বিবরণ দেওয়া হইল। বন্দরগুলির প্রাধান্য যে উহাদের পশ্চাৎভূমির সমৃদ্ধির জন্য উক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

(১) **লণ্ডন (London)ঃ** ইহা ইংলণ্ডের টেমস্ নদীর তীরে সমুদ্র হইতে ৫৫ মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত। ইহা স্বাভাবিক পোতাশ্রয়যুক্ত। স্থলভাগও বন্দর গঠনের পক্ষে প্রশস্ত। ইহার পশ্চাৎভূমি সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব ইংলণ্ড। এই অঞ্চলই ইংলণ্ডের কৃষি ও শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল। ইহার চারিপার্শ্বেও অনেক শিল্প কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। রেলপথ দ্বারা ইহা অভ্যন্তরের সহিত যুক্ত। লণ্ডন সহর পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ। ইহা ছাড়া ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ। সুতরাং এ অঞ্চলের শিল্প কারখানার জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রচুর কাঁচা মালের যেমন চাহিদা আবার শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিদেশে চালান দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও ততোধিক। ইহা ছাড়া খাদ্যশস্য প্রভৃতিও বিদেশ হইতে প্রচুর আমদানি হইয়া থাকে। ইহা ইংলণ্ডের রাজধানী। এজন্যও গুরুত্ব কম নয়। ফলে লণ্ডন বন্দর হিসাবে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। এ বন্দরটি এমন স্থলে অবস্থিত যে বিদেশ হইতে পণ্যাদি আমদানি করিয়া পুনঃরপ্তানিরও সুবিধা আছে। এই বন্দরের আমদানি দ্রব্যের মধ্যে গম, দুধ, মাখন, চা, পশম, তুলা, লৌহ, আকরিক, রবার, চিনি, কফি, মাংস প্রভৃতি এবং রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে যন্ত্রপাতি, কার্পাস ও পশম বস্ত্র, কাগজ, বিলাসদ্রব্য মোটরগাড়ী, রেলইঞ্জিন, ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(২) **নিউইয়র্ক (Newyork):** ইহা হাডসন নদীর মুখে ম্যানহাটন দ্বীপের উপর অবস্থিত স্বাভাবিক পোতাশ্রয়যুক্ত। এই বন্দরের পরিধি হাডসনের উভয় তীর, নিউজার্সি, ম্যানহাটন ও লং দ্বীপের উপর বিস্তৃত। ইহা অ্যাপালাশিয়ান পর্বতের পশ্চিমদিকস্থ দেশের অভ্যন্তর পর্যন্ত রেলপথ, স্থলপথ ও জলপথ দ্বারা যুক্ত। ফলে, ইহার পশ্চাৎভূমি বহুদূর পর্যন্ত। উক্ত পশ্চাৎভূমি সর্বপ্রকারেই সমৃদ্ধ ও ঘন বসতিপূর্ণ। এজন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক বাণিজ্যপণ্য এই বন্দর দিয়া চলাচল করে। ফলে বন্দরটি বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছে এবং এখন পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম বন্দর বলিয়া খ্যাত। ইহা ছাড়া বহুলোকের যাতায়াতের জন্যও ইহা প্রসিদ্ধ। বৈদ্যুতিক যন্ত্র, গম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, লৌহ, ইস্পাত, চামড়ার জিনিস প্রভৃতি এই বন্দর দিয়া রপ্তানি হয় এবং কাঁচামাল ও বিলাসদ্রব্য আমদানি হয়। এখানে আমদানিকৃত অনেক জিনিস আবার বিভিন্ন দেশে পুনঃরপ্তানিও হইয়া থাকে।

Q. 4. What do you understand by 'Enterpot'? Discuss the factors necessary for the development of such a port.

(পুনঃরপ্তানি বন্দর বলিতে কি বুঝ? এরূপ বন্দরের উন্নতি যে অবস্থার উপর নির্ভর করে উহার আলোচনা কর।)

Ans. যে বন্দর বিদেশ হইতে পণ্য আমদানি করিয়া উহা পুনরায় বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে তাহাকে **পুনঃরপ্তানি বন্দর** (Enterpot) বলে। সিঙ্গাপুর, লণ্ডন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য 'পুনঃরপ্তানি বন্দর'। বহু দূর দেশ হইতে এরূপ বন্দরে প্রচুর মাল আমদানি করা হয় এবং উক্ত মাল পুনরায় অল্প অল্প করিয়া নিকটস্থ বিভিন্ন দেশের মধ্যে বণ্টিত হয়। আবার বিভিন্ন দেশ হইতে অল্প অল্প মাল আমদানি করিয়া এরূপ বন্দরে জড় করা হয় এবং পরে প্রচুর পরিমাণে উক্ত মাল বিভিন্ন দেশে চালান দেওয়া হয়। মোটের উপর কথা—এরূপ বন্দর 'মধ্যস্থ' হিসাবে আমদানি-রপ্তানির কাজ সম্পন্ন করে। যে সমস্ত অবস্থার উপর পুনঃ-রপ্তানি বন্দরের উন্নতি ও গুরুত্ব নির্ভর করে নিম্নে উহা আলোচিত হইল ঃ

১) যে সমস্ত দেশ হইতে মাল আমদানি করা হয় বা যে সমস্ত দেশে মাল রপ্তানি করা হয় সে সমস্ত দেশের সহিত এরূপ বন্দরের জলপথে বা স্থলপথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকা আবশ্যক। সিঙ্গাপুর মালয় উপদ্বীপে অবস্থিত, কিন্তু রেলপথে মালয়, ইন্দোচীন, শ্যাম প্রভৃতি দেশের সহিত ইহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। আবার জলপথে পশ্চিম হইতে পূর্বে যাইতে হইলে এই বন্দর দ্বারস্বরূপ কাজ করিয়া থাকে। ফলে ইহার পক্ষে 'পুনঃরপ্তানি বন্দর' হিসাবে উন্নতিলাভ করার সুযোগ-সুবিধা ঘটিয়াছে। ইন্দোনেশিয়া, মালয়, শ্যাম, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশের মসলা, রবার, কফি, চা, টিন প্রভৃতি এই বন্দরে প্রথমতঃ আনীত হয় এবং এখান হইতে পরে অন্যান্য দেশে বিশেষতঃ ইউরোপে রপ্তানি করা হয়। অনুরূপে ইউরোপে ও অন্যান্য দেশ হইতে আমদানিকৃত শিল্পজাত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যাদি প্রথমতঃ এই বন্দরে আনীত হয় এবং তথা হইতে মালয়, ইন্দোনেশিয়া, শ্যাম, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে বণ্টিত হয়।

(২) এরূপ বন্দর পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হইলে ভাল হয়। তাহা হইলে প্রায় সকল দেশ হইতেই বা সকল দেশেই এই বন্দর মারফত মাল আমদানি ও রপ্তানি অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। লণ্ডন পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্দ্ধের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া এরূপ পুনঃরপ্তানি বন্দর হিসাবে খ্যাতিলাভ করিতে পারিয়াছে।

(৩) পশ্চাৎপদ দেশ বা ভাল বন্দরবিহীন দেশের নিকটবর্তী কোন বন্দর থাকিলে উক্ত বন্দর পুনঃ-রপ্তানি বন্দর হিসাবে বিশেষ উন্নতিলাভ করিবার সুযোগ

পায়। সিঙ্গাপুরের অবস্থান এরূপ হওয়ায় পুনঃ-রপ্তানি বন্দর হিসাবে ইহা এত উন্নত হইতে পারিয়াছে। মধ্য ইউরোপের অনেক দেশেই বন্দর নাই। এজন্য এল্‌ব নদীর তীরে অবস্থিত হামবুর্গ বন্দর পুনঃ-রপ্তানি বন্দর হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। মধ্য ইউরোপ হইতে আগত পণ্য বা ঐ দেশগুলির প্রয়োজনীয় পণ্যাদি এই বন্দর মারফত আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে।

(৪) রাজনৈতিক কারণেও পুনঃ-রপ্তানি বন্দর হিসাবে কোনও বন্দর খ্যাতিলাভ করিতে পারে। ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের জন্য লণ্ডন, আমষ্টারডাম প্রভৃতি বন্দর পুনঃ-রপ্তানি বন্দর হিসাবে খ্যাত। উপনিবেশের কাঁচামাল এখানে প্রথমে আনীত হয় এবং উপনিবেশে রপ্তানিযোগ্য মালও এই বন্দরে আনীত হইয়া রপ্তানি হইয়া থাকে।

(৫) বন্দরের প্রশস্ততা, মালের স্থায়িত্ব, ক্ষুদ্র আয়তন, মূল্যাধিক্য প্রভৃতির উপরও পুনঃরপ্তানি বন্দরের গুরুত্ব নির্ভর করে।

(৬) ব্যবসাক্ষেত্রে কোন দেশের খ্যাতি বেশী থাকিলে অনেক দেশ সেই দেশের বন্দর মারফত জিনিস আমদানি রপ্তানি করা সুবিধাজনক মনে করে। ইংলণ্ডের ব্যবসাজগতে সুনামের জন্য লণ্ডন বন্দরের এদিক দিয়া এত গুরুত্ব।

(৭) অল্প পরিমাণ মাল সরাসরি আমদানি-রপ্তানির অসুবিধা থাকিলেও এরূপ বন্দরের গুরুত্ব বাড়ে।

(৮) ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য মূলধনীয় প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, টাকা-পয়সা লেন-দেনের সুবিধা প্রভৃতির সুযোগ-সুবিধা যে বন্দরে বেশী থাকে সে বন্দরও এরূপ খ্যাতি অর্জন করিতে পারে।

Q. 5 Give a brief account of some of the important ports of the world.

(পৃথিবীর কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বন্দরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।)

Ans. নিম্নে পৃথিবীর কতকগুলির উল্লেখযোগ্য বন্দরের বিবরণ দেওয়া হইল :

(১) **লণ্ডন** (London) : see to answer of Q. 3

(২) **লিভারপুল** (Liverpool) : ইহা ইংলণ্ডের পশ্চিম উপকূলে মার্সে নদীর মোহনায় অবস্থিত। এই বন্দর পৃথিবীর বিভিন্ন বন্দরের সহিত জলপথে যুক্ত। ইহার পশ্চাৎভূমিও বিস্তৃত, নানাবিধ শিল্পজাত পণ্য দ্রব্য উৎপাদনে সমৃদ্ধ এবং ঘনবসতিপূর্ণ। জলপথে এখান হইতে 'ম্যানচেষ্টার সিপ ক্যানাল' দ্বারা অভ্যন্তরে ম্যানচেষ্টার পর্যন্ত যাতায়াত করা চলে। এই 'ক্যানাল' এই বন্দরের গুরুত্বও বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহা ছাড়া রেলপথেও ইহা অভ্যন্তরের বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যুক্ত।

ইহার পশ্চাৎভূমি সমগ্র ল্যাঙ্কাশায়ার, চেশায়ার, ষ্ট্যাফোর্ডশায়ার এমন কি উত্তর ওয়েলস পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সমস্ত অঞ্চল বয়ন, পশম, মৃৎ, রসায়ন, ইস্পাত প্রভৃতি শিল্পে এবং কয়লার খনিতে সমধিক প্রসিদ্ধ। এজন্য এই বন্দর বিদেশ হইতে কাঁচা মাল আমদানি এবং স্বদেশ হইতে শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহার পশ্চাৎভূমির বয়নশিল্পের উপযোগী তুলা আমেরিকা হইতে আমদানি করা অধিকতর সুবধাজনক। কার্পাস, গম, চামড়া, পশম, পাট, মাংস, তামাক প্রভৃতি ইহার আমদানি এবং কার্পাসজাত দ্রব্য, পশম বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

(৩) **ম্যানচেষ্টার** (Manchester): ইহা ইংলণ্ডের নদী বন্দর এবং শিল্প প্রধান স্থান। মার্সে নদীর উপনদী ইর্‌য়েল নদীর তীরে অবস্থিত এবং 'ম্যানচেষ্টার সিপ ক্যানাল' দ্বারাও লিভারপুলের সহিত সংযুক্ত। ইহা ছাড়া রেলপথেও যাতায়াতের সুবিধা আছে। ম্যানচেষ্টার বস্ত্রশিল্পের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। এজন্য অন্যান্য পণ্য অপেক্ষা কাঁচা তুলা আমদানি এবং কার্পাস বস্ত্রাদি রপ্তানিতেই ইহা বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

(৪) **সাউদাম্পটন** (Southamton): ইহা ইংলণ্ডের দক্ষিণতীরে ইংলিশ চ্যানালের তীরে অবস্থিত এবং শ্রেষ্ঠ যাত্রীবাহী বন্দর বলিয়া খ্যাত। এখানে নামিলে টেমস নদী পৌছিবার ১২ ঘণ্টা পূর্বে লণ্ডনে পৌছান যায় বলিয়া ইহা এরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। এজন্য ইহাকে লণ্ডনের বহির্বন্দরও বলা হয়। বন্দর হিসাবেও ইহার অনেক সুবিধা আছে। ইহার আকার অশ্বখুরাকৃতি এবং তীরভাগও অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এজন্য অল্প ব্যয়ে পোতাশ্রয় নির্মাণ সহজ হইয়াছে। 'কুইন মেরীর' মত বৃহত্তম যাত্রীবাহী জাহাজও এখানে অনায়াসে স্থান পাইয়া থাকে। দিনের অধিকাংশ সময়ে এখানে জোয়ারের সুবিধা আছে। ফলে অধিক সংখ্যায় জাহাজ যাতায়াত করিতে পারে। সমগ্র দক্ষিণ ইংলণ্ড ইহার পশ্চাৎভূমি। উহা পণ্য দ্রব্যে সমৃদ্ধ এবং ঘন বসতিপূর্ণ। ইহার প্রধান আমদানিদ্রব্যের মধ্যে ফল, ফুল, তুলা, গম, তরকারী, পশম, কাঠ, রবার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহার রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(৫) **গ্রীমসবি** (Grimsby): ইংলণ্ডের পূর্ব উপকূলে যাহার নদীর মোহনার নিকট অবস্থিত। ইহা উত্তর সাগরের মৎস্য শিকার কেন্দ্র ডগার ব্যাঙ্কের' সন্নিকটে। এজন্য মৎস্যবন্দর হিসাবে ইহার প্রসিদ্ধি আছে। ইহার পশ্চাৎভূমিও নানাবিধ

শিল্প কারখানায় পরিপূর্ণ। এখানে যে ডক ও জেটির ব্যবস্থা আছে তাহাতে নানা প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য ও মৎস্য অল্পব্যয়ে রপ্তানি হইয়া থাকে। বিভিন্নপ্রকার কাঁচামালও ইহা আমদানি করিয়া থাকে।

(৬) **হাল** (Hull): ইহা ইংলণ্ডের পূর্ব উপকূলে হাম্বার নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার পশ্চাৎভূমি শিল্পসমৃদ্ধ, ঘন বসতিপূর্ণ ও যাতায়াত ব্যবস্থায় উন্নত। খালের সাহায্যে ইহা লীডস্, ওয়েকফিল্ড ও সেফিল্ড প্রভৃতি সহরের সহিত যুক্ত। নানাদিক হইতে রাজপথ ও রেলপথ আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছে। ইহার নিকটে উত্তর সাগরের মৎসশিকার কেন্দ্র। এজন্য ইহা মৎস্য বন্দর হিসাবে প্রসিদ্ধ। ইহা পশম দ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, কার্পাসজাত দ্রব্য প্রভৃতি রপ্তানি করিয়া থাকে। সুইডেনের লৌহ আকরিক, ফিনল্যাণ্ডের কাঠ, ডেনমার্কের দুগ্ধজাত দ্রব্য, আর্জেন্টিনা ও অষ্ট্রেলিয়ার পশম, মাঞ্চুরিয়ার সয়াবীন ইত্যাদি ইহার উল্লেখযোগ্য আমদানি দ্রব্য।

(৭) **গ্লাসগো** (Glasgow): ইহা স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলে ক্লাইড নদীর মোহনায় অবস্থিত। ইহার পশ্চাৎভূমি স্কটল্যাণ্ডের প্রায় সমগ্র পশ্চিমাংশ এবং ক্লাইড নদীর অববাহিকা অঞ্চল ব্যাপিয়া বিস্তৃত। চারিদিকের পথ আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছে। ফলে, পূর্বে ইহা স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিমাঞ্চলের কৃষিজাত দ্রব্যের বাজার হিসাবে খ্যাতিলাভ করিলেও ক্লাইড নদীর গভীরতা এবং নিকটে আয়ারশায়ার, লানার্কশায়ার ও ফাইফশায়ারের কয়লাখনি থাকায় ইহা জাহাজ নির্মাণ ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া এখানে কার্পাস ও পশম শিল্পের কারখানাও প্রচুর আছে। ইহার রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিন, কার্পাস ও পশমজাত দ্রব্য প্রভৃতি এবং আমদানি দ্রব্যের মধ্যে লৌহ আকরিক, নানা প্রকার ধাতু, খাদ্যদ্রব্য, পশম, তূলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহা গ্রেটবৃটেনের দ্বিতীয় সহর এবং রপ্তানি বন্দর হিসাবে লণ্ডন ও লিভারপুলের পরেই ইহার স্থান। স্কটল্যাণ্ডের ¼ ভাগ লোক এই সহরে ও উহার উপকণ্ঠে বসবাস করিয়া থাকে।

(৮) **হামবুর্গ** (Humburg): ইহা এলব নদীর তীরে অবস্থিত পশ্চিম জার্মানীর বৃহত্তম বন্দর এবং সমুদ্র হইতে ৭০ মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত। ইহা নদীপথ এবং রেলপথের সঙ্গমস্থল। ইহা সারা বৎসর বরফমুক্ত থাকে। ইহা ছাড়া ইহার পশ্চাৎভূমির নদীগুলি খাল দ্বারা সংযুক্ত। ফলে সমগ্র এলব ও ওডার নদীর অববাহিকা অঞ্চল ইহার পশ্চাৎভূমির অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত, গম ভাঙ্গা, সাবান প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি ইহার উল্লেখযোগ্য শিল্প। চিনি, কফি,

কোকো, পশম, পাট, তূলা, লৌহ প্রভৃতি ইহার আমদানি দ্রব্য এবং বীটচিনি, দুগ্ধজাত দ্রব্য, লৌহ, ও ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্র, আলু, লবণ প্রভৃতি ইহার উল্লেখযোগ্য রপ্তানি দ্রব্য। নরওয়ে ও সুইডেনের পুন রপ্তানি বন্দর হিসাবেও ইহার প্রসিদ্ধি আছে।

৯) **অ্যান্টেয়ার্প (Antewerp) :** ইহা শেল্ড নদীর গভীর ও প্রশস্ত মোহনায় অবস্থিত বেলজিয়ামের বৃহত্তম বন্দর। ইহার পশ্চাৎভূমি বেলজিয়াম, পূর্ব ফ্রান্স, রাইন উপত্যকা ও রূঢ় অঞ্চল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং জার্মানী, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের প্রধানতম শিল্পাঞ্চলগুলিই ইহার পশ্চাৎভূমিব অন্তর্গত। এই পশ্চাৎভূমি রেলপথ, নদী ও খাল দ্বারা অ্যান্টেয়ার্পের সহিত সংযুক্ত। এরূপ অবস্থানের জন্য বন্দরটির সমৃদ্ধিলাভ অনায়াসেই সম্ভব হইয়াছে। ইহার প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে রূঢের কয়লা, পূর্ব ফ্রান্সের লৌহ, যন্ত্রপাতি, ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য ঔষধপত্র উল্লেখযোগ্য। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে গম, চা, পাট, তামাক, রবার, চিনি, কোকো, কফি, তূলা, পশম প্রভৃতি প্রধান। বৎসরে প্রায় আড়াই কোটি টন জাহাজ এই বন্দর মারফত যাতায়াত করিয়া থাকে।

(১০) **রটারডাম (Rotterdam) :** ইহা রাইন নদীর মুখে অবস্থিত হল্যাণ্ডের প্রধান বন্দর। 'নিউ ওয়াটারওয়ে' খাল দ্বারা এই বন্দরে পৌছাইতে হয়। এই বন্দর হইতে হানোভার হইয়া শীঘ্র বার্লিনে পৌছান যায়। এজন্য লণ্ডন হইতে বার্লিন যাইতে হইলে বহু লোক এই বন্দর দিয়া যায়। বিভিন্ন প্রকার কাঁচা মাল আমদানি এবং শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানিও ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইহার পশ্চাৎভূমি হল্যাণ্ড, জার্মানী ও সুইজারল্যাণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং নদী খাল ও রেলপথ দ্বারা উক্ত অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত। শিল্পাঞ্চলের সান্নিধ্য হেতু এই বন্দর বিশেষ উন্নত।

(১১) **জিব্রাল্টার (Gibraltar) :** স্পেনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ভূমধ্য-সাগরের প্রবেশমুখে ইহা অবস্থিত। ইহা বৃটিশ অধিকৃত রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও পোতাশ্রয় এবং জাহাজে কয়লা পাওয়ার স্থান। বন্দরটি একটি পার্বত্য অন্তরীপ। এখানে সৈন্য থাকার জন্য দুর্গও আছে। ইহারা ভূমধ্যসাগরে প্রবেশকারী এবং তথা হইতে বহির্গত জাহাজগুলির উপর দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। এজন্য ইহাকে ভূমধ্যসাগরের চাবি বলা হয়। বন্দর হিসাবে ইহা খুব উন্নত নহে। কারণ দেশের অভ্যন্তরে যাতায়াতের ভাল বন্দোবস্ত নাই।

(১২) **মার্সাই বা মারসেলস্ (Marseilles) :** ইহা রোন নদীর মোহনা হইতে কিছু দূরে দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত ফান্সের প্রধান বন্দর এবং দ্বিতীয় সহর। রোন নদীর অববাহিকা অঞ্চল ইহার প্রধান পশ্চাৎভূমি এবং জলপথে ও স্থলপথে

উহার সহিত সংযুক্ত। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্য যথা জলপাই, রেশমজাত দ্রব্য, মদ, তৈল প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য এবং পেট্রোল, শিল্পজাতদ্রব্য, চা, কফি, কোকো, তামাক প্রভৃতি আমদানি দ্রব্য। অন্যদিক দিয়াও ইহার গুরুত্ব আছে। ইহা ডাক জাহাজের একটি বড় ষ্টেশন। ইহা ছাড়া প্রাচ্য হইতে ইংলণ্ডগামী বহু যাত্রী এখানে নামিয়া ক্যালে হইয়া অল্প সময়ে লণ্ডনে পৌছাইয়া থাকে।

(১৩) **জেনোয়া** (Genoa): ইহা জেনোয়া উপসাগরের তীরে অবস্থিত ইতালির বন্দর। লম্বাডির পশ্চিম ভাগ ইহার স্বাভাবিক পশ্চাৎভূমি। কিন্তু সেণ্ট গদার্ড ও সিম্প্লন গিরিপথ নির্মিত হওয়ার পর ইহার পশ্চাৎভূমি সুইজারল্যাণ্ড ও দক্ষিণ জার্মানী পর্যন্ত বিস্তৃত। এজন্য ইহার পশ্চাৎভূমি কৃষি ও শিল্পসমৃদ্ধ। চিনি, কফি, কোকো, চা, রবার, গম, পশম প্রভৃতি ইহার প্রধান আমদানি দ্রব্য। লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, কার্পাস, পশম বস্ত্র ও রেশম, জলপাই তৈল হইতে প্রস্তুত সাবান প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য।

(১৪) **ট্রিয়েষ্টি** (Trieste): ইহা ইটালি ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যবর্তী আড্রিয়াটিক সাগরের উত্তর-পূর্ব অংশে অশ্বখুরাকৃতি ট্রিয়েষ্টি উপসাগরের তীরে অবস্থিত। ইহা উক্ত উভয় দেশেরই বন্দর। এই বন্দর রেলপথ দ্বারা মধ্য ইউরোপের সহিত সংযুক্ত। ফলে ইতালি, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও যুগোশ্লাভিয়া ইহার পশ্চাৎভূমির অন্তর্গত। বন্দরের অবস্থানও সুন্দর। এজন্য মধ্য ইউরোপের রপ্তানি ও আমদানি যোগ্য পণ্যের অনেকাংশ এই বন্দর মারফত চলাচল করিয়া থাকে।

(১৫) **ডানজিগ** (Danzig): ইহা বল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত পোলাণ্ডের বন্দর। এই সাগরের তীরে অবস্থিত বন্দরগুলির মধ্যে ইহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইহা শীতকালে বরফাবৃত থাকে। ইহার রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে বীট চিনি, কয়লা, কাঠ, লৌহ, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে সুইডেন হইতে লৌহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া শিল্পের অন্যান্য কাঁচামাল, চা, কফি প্রভৃতি আমদানি করে।

(১৬) **মুরমানস্ক** (Murmansk): ইহা কোলা উপদ্বীপ অবস্থিত রাশিয়ার উত্তর দিকের একমাত্র বরফমুক্ত বন্দর। ইহার সাহায্যে রাশিয়া আটলাণ্টিক পথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া বরফভাঙ্গা জাহাজের সাহায্যে সাইবেরিয়ার উত্তরাংশের সহিত গ্রীষ্মকালে এই বন্দর মারফত বাণিজ্য চলিয়া থাকে। ইহা লেনিনগ্রাডের সহিত রেলপথে সংযুক্ত। কাঠ, কাঠের মণ্ড, লোম, চামড়ার জিনিস, পশম বস্ত্র প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য।

(১৭) **মস্কো** (Moscow): মাসকোভা নদীর তীরে অবস্থিত রাশিয়ার

রাজধানী এবং লৌহ ও ইস্পাত, বিমানপোত, যন্ত্রপাতি, কার্পাস প্রভৃতি শিল্পের জন্য বিখ্যাত। ইহা একটি বড় রেলওয়ে ষ্টেশনও।

(১৮) **লেলিনগ্রাড** (Leningrad) : বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত রাশিয়ার উল্লেখযোগ্য বন্দর এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও কাষ্ঠ ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত।

(১৯ **ম্যাগনিটোগরস্ক** (Magnitogorsk) : উরাল অঞ্চলে অবস্থিত কারাগাণ্ডার কয়লা ও ম্যাগনেট পর্বতের লৌহকে ভিত্তি করিয়া বিরাট লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিযা আছে।

(২০) **আলেকজান্দ্রিয়া** (Alexandria) : নীল নদীর বদ্বীপে অবস্থিত মিশরের প্রধান বন্দর। ইহা মিশরের শতকরা ৮০ ভাগ রপ্তানি পণ্যের বিদেশে পাঠাইবার পথ। প্রধান রপ্তানি দ্রব্যেব মধ্যে তুলা। ইহা ছাড়া জলপাই রেশম, চাউল ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য বপ্তানিদ্রব্য। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে কয়লা, যন্ত্রপাতি, ঔষধ, রাসাযনিক দ্রব্য, গম, কাঠ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(২১ **কাইরো** (Cairo) : ইহা মিশরেব রাজধানী, ব্যবসাকেন্দ্র, শিক্ষাকেন্দ্র ও বিমানপোত ষ্টেশন।

(২২) **ডারবান** (Durban) : ইহা দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত নাটালের বন্দর এবং এ অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দব। ইহাব পোতাশ্রয় উৎকৃষ্ট। সমগ্র নাটালের মালভূমি ইহার পশ্চাৎভূমি। কয়লা, স্বর্ণ, তামা, গম চাউল পশম মাংস প্রভৃতি রপ্তানি দ্রব্য। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে চিনি, কার্পাস বস্ত্র, যন্ত্রপাতি ও লৌহ দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, মোটরগাড়ী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(২৩) **কেপটাউন** (Capetown) : দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদেশের রাজধানী ও প্রধান বন্দব। ইহার টেবল উপসাগর জাহাজের নিরাপদ অবস্থানের উপযুক্ত স্থান। ইউরোপ হইতে আফ্রিকা ঘুরিয়া আসার পথে ইহা আফ্রিকার দক্ষিণের বন্দর। ইহা একটি বড় রেলষ্টেশনও বটে। কয়লা, স্বর্ণ, হীরক, পশম, গম, মাংস, ফল প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে কার্পাস, বস্ত্র, চিনি, ঔষধ, লৌহ দ্রব্য, মোটর গাড়ী, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি প্রধান।

(২৪) **এডেন** (Aden) : ইহা আরবের দক্ষিণ পশ্চিমে বৃটিশ অধিকৃত বন্দর। সুয়েজ পথ দিয়া যাতায়াতকারী জাহাজের ইহা একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর। ইহার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে কফি এবং আমদানি দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যশস্য ও শিল্পজাত দ্রব্য।

(২৫) **করাচী** (Karachi) : সিন্ধুনদের মোহনায় অবস্থিত পাকিস্তানের

রাজধানী ও সর্বপ্রধান বন্দর। এই বন্দর মারফত পাকিস্তানের গম, তুলা, চাউল, ছোলা, তৈলবীজ, পশম, চামড়া, খনিজ লবণ, পশুর হাড় প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি হয়। ইহার আমদানিকৃত দ্রব্যের মধ্যে কার্পাস ও পশমজাত দ্রব্য, চিনি, কয়লা, খনিজ তৈল, লৌহজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, মোটর গাড়ী ও রেল ইঞ্জিন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান ইহার পশ্চাৎভূমি। ইহা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরও বটে।

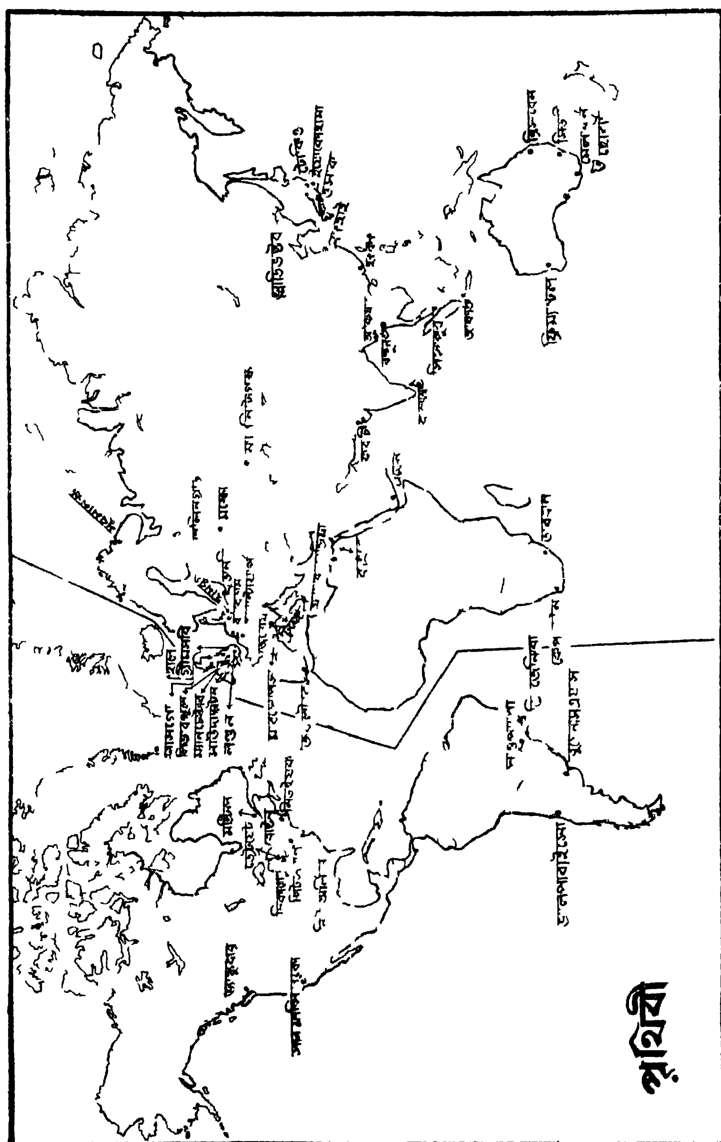
(২৬) কলম্বো (Colombo): ইহা সিংহলের রাজধানী ও প্রধান বন্দর। ইহা একটি পুনঃরপ্তানি বন্দর। পূর্ব ও পশ্চিমগামী জাহাজগুলির ইহা একটি কয়লা লওয়ার স্থান। ইহার প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে চা, নারিকেল, নারিকেল তৈল, রবার কফি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার প্রধান আমদানি দ্রব্যের মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যাদি, চাউল, তূলা ও তূলাজাত দ্রব্য, চিনি, কয়লা ও নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য উল্লেখযোগ্য। ইহার বন্দরটি কৃত্রিম হইলেও ইহা তরঙ্গবিহীন শান্ত জলরাশির দ্বারা বেষ্টিত।

(২৭) আকিয়াব (Akyab): ব্রহ্মদেশের পশ্চিম উপকূলের ইহা প্রধান বন্দর। ইহার সুন্দর পোতাশ্রয় আছে। পশ্চাৎভূমি খুব বিস্তৃত না হইলেও অত্যন্ত উর্বর। ধান্য উৎপাদনে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এজন্য চাউলই ইহার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য।

(২৮) রেঙ্গুন Rangoon): ইহা ব্রহ্মদেশের রাজধানী, প্রধান বন্দর এবং রেঙ্গুন নদীর তীরে সমুদ্র হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা ব্রহ্মদেশের প্রধান শিল্পাঞ্চলও বটে। ইহার পশ্চাৎভূমি সমগ্র দক্ষিণ ব্রহ্ম ব্যাপিয়া বিস্তৃত। ইহার রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে চাউল, কাঠ, খনিজ তৈল, মূল্যবান প্রস্তর প্রভৃতি এবং প্রধান আমদানি দ্রব্যের মধ্যে কার্পাসজাত দ্রব্য চিনি, কয়লা, মোটর গাড়ী যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য উল্লেখযোগ্য।

(২৯) সিঙ্গাপুর (Singapore): ইহা মালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য পুনঃরপ্তানি বন্দর। ইহা পৃথিবীর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বন্দর হিসাবেই খ্যাতিলাভ করিয়াছে। কারণ এখান হইতে সমুদ্রগামী জাহাজ ও বিমানপোত নানাদিকে যাতায়াত করিয়া থাকে। ইহার প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে রবার, টিন, তাম্র, নারিকেল, কলা, কমলা, আনারস প্রভৃতি এবং প্রধান আমদানির মধ্যে খনিজ তৈল, কয়লা, তামাক, লৌহজাত দ্রব্য, মোটর গাড়ী, চিনি, দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(৩০) হংকং (Hongkong): ক্যান্টন নদীর তীরে চীনের দক্ষিণে ইহা বৃটিশ অধিকৃত দ্বীপ-বন্দর। সমগ্র সিকিয়াং নদীর অববাহিকা ও দক্ষিণ চীন ইহার


পৃথিবী

পশ্চাৎভূমি। বন্দরটি একটি ক্ষুদ্র উপসাগরের তীরে অবস্থিত। ইহার পোতাশ্রয় স্বাভাবিক, বেশ প্রশস্ত ও গভীর জলযুক্ত। ইহা একটি জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রও বটে। ইদানিং লৌহ ও কার্পাস শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে। বন্দরটি বৈদেশিক বাণিজ্য ও পুনঃরপ্তানি বন্দর হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইহার প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে চাউল, চিনি, রেশম ও রেশমজাত দ্রব্য ও তূলাজাত দ্রব্য, তুলা, চা, কয়লা, চামড়া, গম ও আফিম এবং প্রধান আমদানি দ্রব্যের মধ্যে পশমজাত দ্রব্য, পাটজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ী ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য উল্লেখযোগ্য।

(৩১) সাংহাই (Sanghai): ইহা চীনের সবচেয়ে বড় সহর ও সর্বপ্রধান বন্দর, ইয়াংসিকিয়াং নদীর মোহনায় অবস্থিত এবং উর্বর ও নানাবিধ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ইয়াংসিকিয়াং অববাহিকা ইহার পশ্চাৎভূমি। ইহা একটি শিল্পপ্রধান সহরও এবং এখানে ইঞ্জিনীয়ারিং, কার্পাস, রেশম, জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে কার্পাস ও কার্পাসজাত দ্রব্য, রেশম ও রেশমজাত দ্রব্য, চা, তামাক, আফিং, চাউল, সয়াবীন প্রভৃতি এবং আমদানিকৃত দ্রব্যের মধ্যে লৌহ, ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, খনিজ তৈল, মোটরগাড়ী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(৩২) জাকার্তা (Djakarta): ইহা ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী, প্রধান বন্দর ও পুনঃরপ্তানি কেন্দ্র। রবার, তামাক, সিঙ্কোনা, মরিচ, চা, কফি, নারিকেল, টোপিওকা, চিনি প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য। চাউল, কার্পাসজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি ও নানাবিধ শিল্পজাত পণ্য ইহার আমদানি দ্রব্য।

(৩৩) ইয়োকোহামা (Yokohama): ইহা হনসু দ্বীপে অবস্থিত জাপানের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বন্দর। ইহা একটি শিল্পপ্রধান অঞ্চলও এবং এখানকার জাহাজ নির্মাণ শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কার্পাস শিল্প, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কার্পাসজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, খেলনা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ইস্পাত দ্রব্য প্রভৃতি এই বন্দর দিয়া রপ্তানি হইয়া থাকে। লৌহ আকরিক, লৌহ পিণ্ড, নানাবিধ পণ্যদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, খনিজ তৈল, মোটরগাড়ী প্রভৃতি ইহা আমদানি করিয়া থাকে।

(৩৪) ওসাকা (Osaka): ইহা হনসু দ্বীপে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে জাপানের একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্র। ইহা একটি শিল্পপ্রধান অঞ্চলও। এখানকার লোকসংখ্যাও কম নয়; প্রায় ৪০ লক্ষ। এখানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কাগজ শিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ইহার বিশেষ খ্যাতি কার্পাস শিল্পের জন্য। এজন্য ইহাকে জাপানের 'ম্যানচেষ্টার' বলা হয়। ইহার রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে কার্পাসজাত

দ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাতজাত দ্রব্য, কাগজ, খেলনা ও নানাবিধ যন্ত্রপাতি এবং আমদানি দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যশস্য, তুলা অন্যান্য কাঁচামাল উল্লেখযোগ্য।

(৩৫) টোকিও (Tokyo): ইহা হনসু দ্বীপের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত জাপানের রাজধানী ও শিল্পপ্রধান সহর। ইহা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ সহর এবং ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৭৫ লক্ষ। ইহার বন্দর খুব গভীর নয়। এজন্য ইয়োকোহামা ইহার বহির্বন্দরের কাজ করে। এখানকার শিল্পগুলির মধ্যে ইঞ্জিনীয়ারিং, কার্পাস, রেশম, লৌহ ও ইস্পাত, মুদ্রণ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি, খেলনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহা প্রধানতঃ ইহার শিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করে এবং লৌহ আকরিক, লবণ, তূলা, খাদ্যশস্য প্রভৃতি আমদানি করিয়া থাকে।

(৩৬) সিডনি (Sydney): ইহা অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে অবস্থিত নিউ সাউথ ওয়েলসের রাজধানী, উল্লেখযোগ্য বন্দর এবং একটি শিল্পপ্রধান সহর হিসাবেও বিখ্যাত। ইহার পোতাশ্রয় খুব সুন্দর এবং পশ্চাৎভূমি বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং রেলপথ দ্বারা যুক্ত। ইহার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য হইতেছে পশম, মাংস, গম, ফল, মাখন ও অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং প্রধান আমদানি দ্রব্যের মধ্যে কার্পাস ও পাটজাত দ্রব্য, চা, রেশম ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য উল্লেখযোগ্য।

(৩৭) মেলবোর্ণ (Melborne): ইহা অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত ভিক্টোরিয়ার রাজধানী। ইহা ছাড়া ইহা বন্দর, শিল্পাঞ্চল ও বিমানঘাঁটির জন্য প্রসিদ্ধ। ইহার সুন্দর পোতাশ্রয় ও সুবিস্তৃত পশ্চাৎভূমি বর্তমান। ইহার প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে পশম, মাংস, গম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, স্বর্ণ প্রভৃতি এবং আমদানি দ্রব্যের মধ্যে কার্পাসজাত ও পাটজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ী, চা, কফি প্রভৃতি প্রধান।

(৩৮) ব্রিসবেন (Brisbane): ইহা অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে কুইন্সল্যাণ্ডের রাজধানী ও প্রধান বন্দর। পশম, মাংস, চামড়া, ফল, দুগ্ধজাত দ্রব্য, চিনি, স্বর্ণ, তামা প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য। যন্ত্রপাতি, শিল্পজাত দ্রব্য, কার্পাসজাত দ্রব্য, পাটজাত দ্রব্য, চা, কফি প্রভৃতি ইহার আমদানি দ্রব্য।

(৩৯) ফ্রিম্যাণ্টল (Freemantle): ইহা পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান বন্দর এবং উহার রাজধানী পার্থ (Perth) হইতে প্রায় ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। গম, ময়দা, পশম, স্বর্ণ, কাঠ প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য। চা, কফি, কার্পাসজাত দ্রব্য, পাটজাত দ্রব্য এবং নানাবিধ যন্ত্রপাতি, ঔষধ ও শিল্পজাত দ্রব্য ইহার আমদানি দ্রব্য।

(৪০) হোবার্ট (Hobart): ইহা তাসমানিয়ার রাজধানী ও প্রধান বন্দর।

ইহার পোতাশ্রয়টি বেশ সুন্দর। পশম, স্বর্ণ, টিন, রৌপ্য, কাঠ, ফল, খাদ্যশস্য প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য। তুলাজাত দ্রব্য, পাটজাত দ্রব্য, চা, কফি ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য ইহার প্রধান আমদানি দ্রব্য।

(৪১) নিউইয়র্ক (Newyork): পূর্ব উপকূলে হাডসন নদীর মোহনায় অবস্থিত ইহা যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম বন্দর এবং পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর। ইহার পোতাশ্রয় বৃহৎ। এজন্য বর্তমান কালের বড বড জাহাজও অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের মোট বাণিজ্য পণ্যের প্রায় অর্ধেক এই বন্দর দিয়া আমদানি ও রপ্তানি হইয়া থাকে। ইহার পশ্চাৎভূমি পেনসেলভেনিয়া ও বৃহৎ হ্রদ গুলির শিল্পাঞ্চল ও কৃষি অঞ্চল ব্যাপিয়া বিস্তৃত। গম ভূট্টা কার্পাস ও কার্পাসজাত-দ্রব্য, মাংস দুগ্ধজাতদ্রব্য চর্ম নির্মিত দ্রব্য, লৌহ, ইস্পাত, বৈদ্যুতিক যন্ত্র, রেল ইঞ্জিন, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য। চা, কফি, টিন, রবার, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, চিনি, নানাবিধ সৌখিন দ্রব্য প্রভৃতি ইহার আমদানি দ্রব্য।

(৪২) বোষ্টন (Boston): ইহা পূর্ব উপকূলে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রে নিউ ইংলণ্ড রাজ্যের প্রধান বন্দর। ইহার পোতাশ্রয়টি অতি সুন্দর এবং বন্দরটি পশ্চাৎ ভূমির সহিত রেলপথ দ্বারা যুক্ত। ইহা ইউরোপের নিকটতম বন্দর। কার্পাসজাত দ্রব্য, চিনি, কাগজ, মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য। চামড়া, তুলা, পশম, চা, কাফ, টিন, রবার, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র প্রভৃতি ইহার আমদানি দ্রব্য।

(৪৩) চিকাগো (Chicago): মিচিগান হ্রদের দক্ষিণে অবস্থিত ইহা যুক্ত রাষ্ট্রের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। হ্রদগুলি ইহার যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম করিয়াছে। ইহা ছাডা রেলপথ দ্বারা ইহা বিভিন্ন অংশের সহিত যুক্ত। ইহা লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। তামা ছাডা অন্যান্য শিল্পও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। রপ্তানির মধ্যে গম ও মাংস বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৪৪) পিটসবার্গ (Pittsbrurg): পেনসেলভনিয়ার কয়লা ক্ষেত্র অঞ্চলে অবস্থিত ইহা যুক্তরাষ্টের বিশেষ উল্লেখযোগ্য লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র।

(৪৫) ডেট্রেয়েট (Detroit): ইহা যুক্তরাষ্ট্রের মোটর গাডী শিল্পের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। বিখ্যাত ফোর্ড মোটর কোম্পানি এখানেই অবস্থিত।

(৪৬) নিউঅর্লিয়েন্স (Now Orleans): মিসিসিপিনদীর মোহনায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের বন্দরগুলির অন্যতম। ইহার পশ্চাৎভূমি প্রধানতঃ মিসিসিপি নদীর অববাহিকার কৃষিঅঞ্চল। তুলা, খনিজ তৈল, কাঠ, গম, মাংস, চিনি,

চাউল প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য। চা, কফি, রেশম ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য ইহার আমদানি দ্রব্য।

(৪৭) **স্যানফ্রান্সিসকো** (**Sanfrancisco**): ইহা যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে কালিফোর্নিয়ার রাজধানী ও প্রধান বন্দর। বন্দরটি সানফ্রান্সিস্কো উপসাগরের তীরে অবস্থিত ও স্বাভাবিক পোতাশ্রয়যুক্ত। চীন, জাপান প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলের দেশগুলির সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে ইহা গুরুত্ব পূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। গম, যব, ফল, কাঠ, খনিজ তৈল, স্বর্ণ প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য। চা, কফি, রেশম, চিনি, এবং নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য ইহার আমদানি দ্রব্য।

(৪৮) **মন্ট্রিল** (**Montreal**): সমুদ্র হইতে ১০০ মাইল অভ্যন্তরে সেণ্টলরেন্স নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা কানাডার বৃহত্তম নগর ও প্রধান বন্দর। ইহার সুন্দর পোতাশ্রয় আছে বটে, কিন্তু শীতকালে সেণ্টলরেন্স বরফাবৃত হইয়া পড়ে বলিয়া উক্ত সময়ে পণ্য চলাচল বন্ধ থাকে। ইহার পশ্চাৎভূমি কৃষি ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। গম, ময়দা, ভুট্টা, নিকেল, রৌপ্য, তামা, কাষ্ঠ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য। যন্ত্রপাতি, কার্পাসজাত দ্রব্য, পশমজাত দ্রব্য, পাটজাত দ্রব্য, চা, কফি, রেশম, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি ইহার আমদানি দ্রব্য।

(৪৯) **ভাঙ্কুবার** (**Vancouver**): প্রশান্ত মহাসাগরে উপকূলে ভাঙ্কুবার দ্বীপের আড়ালে অবস্থিত ইহা কানাডার পশ্চিম উপকূলের প্রধান বন্দর। ইহা একটি উল্লেখযোগ্য রেলষ্টেশন। ইহার পশ্চাৎভূমি প্রেয়ারী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। মাছ, তামা, রৌপ্য, কাগজ, গম, কাঠ প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য। লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, চিনি কার্পাসজাত দ্রব্য, পশম দ্রব্য, চা, কফি, পাটজাত দ্রব্য প্রভৃতি ইহার আমদানি দ্রব্য। চীন, জাপান, হাওয়াই প্রভৃতির সহিত কানাডার যোগাযোগ এই বন্দর মারফতই প্রধানতঃ হইয়া থাকে।

(৫০) **রিও ডি জেনেরো** (**Rio de-Janeiro**): ইহা দক্ষিণ আমেরিকার আটলাণ্টিক উপকূলে অবস্থিত ব্রেজিলের রাজধানী ও প্রধান বন্দর। ইহার পোতাশ্রয় বেশ বিস্তৃত এবং শান্ত। ইহার পশ্চাৎভূমি সাওপালো, মিনাস জেরিস ট্রাভেশিয়া প্রভৃতি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কফি, কোকো, রবার তামাক, চামড়া, ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ আকরিক প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য। কয়লা কার্পাসজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য ইহার আমদানি দ্রব্য।

(৫১) **বুয়েনোস আয়ারেস** (**Buenos Aires**): লা প্লাটা নদীর তীরে অবস্থিত ইহা দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেণ্টিনার রাজধানী এবং প্রধান বন্দর। বিস্তৃত পাম্পাস অঞ্চল ইহার পশ্চাৎভূমি। উক্ত পশ্চাৎভূমির সহিত ইহা রেলপথ দ্বারা যুক্ত।

গম, ভূট্টা, যব, তৈলবীজ, মাংস, দুগ্ধ, পশম প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য। কয়লা, কার্পাস দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, খনিজ তৈল পাটজাত দ্রব্য চা, কফি, প্রভৃতি ইহার আমদানি দ্রব্য। ইহার বাণিজ্য সম্পর্ক ইউরোপের সহিতই বেশী।

(৫২) সাওপালো (Sao Paulo) : ইহা ব্রেজিলের কফি উৎপাদক অঞ্চলে অবস্থিত এবং পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ কফি এখানেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কফি উৎপাদনের উপযোগী জলবায়ু ও উৎকৃষ্ট মৃত্তিকার অবস্থান হেতুই বিশেষতঃ ইহা সম্ভব হইয়াছে।

(৫৩) ভলপ্যারাইসো (Val Paraiso) : ইহা প্রশান্তমহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত দক্ষিণ আমেরিকার চিলির প্রধান বন্দর। ইহার পশ্চাৎভূমি চিলির খনিজ ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। উপসাগরের তীরে অবস্থিত ইহা সুন্দর পোতাশ্রয় যুক্ত। আর্জেন্টিনার সহিত ইহা আবার রেলপথ দ্বারা যুক্ত। নাইট্রেট, তামা, রৌপ্য, স্বর্ণ, পশম, গম, ফল প্রভৃতি ইহার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। কার্পাসদ্রব্য, চা, কফি, যন্ত্রপাতি ও নানাবিধ দ্রব্য ইহার রপ্তানি দ্রব্য।

(৫৪) ভ্লাডিভস্টক (Vladivostok) ইহা প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে সাইবেরিয়ার বন্দর। মস্কো হইতে ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ এখানে শেষ হইয়াছে। সাইবেরিয়ার কাঠ, খনিজ দ্রব্য, মাঞ্চুরিয়ার সয়াবীন প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য। জাপান হইতে নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য এখানে আমদানি হইয়া থাকে।

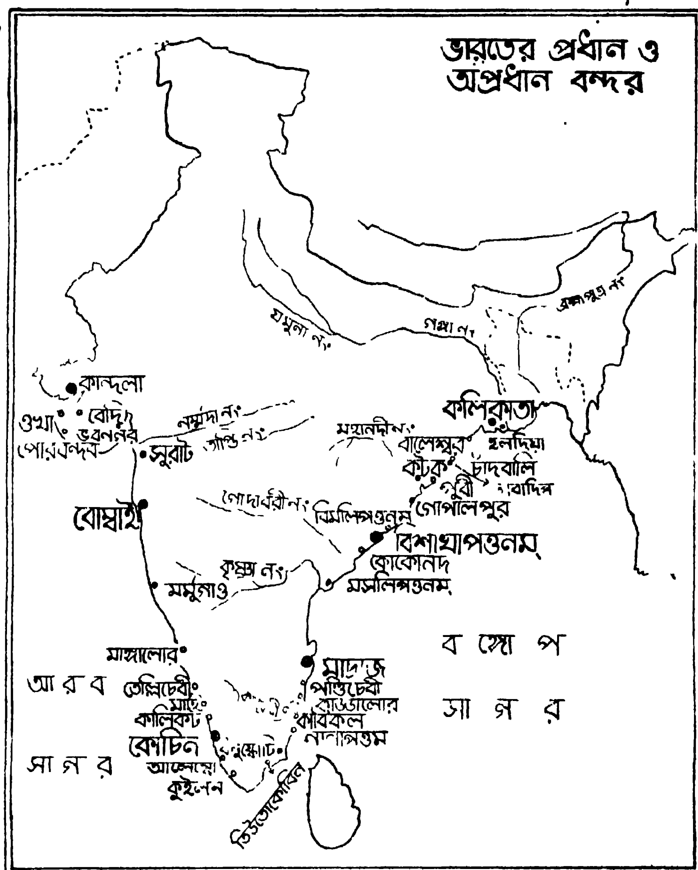
Q. 6. What are major and minor ports in India? Give some examples of each. What steps are proposed to be taken for the development of the port of India? (C. U. Inter 1952)

(ভারতের বড় বা প্রধান বন্দর ও ছোট বা অপ্রধান বন্দর কাহাকে বলে? উহাদের কতকগুলি উদাহরণ দাও। বন্দরের উন্নতির জন্য কি ব্যবস্থা করার প্রস্তাব চলিতেছে?

Ans : ভারত তিন দিকে সমুদ্র বেষ্টিত। ইহার উপকূলের দৈর্ঘ্য ৩০০০ মাইলের উপরে। কিন্তু উপকূল রেখা মোটের উপর অভগ্ন। ইহা ছাড়া পশ্চিম উপকূল মৌসুমী বায়ু তাড়িত এবং পূর্ব উপকূল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ। ফলে উপকূলে ভাল ও বড় বন্দরের সংখ্যা খুব কম। যে সমস্ত বন্দর বড় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে খ্যাতিসম্পন্ন উহাদিগকে বড বা প্রধান বন্দর (major port) আখ্যা দেওয়া হয়। কান্দলা, বোম্বাই, কোচিন, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তম ও কলিকাতা ভারতের প্রধান বন্দরের পর্য্যায়ে পড়ে।

যে সমস্ত বন্দরগুলিতে পণ্য চলাচল কম, উপকূল বাণিজ্যই বেশী চলে এবং বন্দরের

ভাল ব্যবস্থা না থাকায় সারা বৎসর পণ্য চলাচল বিঘ্নিত হয় সেইগুলিকে ছোট বন্দর বা অপ্রধান (minor port) আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। ভারতে এরূপ বন্দরের সংখ্যা প্রায় ১৫০টি। উহাদের মধ্যে ওখা, পোরবন্দর, মার্মোগোয়া, ম্যাঙ্গালোর,



কানানোড়, কোজ্জিকোড, আলেপ্পী, কুইলন, ত্রিবান্দ্রম, নেগাপত্তনম, ক্যারিকল, কুদ্দালোর, পণ্ডিচেরী, মসলিপত্তনম্, তুতিকোরিন, কোকোনদ, গঞ্জাম, পুরী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ভারত বিভক্ত হওয়ার পূর্বে করাচী ভারতের একটি প্রধান বন্দর ছিল। করাচী বন্দর পাকিস্থানে যাওয়ায় উহার ক্ষতিপূরণের জন্য ভারত সরকার কান্দলায় একটি প্রধান বন্দর নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণতও হইয়াছে। এখন কান্দলা ভারতের একটি প্রধান বন্দর বলিয়া পরিগণিত। ইহা ছাড়া অন্যান্য বন্দরগুলির উন্নতির জন্যও ভারত সরকার বিশেষ সচেষ্ট। বন্দরের উন্নতির সহিত ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থ নৈতিক উন্নতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তাই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বন্দরের উন্নতির জন্য টাকার সংস্থান করা হইয়াছে এবং বন্দরের উন্নতির জন্য যে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, জেটি, গুদাম, আয়তন বৃদ্ধি প্রভৃতির প্রয়োজন সে সম্বন্ধে অবহিত আছে এবং তদনুযায়ী কার্য্যসূচী গৃহীত হইয়াছে।

Q 7. Give a brief account of the major ports of India stating their Hinterlands and the nature of the trade passing through them.

(পশ্চাৎভূমি এবং বাণিজ্যের প্রকৃতি উল্লেখ করিয়া ভারতের প্রধান বন্দরগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও)।

Or

Describe the Hinterland of two major ports of the Indian Union and state the nature of the trade passing through the ports so selected- **(C. U. Inter. 1961)**

(ভারত যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি প্রধান বন্দরের পশ্চাৎভূমি বর্ণনা কর এবং উহাদের বাণিজ্যের প্রকৃতি উল্লেখ কর)।

Ans. কোন একটি বন্দর মারফত কোনও অঞ্চলের উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশে চালান হইলে এবং বিদেশ হইতে উক্ত অঞ্চলের প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানী হইলে ঐ অঞ্চলটি উক্ত বন্দরের পশ্চাৎভূমি বলিয়া পরিগণিত হয়। অবশ্য কোনও বন্দরের পশ্চাৎভূমির সুনির্দিষ্ট সীমা স্থির করা চলে না। কারণ উক্ত অঞ্চল একাধিক বন্দরের পশ্চাৎভূমি হইতে পারে। যেমন উত্তরপ্রদেশ কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় বন্দরেরই পশ্চাৎভূমি। সে যাহাই হউক মোটামুটিভাবে আমদানি-রপ্তানির গন্তব্যস্থল লক্ষ্য করিয়া পশ্চাৎভূমির সীমা নির্দেশ করা হয়। ভারতের প্রধান বন্দরগুলির পশ্চাৎভূমি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রকৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(১) কলিকাতা (Calcutta) : ইহা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী এবং ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। ইহা সমুদ্রতীরে অবস্থিত নহে। সমুদ্র হইতে প্রায় ১০০

মাইল অভ্যন্তরে হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা সমুদ্র বন্দর না হইলেও সমুদ্র বন্দরের মতই এখানে কাজকর্ম চলিয়া থাকে এবং নদীর অগভীরতা সত্ত্বেও বড় বড় জাহাজ অভিজ্ঞ পাইলট সাহায্যে বন্দর পর্যন্ত যাতায়াত করিয়া থাকে।

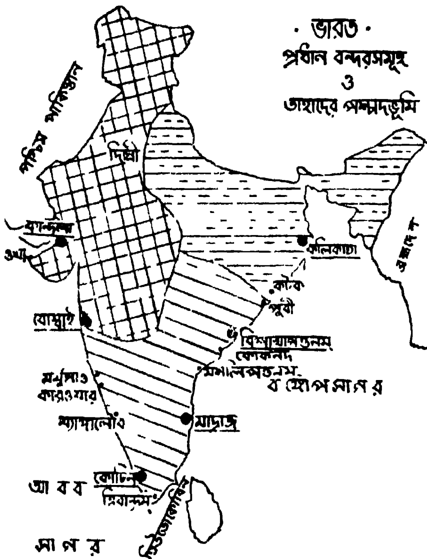
ইহার পশ্চাৎভূমি আসাম পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত। এ অঞ্চলে ধান, পাট, ইক্ষু, চা, তামাক, লাক্ষা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, লৌহ, বক্সাইট প্রভৃতি খনিজ সম্পদেও ইহা সমৃদ্ধ। কার্পাস, লৌহ ও ইস্পাত, পাট, কাগজ, চর্ম, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি শিল্পও এখানে বিশেষ উন্নত। লোকসংখ্যা ঘন। রেলপথ, জলপথ ও স্থলপথে পশ্চাৎভূমির সহিত বন্দরের যোগাযোগ আছে। এ অঞ্চলের চাহিদা ও উদ্বৃত্ত পণ্যের প্রাচুর্য্য আছে। এজন্য বন্দর মারফত বহু পণ্য আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে। পাটজাত দ্রব্য চা বস্ত্রাদি, চর্ম, ঢালাই লৌহ, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, লাক্ষা, প্রভৃতি এই বন্দর দিয়া বিদেশে রপ্তানি হয়। কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্র, লবণ, কাগজ, তুলা, খাদ্যশস্য, খনিজ তৈল প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে এই বন্দর দিয়া আমদানি হইয়া থাকে। সুতরাং কলিকাতা বন্দর পৃথিবীর এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দরগুলির অন্যতম।

২ বিশাখাপত্তনম (Vishakhapatnam): ইহা বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত অন্ধ্রের প্রধান বন্দর। এই বন্দরটি পর্বতের আড়ালে অবস্থিত এবং সমুদ্র পার্বত্য অঞ্চল ব্যাপিয়া বিস্তৃত। এজন্য ইহার পোতাশ্রয় সুন্দর ও স্বাভাবিক। এই বন্দরের পশ্চাৎভূমি অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্রের পূর্বাংশ, মধ্য প্রদেশ ও উড়িষ্যা লইয়া গঠিত। এতদ অঞ্চল বনজ সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। ইহা ছাড়া ধান, ভুট্টা, চীনাবাদাম প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, লৌহ, কয়লা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যও পশ্চাৎভূমিতে প্রচুর আছে। বন্দরটির স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা বেশী থাকায় এখানে জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে একটি তৈল শোধনাগারও স্থাপিত হইয়াছে। তৈলবীজ, কাঠ, চট, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র প্রভৃতি ইহার উল্লেখযোগ্য রপ্তানি দ্রব্য। কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্র, খনিজ তৈল, খাদ্যশস্য প্রভৃতি ইহার উল্লেখযোগ্য আমদানি দ্রব্য।

(৩) মাদ্রাজ (Madras): ইহা বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত মাদ্রাজের রাজধানী ও প্রধান বন্দর। ইহার পোতাশ্রয় কৃত্রিম। ইহার নিকটবর্ত্তী সমুদ্র অগভীর বালুকাময় ও তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ। এজন্য ইহা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় বেশী। মাদ্রাজ, অন্ধ্র ও মহীশূর ইহার পশ্চাৎভূমির অন্তর্গত। পশ্চাৎভূমি ধান, ইক্ষু, চীনাবাদাম, চা, কফি, কার্পাস, তামাক, ভুট্টা, রাগী, বাজরা, রবার প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যে সমৃদ্ধ।

ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, কয়লা, লৌহ, স্বর্ণ প্রভৃতি খনিজ সম্পদও এখানে পাওয়া যায়। এ অঞ্চল নানাবিধ যান্ত্রিক ও কুটির শিল্পেও পশ্চাৎপদ নহে। তামাক, তৈলবীজ, কফি, চা, ম্যাঙ্গানিজ অভ্র, চর্ম, বস্ত্রাদি প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য। কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, খনিজ তৈল, খাদ্যশস্য, কয়লা, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্র প্রভৃতি ইহার আমদানি দ্রব্য।

(৪) **কোচিন (Cochin) :** ইহা ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে কেরালা রাজ্যে অবস্থিত। পশ্চিম উপকূলের ঝড়ঝাপটা সত্ত্বেও এই বন্দরে সারাবৎসরই জাহাজ চলাচলে করিতে পারে। ইহার পশ্চাৎভূমি কেরালা মহারাষ্ট্র, মহীশূর ও মাদ্রাজ পর্যন্ত বিস্তৃত। কফি, চা রবার, কাঠ, মসলা, কাজু-বাদাম, নারিকেল প্রভৃতি ইহার পশ্চাৎভূমির উল্লেখ যোগ্য ফসল। পশ্চাৎভূমির সহিত বন্দর দক্ষিণ রেলপথ দ্বারা যুক্ত। মশলা, রবার, চা, কফি, কাজুবাদাম, নারিকেলের তৈল ও নারিকেলের ছিবড়া ইহার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। খাদ্যশস্য, যন্ত্রপাতি, খনিজতৈল, কয়লা প্রভৃতি ইহার আমদানি দ্রব্য। ইহার ভারতের প্রধান নৌ ঘাটিও বটে।



(৫) **বোম্বাই (Bombay) :** ভারতের পশ্চিম উপকূলে মহারাষ্ট্রের স্বাভাবিক পোতাশ্রয় যুক্ত ইহাই বৃহত্তম বন্দর ও রাজধানী। বন্দরটি দ্বীপের আড়ালে অবস্থিত। ইহার জলও গভীর। এজন্য বড় বড় জাহাজ ঝড়ের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। ইহার পশ্চাৎভূমি মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মহীশূর, মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশ

পর্যন্ত বিস্তৃত। বোম্বাইয়ের পূর্বদিক দিয়া পশ্চিম ঘাট পর্বত প্রসারিত। এজন্য থল-ঘাট ও ভোরঘাট নামক গিরিপথ দিয়া অভ্যন্তরের পশ্চাৎভূমির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া থাকে। ইহার পশ্চাৎভূমি ধান, গম, ভূট্টা, রাগী, কার্পাস, তৈলবীজ, পশম, লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, কাঠ প্রভৃতি সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানকার অন্যান্য শিল্পের মধ্যে কার্পাস শিল্প বিশেষ উন্নত। নিকটে ট্রম্বেতে দুইটি তৈল শোধনাগারও আছে। কার্পাস, বস্ত্র, তূলা, চর্ম, তৈলবীজ, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি এই বন্দরের রপ্তানি দ্রব্য। তূলা, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, রেল গাড়ীর ইঞ্জিন, লৌহ ও ইস্পাত নির্মিত দ্রব্য, খনিজ তৈল, কয়লা প্রভৃতি ইহার আমদানি দ্রব্য। রপ্তানি ব্যাপারে কলিকাতা বন্দর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমদানি ব্যাপারে বোম্বাইয়ের প্রধান্য সর্বাধিক।

(৬) কান্দলা (Kandla): করাচী পাকিস্তানে চলিয়া যাওয়ার পর এই বন্দর নির্মিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা ভারতের নূতন বন্দর। বন্দরটি কচ্ছ উপসাগর তটে গুজরাট রাজ্যে অবস্থিত। ইহার অবস্থান স্বাভাবিক পোতাশ্রয় যুক্ত হইলেও উপসাগর ও খাড়িতে জলের গভীরতা কম। এজন্য বহু অর্থব্যয়ে ইহাকে আধুনিক বন্দরের পর্য্যায়ে উন্নতি করিতে হইয়াছে। নিকটবর্তী গুজরাট রাজ্য ইহার পশ্চাৎ-ভূমি। কিন্তু ইহার অনেকস্থলে অনুর্বর, মরুময় ও লবণাক্ত জলাভূমিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু এই অঞ্চল বকসাইট, জিপসাম খনিজতৈল প্রভৃতি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। কিছু লিগনাইট কয়লাও আছে। কাচ, লবণশিল্প ও সিমেণ্ট শিল্প এখানে উন্নত। তবে রেলপথ দ্বারা উহা রাজস্থান ও পাঞ্জাবের সহিত যুক্ত হওয়ায় ইহার পশ্চাৎভূমির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে ইহার পশ্চাৎভূমি গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কার্পাস তুলা তৈলবীজ, চর্ম, লবণ প্রভৃতি ইহার রপ্তানি দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্র, কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য প্রভৃতি ইহার আমদানি দ্রব্য।

Q. 8. What geographical factors are responsible for the growth of trade centre? Illustrate your answer with examples from India. (C. U. Inter, 1942 1945)

(কি কি ভৌগোলিক কারণে বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠে? ভারত হইতে উদাহরণ দিয়া উত্তর লিখ।)

Or

Give reasons for the establishment and development of towns and illustrate your answer by suitable examples from India and abroad.

(সহর প্রতিষ্ঠা ও উহার উন্নতির কারণগুলি বর্ণনা কর। ভারত ও বিদেশ হইতে উদাহরণ দিয়া উত্তর লিখ।)

Ans: পৃথিবীতে অনেক ছোট বড় বাণিজ্যকেন্দ্র বা সহর আছে। ইহারা হঠাৎ গড়িয়া উঠে নাই। ইহাদের পিছনে নানাবিধ ভৌগোলিক ও অন্যবিধ কারণ বর্তমান। নিম্নে উদাহরণ সহ কারণগুলি উল্লেখ করা হইল ঃ

(১) **তীর্থস্থান ঃ** ধর্মের সহিত সহর বা বাণিজ্য কেন্দ্র গঠনের সম্পর্ক আছে। তাই তীর্থস্থান বা ধর্মকেন্দ্র হেতু কাশী, গয়া, লাসা, মক্কা, প্রভৃতি সহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে।

(২) **স্বাস্থ্যকরস্থান ঃ** স্বাস্থ্যকর স্থানে লোক সমাগমের ফলেও উক্ত স্থান সহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া আসিতেছে। ওয়ালটেয়ার, মধুপুর, দার্জিলিং প্রভৃতি সহর এই ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৩) **ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র ঃ** যে স্থান রাজধানী বা অন্য কোন কারণে ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে সেখানে সহর বা বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। যেমন দিল্লী, আগ্রা, প্যারিস, টোকিও প্রভৃতি।

(৪) **শিক্ষা ও সংস্কৃতিক কেন্দ্র ঃ** শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও অনেকস্থলে সহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই ভাবেই শান্তিনিকেতন, নালন্দা, আলিগড়, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৫) **সামরিক গুরুত্ব ঃ** কোন কোন স্থান নৌঘাঁটি, বিমানঘাঁটি বা অন্য সামরিক গুরুত্বের জন্য সহর বা বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়া আসিতেছে। এইভাবে পেশোয়ার, এডেন, জিব্রাল্টার, দমদম প্রভৃতি সহর বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে নাম করিয়া আসিতেছে।

(৬) **খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য্য ঃ** যে সমস্ত স্থানে খনিজ দ্রব্য বর্তমান তাহা আহরণের জন্য সেখানে বহু লোক সমাগম হয়, রাস্তা, রেলপথ প্রভৃতি নির্মিত হয় এবং কালক্রমে উক্ত স্থান সহর বা বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে খ্যাতিলাভ করে। রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, ডিগবয়, জোহানেসবার্গ প্রভৃতি এইভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৭) **শ্রমশিল্পকেন্দ্র ঃ** যেখানে শ্রমশিল্প গড়িয়া উঠে সেখানে সহর ও বাণিজ্য কেন্দ্রও গড়িয়া উঠে। যেমন জামসেদপুর, দুর্গাপুর, ম্যানচেষ্টার ও পিটসবার্গ।

(৮) **জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ঃ** যেখানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা আছে এবং উহা কাজে লাগান হইতেছে সেখানেও সহর বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়। যেমন মহীশূরের শিবসমুদ্রম, মাদ্রাজের মেট্টুর, যুক্তরাষ্ট্রের বাফেলো, রিচমণ্ড প্রভৃতি।

(৯) **পর্বত ও সমভূমির মিলনস্থান ঃ** এরূপ অবস্থায় উভয় অঞ্চলের মধ্যে

পণ্য বিনিময় কেন্দ্র গড়িয়া উঠার প্রয়োজন হয় এবং উক্ত কেন্দ্র সহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করে, যেমন ইতালির মিলান, মণিপুরের ইম্ফল।

(১০) **বন্দর ও রেলষ্টেশনের মিলনস্থল:** এরূপ স্থানে পণ্যদ্রব্য বৃহৎ আকারে আদান প্রদান হইয়া থাকে এবং ইহারই ফলে ঐ স্থান বড সহর ও বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হয়। যেমন কলিকাতা, বোম্বাই ও লিভারপুল।

(১১) **সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের উপর অবস্থিত স্থান:** এখানে বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে এবং পণ্য আদান-প্রদান হইয়া থাকে। ফলে ঐ স্থান সহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র পরিণত হয়। যেমন কলম্বো ও সিঙ্গাপুর।

(১২) **একাধিক নদীর সঙ্গমস্থল:** বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পণ্য আমদানি ও বিভিন্ন স্থানে পণ্য রপ্তানির পক্ষে এরূপ স্থান বিশেষ উপযোগী। ফলে এরূপস্থানে সহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। যেমন এলাহাবাদ ও গোয়ালন্দ।

(১৩) **গিরিপথের শেষ প্রান্ত:** এরূপ অবস্থানও সহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠার অনুকূল। যেমন পেশোয়ার ও কালিম্পং।

যদিও উপরিউক্ত কারণগুলি সহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র গঠনের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে তথাপি একথা ভুলিলে চলিবে না যে কোন স্থানে সহর বা বাণিজ্যকেন্দ্র একটি মাত্র কারণে খুব কমই গড়িয়া উঠে। একটি মাত্র কারণে কোনও স্থানে সহর বা বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিলেও কালক্রমে সেখানে একাধিক কারণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন কলিকাতা প্রথমে ব্যবসায়ের কেন্দ্র হিসাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে উহা রাজনৈতিক ও শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হয়। সুতরাং সহর হিসাবে কলিকাতার উৎপত্তি ও উন্নতি একাধিক কারণেই সম্ভব হইয়াছে। আবার সহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে কোন স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও উহার মূল একটি মাত্র প্রধান কারণ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন দিল্লীর বিশেষ গুরুত্ব রাজধানী হিসাবে, জামসেদপুরের বিশেষ গুরুত্ব শিল্পপ্রধান সহর হিসাবে এবং বোম্বাইয়ের বিশেষ গুরুত্ব বাণিজ্যপ্রধান সহর হিসাবে।

Q. 9. Give a short account of some of the important, cities, towns and trade centres of India

(ভারতের কতকগুলি প্রসিদ্ধ সহর, নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।)

Ans: (১) **শিলং (Shillong):** ইহা আসামের রাজধানী; স্বাস্থ্যকর স্থান এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০০০ ফুট উচ্চে খাসিয়া পাহাড়ের উত্তর দিকে অবস্থিত। ইহা রেশম, কাঠ, চা ও ফলের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। গৌহাটির সহিত ইহা মোটর পথে যুক্ত। এখানে একটী জলবিদ্যুৎকেন্দ্রও আছে।

(২) ডিব্রুগড় (Dibrugarh) : ইহা আসামের ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য রেল ষ্টেশন। ইহা ডিগবয় তৈলখনির সন্নিকটে। এজন্য ইহা খনিজ তৈলের ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ। অন্যান্য বাণিজ্য পণ্যের মধ্যে রেশম, চা, কাঠ ও ফল উল্লেখযোগ্য।

(৩) ডিগবয় (Digboi) : ইহা আসামের লখিমপুর জেলায় অবস্থিত। ডিগবয় ভারতের মধ্যে প্রধান খনিজ তৈল উৎপাদন কেন্দ্র। এখানে একটি তৈল শোধনাগার আছে।

(৪) নাহারকাটিয়া (Naharkatiya) : আসামে অবস্থিত। এখানে সম্প্রতি তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তৈল উত্তোলনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

(৫) চেরাপুঞ্জি (Cherapunji) : আসামের খাসিয়া পাহাড়ের দক্ষিণে অবস্থিত এবং পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের (গড়ে বাৎসরিক ৫০০″) জন্য উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া এখানে চুনাপাথরের খনি আছে এবং প্রচুর কমলালেবুও উৎপন্ন হয়।

(৬) গৌহাটি (Gauhati) : ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে অবস্থিত আসামের সর্ববৃহৎ সহর এবং রেশম, চা, কাঠ ও ফলের ব্যবসাযের জন্য উল্লেখযোগ্য। ইহা একটি বড় রেলষ্টেশন এবং বিমানপোত ষ্টেশন। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এখানকার কামাক্ষ্যা মায়ের মন্দিরও বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানকার নূনমাটিতে (Noonmati) নতন তৈল শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে এবং নাহারকাটিয়া হইতে খনিজ তৈল শোধনের জন্য এখানে প্রেরিত হইবে।

(৭) দার্জিলিং (Darjeeling) : ইহা পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার প্রধান সহর, স্বাস্থ্যকর স্থান এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রীষ্মকালের রাজধানী। এখানে চা, কমলালেবু ও আনারস প্রচুর জন্মিয়া থাকে। কিছু নরম কাঠের বৃক্ষও এখানে আছে। ইহা সমতলভূমি ও পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে পণ্য আদান-প্রদানের কেন্দ্র। এবং রেলপথ, মোটরপথ ও বিমানপথ দ্বারা অন্যান্য অঞ্চলের সহিত যুক্ত। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। এজন্য বহুলোক এখানে বেড়াইতে আসে। তজ্জন্য হোটেল ব্যবসায়ীদের বেশ দু'পয়সা আয় হয়।

(৮) কালিম্পং (Kalimpong) : ইহা দার্জিলিং জেলার একটি মহকুমা সহর, স্বাস্থ্যকর স্থান এবং তিব্বত যাওয়ার পথে অবস্থিত। ইহা পশম ব্যবসায়ের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। লবণ ও অন্যান্য দ্রব্যের বিনিময়ে আমরা তিব্বত হইতে পশম পাইয়া থাকি। নাথুলা গিরিপথ দিয়া তিব্বত হইতে পশম আমদানি হয়।

কার্পেট, শাল ও অন্যান্য পশমী দ্রব্যও এখানে প্রস্তুত হয়। কিছু নরম কাঠও এখান হইতে চালান যায়।

(৯) **জলপাইগুড়ি (Jalpaiguri) :** ইহা পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে অবস্থিত জলপাইগুডি জেলার সদর সহর। ইহা কমলালেবু, চা, তামাক, পাট ও কাষ্ঠ ব্যবসায়ের জন্য উল্লেখযোগ্য। উত্তর-বঙ্গের ইহা একটি শিক্ষাকেন্দ্রও বটে এবং এখানে স্কুল, কলেজ ও কারীগরী বিদ্যালয় ও কলেজ আছে।

(১০) **মুর্শিদাবাদ (Murshidabad) :** ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত পশ্চিম-বঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার উল্লেখযোগ্য সহর। ইহার রেশম শিল্প প্রসিদ্ধ। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে কার্পাস ও কাঁসা-পিতল উল্লেখযোগ্য। ইহা একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানও বটে। এককালে ইহা বাংলা-বিহারের রাজধানী ছিল।

(১১) **মালদহ (Malda) :** পশ্চিমবঙ্গের ইহা একটি জেলা সহর। আজও রেশম শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। ইহার নিকটে প্রাচীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান।

(১২) **কৃষ্ণনগর (Krishnanagar) :** ইহা নদীয়া জেলার সদর সহর এবং মৃৎশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

(১৩) **কল্যাণী (Kalyani) :** ইহা নদীয়া জেলায় অবস্থিত। এখানে কলিকাতার ভিড় কমানোর উদ্দেশে সহর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে এবং তদনুযায়ী কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। এখানে কয়েকটি ছোট কারখানা, কারীগরী ও সাধারণ শিক্ষার বিদ্যালয় এবং একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

(১৪) **হরিণঘাটা (Haringhata) :** ইহা নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়া রেল-ষ্টেশনের নিকটে অবস্থিত। এখানে গো, মহিষ, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পশু পালন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এখান হইতে বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ ও ডিম সরবরাহ হইয়া থাকে। এখানে একটি গবেষণাগারও আছে।

(১৫) **শান্তিপুর (Santipur) :** ইহা নদীয়া জেলায় তাঁত শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

(১৬) **ক্যানিং (Canning) :** কলিকাতা হইতে ২৮ মাইল দূরে মাতলা নদীর তীরে অবস্থিত ২৪ পরগণার একটি থানা সহর। সুন্দরবন অঞ্চলের অনেক জিনিস বিশেষতঃ মাছ, তরিতরকারী, কাঠ প্রভৃতি এই সহর মারফত সরবরাহ হইয়া থাকে। পূর্বে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য নদী বন্দর ছিল এবং সমুদ্রগামী জাহাজ যাতায়াত করিত। বর্তমানে মাতলা নদী মজিয়া যাওয়ায় সমুদ্রগামী জাহাজ যাতায়াত করিতে পারে না।

(১৭) **হাওড়া (Howrah) :** কলিকাতার অপর দিকে হুগলী নদীর তীরে

অবস্থিত জেলা সহর। ভারতের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে যাওয়ার ইহা একটি বড় রেল-ষ্টেশন। ইহা একটি শিল্প প্রধান অঞ্চলও। এখানে বহু পাটকল, ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা প্রভৃতি আছে। লোকসংখ্যাও প্রচুর, ৫ লক্ষের উপরে।

(১৮) শ্রীরামপুর (Serampur): ইহা হুগলী জেলার একটি মহকুমা সহর এবং হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা একটি শিল্প প্রধান অঞ্চল এবং এখানে কাপড়ের কল, পাটকল, ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা আছে। ইহা একটি রেল ষ্টেশনও। এখানে একটি মিশিনারী কলেজও আছে।

(১৯) বাটানগর (Batanagar): ইহা ২৪ পরগণা জেলায় হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে একটি জুতার কারখানা আছে। উক্ত জুতার কারখানা ভারতের মধ্যে সর্ববৃহৎ। জুতার কারখানার জন্যই ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি।

(২০) আসানসোল (Asansol): ইহা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বর্ধমান জেলার একটি মহকুমা সহর। ইহা একটি বড় রেল ষ্টেশন। ইহার নিকটেই রাণীগঞ্জ কয়লার খনি। ইহার চতুর্দিকে নানাপ্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে কুলটি ও বানপুরের লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, অনুপনগরের সেনর‍্যালে সাইকেল কারখানা ও অ্যালুমিনিয়াম কারখানা, স্থানীয় টালি, ইট, মৃৎশিল্প প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(২১) রাণীগঞ্জ (Ranigunj): ইহা পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার একটি মহকুমা সহর এবং আসানসোলের নিকটে অবস্থিত। ইহা কয়লা খণির জন্য প্রসিদ্ধ। এখানেই প্রথমে কয়লার খনির কাজ আরম্ভ হয়। বর্তমানে ইহা কয়লা উৎপাদনে দ্বিতীয়। ঝরিয়ার পরেই ইহার স্থান। এই কয়লাকে কেন্দ্র করিয়া পশ্চিমবঙ্গের বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে।

(২২) চিত্তরঞ্জন (Chittaranjan): ইহা পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় রেলইঞ্জিন নির্মাণ কেন্দ্র। প্রতি বৎসর এখানে প্রায় দুই শতের মত বড় বড় রেল-ইঞ্জিন প্রস্তুত হইতেছে।

(২৩) কুলটি (Kulti): ইহা পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় উল্লেখযোগ্য লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র।

(২৪) রূপনারায়ণপুর (Rupnarayanpur): ইহা পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় টেলিফোনের তার প্রস্তুত করার কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ।

(২৫) খড়্গপুর (Kharagpur): পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় একটি বড় রেল ষ্টেশন। ইহার প্ল্যাটফরম ভারতের মধ্যে দ্বিতীয়। এখানে রেলগাড়ী

ও ইঞ্জিন মেরামত কারখানা, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, সাধারণ শিক্ষার কলেজ আছে।

(২৬) আগরতলা (Agartala) : ইহা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী। ইহা নানাপ্রকার কুটির শিল্পের জন্য উল্লেখযোগ্য। এখানে একটি বিমান বন্দর আছে।

(২৭) পাটনা (Patna) : ইহা গঙ্গার তীরে অবস্থিত বিহারের রাজধানী। ইহা একটি শিল্পপ্রধান সহরও। শিল্পগুলির মধ্যে চিনি ও বিজলী বাতির কারখানা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ধান, ডাল, লঙ্কা প্রভৃতিরও ব্যবসাকেন্দ্র। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। স্থানটি স্থলপথে, জলপথে ও রেলপথে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সহিত যুক্ত।

(২৮) জামসেদপুর (Jamshedpur) : বিহারের ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে ইহা অবস্থিত লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে রেল-ইঞ্জিন, মালগাড়ি, কাঁটা তার, রোলার, টিন প্লেট প্রভৃতি শিল্প কারখানাও গড়িয়া উঠিয়াছে। নিকটে রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লা খনি, ময়ুরভঞ্জ ও সিংভূমের লৌহ খনি এবং অন্যান্য কাঁচা মাল থাকায় এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের উপর অবস্থিত হওয়ায় স্থানটি শিল্পকেন্দ্র হিসাবে দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে।

(২৯) সিন্ধ্রী (Sindri) : বিহারের ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে অবস্থিত ধানবাদের নিকটে ইহা সার প্রস্তুত কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ। সার প্রস্তুত করার উপযোগী কাঁচামাল, জিপসাম, কয়লা প্রভৃতি নিকটে থাকায় সার প্রস্তুত কারখানা প্রতিষ্ঠার সুযোগ হইয়াছে। এখানে একটি সিমেণ্ট কারখানাও আছে। কালক্রমে স্থানটি অন্যান্য শিল্পের কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে।

(৩০) শোণপুর (Sonepur) : বিহারে অবস্থিত বড় রেলষ্টেশন। এখানকার রেলষ্টেশনের প্লাটফরম দৈর্ঘ্যে (২৪১৫ ফুট) ভারতের মধ্যে বৃহত্তম। এখানকার পশুপ্রদর্শনীও ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড়।

(৩১) ঝরিয়া (Jharia) : বিহারের ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে অবস্থিত কয়লা খনির জন্য প্রসিদ্ধ। ভারতের মধ্যে এই খনি হইতেই সবচেয়ে বেশী কয়লা উত্তোলিত হয়। কয়লাও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। কয়লার আনুসঙ্গিক শিল্পজ ইহার চতুর্দিকে গড়িয়া উঠিয়াছে। বিহারের অন্যান্য কয়লা খনি অঞ্চলের মধ্যে ধানবাদ, গিরিডি ও বোকারো বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধানবাদে একটি মাইনিং কলেজও আছে। গিরিড়ি অভ্র ব্যবসায়ের জন্যও প্রসিদ্ধ। বোকারোতে একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রও স্থাপিত হইয়াছে।

(৩২) ডালমিয়ানগর (Dalmianagar): বিহারের শোণনদীর তীরে পূর্বরেলপথের উপর অবস্থিত। চিনি ও সিমেণ্ট শিল্পের জন্য এবং নিকটবর্তী অঞ্চলের চুণাপাথরের খনির জন্য প্রসিদ্ধ।

(৩৩) মুরি (Murree): বিহারের ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে অবস্থিত একটি রেলজংশন। এখানে এ্যালুমিনিয়ামের কারখানা আছে। রাঁচির নিকট লোহারদাগা হইতে ইহা বক্সাইট পাইয়া থাকে।

(৩৪) রাঁচি (Ranchi): বিহারের গভর্ণরের গ্রীষ্মাবাস। ইহা একটি শৈল নিবাস ও স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে রেশম ও লাক্ষার গবেষণাগারও আছে।

(৩৫) বারৌনি (Barauni): বিহারে অবস্থিত এখানে একটি তৈল শোধনাগার স্থাপিত হইতেছে। আসামে নাহারকাটিয়া হইতে এখানে শোধনের জন্য খনিজতৈল আসিবে।

(৩৬) কটক (Cuttack): ইহা উড়িষ্যার পূর্বতন রাজধানী। ইহা মহানদী ও কাঠজড়ি নদীর সঙ্গমস্থলে দক্ষিণ পূর্ব রেলপথের উপর অবস্থিত বড রেলকেন্দ্র প্রধান সহর ও বন্দর। ইহা কাষ্ঠ রপ্তানি ও চামড়া, সিং, লাক্ষার পুতুল ও বালা, খেলনা, চিরুনী প্রভৃতি শিল্পের জন্যও প্রসিদ্ধ।

(৩৭) ভুবনেশ্বর (Bhubaneswar): ইহা উড়িষ্যার নূতন রাজধানী, বড় রেলকেন্দ্র, বিমানবন্দর এবং একটি তীর্থস্থান। এস্থানের পানীয় জল ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক ও হজমিকারক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(৩৮) বালেশ্বর (Balasore): ইহা বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত উড়িষ্যার একটী বন্দর এবং জেলা সহর। ইহা কাঠ, লাক্ষা, রেশম প্রভৃতির ব্যবসাকেন্দ্র এবং দক্ষিণপূর্ব রেলপথের উপর অবস্থিত।

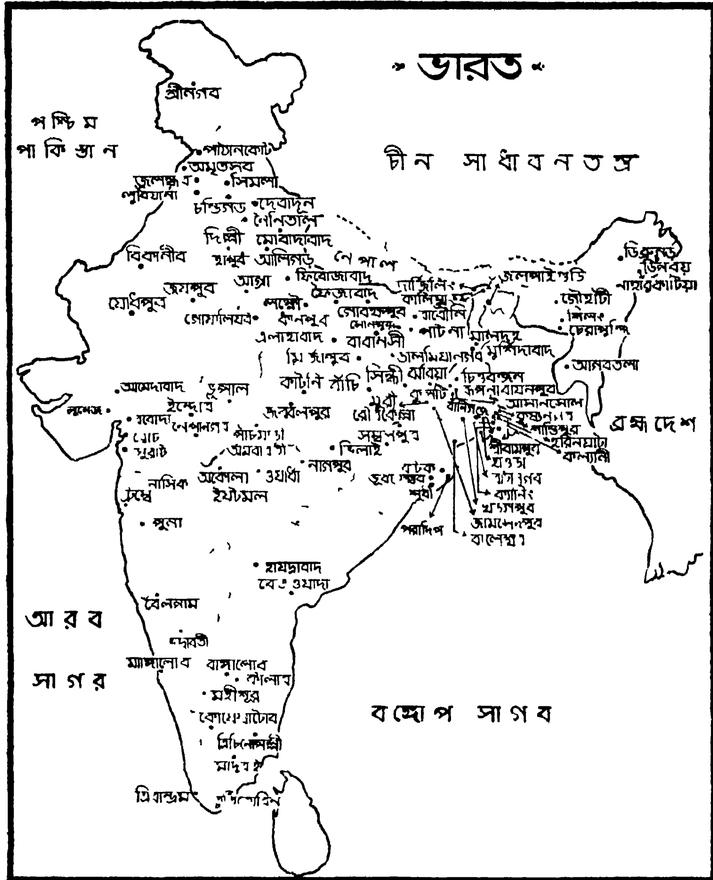
(৩৯) পুরী (Puri): ইহা বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত উড়িষ্যার বন্দর, সহর ও প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে জগন্নাথদেবের মন্দির আছে। পিতল ও কাঁসার জিনিস, সোণা ও রূপার অলঙ্কার প্রভৃতি এখানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার নিকটবর্তী সমুদ্র অগভীর বলিয়া ৭ মাইল দূরে জাহাজ নোঙ্গর করিয়া থাকে।

(৪০) সম্বলপুর (Sambalpur): ইহা উড়িষ্যার একটি উল্লেখযোগ্য সহর এবং তুলা ও রেশম শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। হিরাকুদের জলবিদ্যুৎ পাওয়ার ফলে স্থানটির শিল্পসম্ভাবনা বাড়িয়া গিয়াছে।

(৪১) রূঢ়কেলা (Rourkola): ইহা উড়িষ্যার নবনির্মিত লৌহ ও ইস্পাত কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ। ভারত সরকারের প্রচেষ্টা ও জার্মানীর সাহায্যে এই শিল্প-

কারখানা প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং বৎসরে এখান হইতে ১০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপন্ন হইবে।

(৪২) পরাদিপ (Paradip): উড়িষ্যার একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর। এই



বন্দরের উন্নতির চেষ্টা চলিতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে ইহা একটি প্রধান বন্দরে পরিণত হইবে আশা করা যায়।

(৪৩) কানপুর (Kanpur) : ইহা গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত উত্তর প্রদেশের বৃহত্তম নগর, শিল্পকেন্দ্র এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে বহু কাপড়ের, তৈলের, চিনির, পাটের, রেশমের, চামড়ার, ময়দার, রাসায়নিক দ্রব্যের ও ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের কারখানা আছে। তাঁবু প্রস্তুতের জন্য ইহা বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহার তুলা ও চামড়ার ব্যবসাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা একটি বিমান বন্দর এবং বড় রেল ষ্টেশন ও জংশন। ইহার লোকসংখ্যাও ৭ লক্ষের অধিক।

(৪৪) এলাহাবাদ (Allahabad) : ইহা গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এবং জলপথে, স্থলপথে ও রেলপথে বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যুক্ত। এজন্য এখানে জোয়ার, বাজরা, গম, তৈলবীজ, তামাক, তুলা প্রভৃতির ব্যবসা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানকার শিল্পের মধ্যে তৈল, কার্পাস, কাঁচ, ময়দা, চিনি, আম এবং পেয়ারা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহা হিন্দুদের তীর্থস্থান ও উত্তর প্রদেশের পূর্বতন রাজধানী, বিমানবন্দর ও বড় রেলষ্টেশন। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

(৪৫) লক্ষ্ণৌ (Lucknow) : ইহা গঙ্গার উপনদী গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত উত্তর প্রদেশের রাজধানী ও উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানকার রৌপ্য ও স্বর্ণদ্রব্য, হস্তিদন্ত ও কাঠের কারুশিল্প, মৃৎপাত্র, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসাও এখানে চলিয়া থাকে। ইহা বিমানবন্দর এবং অনেকগুলি রেলপথের জংশন। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে।

(৪৬) বারাণসী (Banaras) : ইহা গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত উত্তর প্রদেশের মধ্যে হিন্দুদের একটি বড় তীর্থস্থান এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এখানকার তৈল, চিনি ও ময়দা, রেশম, পশম প্রভৃতির কারখানা, কাঠের পুতুল, জর্দা, গালার চুড়ি, কাঠের জিনিস, ধাতুনির্মিত জিনিস, হাতির দাঁতের নানাপ্রকার জিনিস, প্রভৃতি উৎপাদনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এখানকার তিসি, সরিষা, চিনি, ছোলা, আম, পেয়ারা প্রভৃতির ব্যবসাও উল্লেখযোগ্য। বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। বারাণসীর নিকটেই বৌদ্ধ পীঠস্থান সারনাথ অবস্থিত। জলপথে, স্থলপথে ও রেলপথে এখান হইতে বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াতেরও সুবিধা আছে। এখানে আমেরিকার সহায়তায় একটি ডিজেল ইঞ্জিন কারখানা স্থাপনের প্রস্তাবও চলিতেছে।

(৪৭) গোরক্ষপুর (Gorakhpur) : ইহা তাপ্তী নদীর তীরে অবস্থিত উত্তর প্রদেশের পূর্বদিকের সহর এবং উত্তর-পূর্ব রেলপথের সদর কার্য্যালয়। এখান হইতে বিভিন্ন অঞ্চলে স্থলপথে, জলপথে ও রেলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থাও ভাল।

নেপাল হইতে আনীত কাঠের ব্যবসাও এখানে উল্লেখযোগ্য। এখানকার শিল্পের মধ্যে চিনি, ময়দা ও কাষ্ঠ উল্লেখযোগ্য।

(৪৮) দেরাদুন (Dehradun): ইহা হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত উত্তর প্রদেশের স্বাস্থ্যকর স্থান। এজন্য বহু লোক সমাগম হেতু ব্যবসাবাণিজ্য ও হোটেল ব্যবসা বেশ চালু আছে। এখানকার বনগবেষণা কেন্দ্র ও সামরিক বিদ্যা শিক্ষার কলেজ উল্লেখযোগ্য।

(৪৯) নৈনিতাল (Nainital): ইহা হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত উত্তর প্রদেশের স্বাস্থ্যকর স্থান। এজন্য যে বহু লোকসমাগম হয় তাহাতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও হোটেল ব্যবসা ভাল চলিয়া থাকে।

(৫০) আলিগড় (Aligarh): ইহা উত্তর প্রদেশের পশ্চিমদিকে অবস্থিত অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানকাব তালা, ছুরি-কাঁচি, পিতল-কাঁসার জিনিস, কাঁচের জিনিস, দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং উহা মুসলমানদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

(৫১) আগ্রা (Agra): ইহা যমুনা নদীর তীরে উত্তর প্রদেশের পশ্চিমদিকে অবস্থিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার তাজমহল ও আগ্রাদুর্গ উহারই নিদর্শন। ইহা একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানকাব পণ্যদ্রব্যের মধ্যে কার্পেট, জুতা, কাঁসার জিনিস, আয়না, মার্বেল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রাজপুতনার সহিত ইহার বহু জিনিস আদানপ্রদান হইয়া থাকে। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ইহা একটি রেল জংশন।

(৫২) মোরাদাবাদ (Moradabad): ইহা উত্তর রেলপথেব উপর অবস্থিত উত্তর প্রদেশেব একটি শিল্প ও ব্যবসাকেন্দ্র এবং রেলজংশন এখানকার নক্সাদার পিতল ও কাঁসার জিনিস কাঁচের জিনিস, ছুরি-কাঁচি, এনামেলের জিনিস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানকার আমের ব্যবসাও প্রসিদ্ধ।

(৫৩) মির্জাপুর (Mirzapur): ইহা গঙ্গাতীরে অবস্থিত উত্তর প্রদেশের একটি কৃষিপ্রধান শিল্পাঞ্চল। এখানকার ছুরিকাঁচি, কার্পেট, মাটির জিনিস, পিতল ও পাথরের জিনিস বিখ্যাত।

(৫৪) ফেরোজাবাদ (Ferozabad): উত্তর প্রদেশের আগ্রার পূর্বদিকে অবস্থিত ইহা কাচ ও শর্করা শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

(৫৫) হাপুর (Hapur): উত্তর প্রদেশের একটি উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন প্রকার শস্যের বাজার।

(৫৬) দিল্লী (Delhi): ইহা যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত ভারতের রাজধানী

ও শিল্পাঞ্চল। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে আরাবল্লী ও থর মরুভূমি, পূর্বে গঙ্গা ও পশ্চিমে সিন্ধুর অববাহিকার মধ্যস্থলে উচ্চভূমিতে অবস্থিত হওয়ায় রাজধানী হিসাবে ইহার কতকগুলি ভৌগোলিক সুবিধা আছে। ইহা জলপথে, স্থলপথে, রেলপথে ও বিমানপথে বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যুক্ত। এখানে কার্পাস, চিনি, ময়দা, রেশম, পশম প্রভৃতি শিল্পও আছে। এখানকার নক্সাদার সোনার ও রূপার জিনিস, রেশম, পশম ও তুলার জিনিস, মসলিন, হাতীর দাঁতের জিনিস, জরীর কাজ প্রভৃতি বিশেষ নামকরা। দিল্লী আবার পুরাতন দিল্লী ও নূতন দিল্লী হিসাবে বিভক্ত। রাজধানীর আসন নূতন দিল্লীতে অবস্থিত এবং এখানকার অধিকাংশ লোক সরকারী চাকুরে। পুরাতন দিল্লীর বর্তমান খ্যাতি শিল্পাঞ্চল হিসাবে। দিল্লী উত্তর রেল পথের বড় ষ্টেশন ও জংশন। ইহার লোকসংখ্যাও প্রায় ১০ লক্ষের উপরে।

(৫৭) **অমৃতসর** (**Amritsar**): ইহা উত্তর রেলপথের উপর অবস্থিত পাঞ্জাবের উল্লেখযোগ্য সহর ও শিখদের প্রধান তীর্থস্থান। এখানকার স্বর্ণমন্দির বিখ্যাত। বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্র হিসাবেও ইহার নাম আছে। কাপড়, রাসায়নিক দ্রব্য, চামড়া, গেঞ্জি, মোজা, শাল, কার্পেট, নক্সাদার কাঠের জিনিস প্রভৃতি শিল্পের জন্য উল্লেখযোগ্য।

(৫৮) **লুধিয়ানা** (**Ludhiana**): শতদ্রু নদীর তীরে পাঞ্জাবের মধ্যস্থলে অবস্থিত উত্তর রেলপথের জংশন ষ্টেশন। ইহা শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবেও প্রসিদ্ধ। পশম, রেশম, কাপাস', গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতি ইহার উল্লেখযোগ্য শিল্প। এখানে সৈন্যদের জন্য পাগড়ী তৈয়ারী হয়।

(৫৯) **পাঠানকোট** (**Pathankot**): পাঞ্জাবের উত্তরে অবস্থিত উত্তর রেল পথের শেষ ষ্টেশন। কাশ্মীরের সহিত মোটর ও বিমানপথ দ্বারা যুক্ত।

(৬০) **জলন্ধর** (**Julunder**): পাঞ্জাবের একটি সেনানিবাস এবং পূর্ব পাঞ্জাবের কৃষিজাত দ্রব্যের-বিক্রয় কেন্দ্র।

(৬১) **চণ্ডীগড়** (**Chandigarh**): ইহা পাঞ্জাবের রাজধানী এবং উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র। ভাক্রা-নাঙ্গাল হইতে জলবিদ্যুৎ পাওয়ায় ইহা একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পাঞ্চলে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

(৬২) **সিমলা** (**Simla**): ইহা ভারতের গ্রীষ্মকালের এবং হিমাচল প্রদেশের রাজধানী সমুদ্র সমতল হইতে ৭০০০ ফুট উচ্চে স্বাস্থ্যকর মনোরম স্থান। গ্রীষ্মকালে চীন ও তিব্বতের সহিত ইহার বাণিজ্য চলে।

(৬৩) **শ্রীনগর** (**Srinagar**): ইহা জম্মু ও কাশ্মীরের রাজধানী, ঝিলাম নদীর তীরে উলার হ্রদের নিকটে অবস্থিত। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থান।

এজন্য ইহাকে ভূস্বর্গ আখ্যা দেওয়া হয়। ইহা নানাপ্রকার কুঠির শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এই শিল্পের মধ্যে রেশম, পশম, কাঠের নক্সার কাজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীরের শাল প্রসিদ্ধ। এস্থান নানাপ্রকার ফলের জন্যও প্রসিদ্ধ। বারামুল্লা হইতে এই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান জলবিদ্যুৎ শক্তি পাইয়া থাকে। ইহার কোন রেলপথ নাই। কিন্তু সুন্দর মোটর পথ দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যুক্ত। ইহার একটি বিমান বন্দরও আছে।

(৬৪) যোধপুর (Jodhpur): ইহা রাজস্থানের পশ্চিমে অবস্থিত রাজপুত বীরত্বের ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার কার্পাস ও পশম রেল কারখানা, পাথরের কাজ, জিপসাম খনি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানে একটি বিমান বন্দরও আছে। ইহা ছাড়া, ইহা রেলপথ ও স্থলপথ দ্বারা অন্যান্য অঞ্চলের সহিত যুক্ত।

(৬৫) জয়পুর (Jaipur): ইহা রাজস্থানের রাজধানী এবং মৃৎশিল্প, সোনা-রূপার কারুকার্য্য, নক্সাদার পাথর ও পিতলের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার জন্য প্রসিদ্ধ। রাজপুত বীরত্বের জন্য ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। ইহার নিকটবর্তী অঞ্চলে অভ্র খনি আছে। একটি বড় রেল ষ্টেশন।

(৬৬) বিকানীর (Bikanir): ইহা রাজস্থানের একটি উল্লেখযোগ্য সহর। এখানে কয়লা খনি বিদ্যমান। নিকটবর্তী অঞ্চলে জিপসাম ও অভ্র খনিও আছে।

(৬৭) ট্রম্বে (Trombay): মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত বোম্বাইয়ের নিকটে তৈল শোধন কেন্দ্র। এখানে 'বার্মাশেল' ও 'ষ্ট্যানভাক কোম্পানীর সাহায্যে দুইটি শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ভারতের সর্বপ্রথম আণবিক "রি-এক্টর-এর কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

(৬৮) নাগপুর (Nagpur): ওয়ার্ধা নদীর তীরে মহারাষ্ট্রের পূর্বদিকের একটি উল্লেখযোগ্য সহর। পূর্বে ইহা মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ছিল। ইহা কার্পাস, কাচ ও মৃৎশিল্প, ম্যাঙ্গানিজ, কমলালেবু, কাঠ প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ। ইহা স্থলপথে, বিমান পথে ও রেলপথে বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যুক্ত। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

(৬৯) ওয়ার্ধা (Wardha), অমরাবতী (Amarvati), অকোলা (Akola) ও ইয়োটমল মহারাষ্ট্রের তুলা ব্যবসায়ের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র।

(৭০) শোলাপুর (Sholapur) ও কোলাপুর (Kolapur) মহারাষ্ট্রে অবস্থিত রেশম, পশম ও কার্পাস শিল্পের কেন্দ্র।

(৭১) নাসিক (Nasik): গোদাবরী নদীর উৎসস্থলে অবস্থিত মহারাষ্ট্রের

স্বাস্থ্যকর এবং হিন্দুদের পক্ষে পবিত্র স্থান। ইহা তামা, পিতল ও কাঁসার জিনিসের জন্য উল্লেখযোগ্য।

(৭২) পুণা (Poona): পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত মহারাষ্ট্রের মারাঠা সংস্কৃতির কেন্দ্র। ইহা কার্পাস শিল্প কেন্দ্রও। ইহা ট্যাঁকশাল, হাওয়া অফিস, নদী ও রাসায়নিক গবেষণা কেন্দ্রের জন্য প্রসিদ্ধ।

(৭৩) আমেদবাদ (Ahmedabad): ইহা গুজরাটের সবরমতী নদী তীরে প্রায় ৭০টি কাপড়ের কলও আছে। এখানে সিমেন্ট, কাগজ ও চামড়ার কারখানাও আছে।

(৭৪) সুরাট (Surat): ইহা তাপ্তী নদীর তীরে গুজরাটে অবস্থিত এবং এককালে বন্দর হিসাবে খুব খ্যাতি ছিল। ইহা সোনা-রূপার কাজ, কাগজ ও কার্পাস শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

(৭৫) ব্রোচ (Broach): ইহা গুজরাটে অবস্থিত উপকূল বাণিজ্যের জন্য উল্লেখযোগ্য।

(৭৬) বরোদা (Baroda): কাম্বে উপসাগরের তীরে গুজরাটের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা কার্পাস ও রাসায়নিক শিল্প কেন্দ্র এবং স্ত্রীশিক্ষার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। বোম্বাই ও আমেদাবাদের সহিত ইহা রেলপথে যুক্ত।

(৭৭) ভুপাল (Bhupal): ইহা মধ্যপ্রদেশের রাজধানী, কার্পাসশিল্প কেন্দ্র। ইহার নিকটে সাঁচিস্তূপ অবস্থিত। ইহা ছাড়া এখানে একটি ভারী যন্ত্র নির্মাণের কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে। রাজধানীর সম্মান পাওয়ায় এবং রেল, বিমান ও মোটর পথে বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যোগাযোগ থাকায় স্থানটি উল্লেখযোগ্য। শিল্পকেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা আছে।

(৭৮) জব্বলপুর (Jabalpur): নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত। মধ্যপ্রদেশের একটি বড় রেল ষ্টেশন। ইহার কার্পাস, সিমেন্ট, কাঁচ, মৃৎশিল্প, চুণ, পিতল-কাঁসার জিনিস, রেল কারখানা, গোলাবারুদের কারখানা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহা কাষ্ঠ ব্যবসায়েরও কেন্দ্র। নর্মদার জলপ্রপাত ও উক্ত অঞ্চলের মার্বেল পাহাড় ইহার নিকটেই অবস্থিত।

(৭৯) কাটনি (Katni): ইহা মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত এবং সিমেন্ট, অ্যালুমিনিয়াম তৈজসপত্র, পাথর, কৃষিজাত দ্রব্য প্রভৃতি উৎপাদন ও ব্যবসাকেন্দ্র।

(৮০) ইন্দোর (Indore): ইহা মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

কার্পাস, ময়দা, পিতল, কাঁসা প্রভৃতি শিল্পের জন্য উল্লেখযোগ্য। পূর্বে ইহা দেশীয় নৃপতি হোলকারের রাজধানী ছিল।

(৮১) ভিলাই (Bhilai): ইহা মধ্যপ্রদেশের দ্রাগ জেলায় অবস্থিত। রাশিয়া ও ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় এখানে একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর এখান হইতে ১০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপন্ন হইবে।

(৮২) পাঁচমারী (Panchmari): ইহা মধ্যপ্রদেশের একটি শৈল-নিবাস এবং স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে একটি সেনানিবাসও আছে।

(৮৩) গোয়ালিয়র (Gwalior): ইহা মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। ইহা একটি বড় রেলষ্টেশন। সিগারেটের কারখানা ও প্রস্তর শিল্পের জন্য উল্লেখযোগ্য।

৮৪) নেপানগর (Nepanagar): মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত 'নিউজপ্রিণ্ট' কাগজ প্রস্তুতের কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ। স্থানীয় বনভূমির কাঠ হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া বৎসরে প্রায় ৩০,০০০ টন কাগজ উৎপন্ন হয়।

(৮৫) হায়দ্রাবাদ (Hyderabad): কৃষ্ণা নদীর উপনদী মুসীর তীরে অবস্থিত অন্ধ্ররাজ্যের রাজধানী এবং উক্ত রাজ্যের অপেক্ষাকৃত পশ্চিমদিকে অবস্থিত। বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত ইহা স্থল, বিমান ও রেলপথ দ্বারা যুক্ত। পূর্বে নিজামের রাজধানী হিসাবেও ইহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ইহা কার্পাস ও নানাবিধ কুটির শিল্পের জন্য উল্লেখযোগ্য। এখানে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত।

(৮৬) বেজওয়াদা (Bijoywada or Bezwada): ইহা কৃষ্ণানদীর তীরে অন্ধ্ররাজ্যের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য শিল্প ও ব্যবসাকেন্দ্র। ইহার নিকটে হীরকখনি অবস্থিত।

(৮৭) ত্রিচিনোপল্লী (Trichinopalli or Trichurapalli or Tiruchi): ইহা দক্ষিণ রেলপথের উপর অবস্থিত মাদ্রাজের উল্লেখযোগ্য সহর। ইহা বড় রেলজংশন, তীর্থস্থান, কাপাসশিল্প, চুরুটের কারখানা ও চাউল ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

৮৮) মাদুরাই (Madura or Madurai): ইহা মাদ্রাজ রাজ্যের একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। এখানকার মীনাক্ষী দেবীর মন্দির ও উহার সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্য মনোমুগ্ধকর। ইহা ছাড়া ইহা রেশম, কার্পাস, তামা, কাঁসা, পিতল ও নানাবিধ কুটির শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

(৮৯) তুতিকোরিণ (Tuticorin): ইহা মাদ্রাজ রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত বন্দর ও ব্যবসাকেন্দ্র। সিংহলের সহিতই ইহার ব্যবসাবাণিজ্য বেশী। ইহা ছাড়া মৎস্য, ঝিনুক, শঙ্খ প্রভৃতি উত্তোলনের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র।

(২০) কোয়েম্বাটোর (Coimbatore): ইহা মাদ্রাজের একটি উন্নতিশীল সহর। ইহা দক্ষিণ ভারতে কার্পাস শিল্পের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র। এখানে ইক্ষু গবেষণাগার আছে। ইহা ছাড়া ইহা চীনাবাদাম ও কার্পাসের বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি পাইকারা হইতে জলবিদ্যুৎ শক্তি পাইয়া থাকে।

(২১) ম্যাঙ্গালোর (Mangalore): ইহা মহীশূরের উল্লেখযোগ্য বন্দর এবং আরব সাগরের তীরে অবস্থিত।

(২২) বাঙ্গালোর (Bangalore): ইহা মহীশূরের রাজধানী, বৃহৎ রেল-জংশন ও উন্নতিশীল শিল্প বাণিজ্য কেন্দ্র। কার্পাস, পশম, রেশম, চামড়া, কার্পেট সাবান, সুগন্ধদ্রব্য, লাক্ষা, আসবাবপত্র, চীনামাটি, রাসায়নিকদ্রব্য, তৈল নিষ্কাষণ, বিমানপোত, টেলিফোন, রেডিও মোটর, বাল্‌ব, মেসিন টুল প্রভৃতি শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। ইণ্ডিয়ান একাডেমী অব সায়েন্স, ইণ্ডিয়ান ডেয়ারী এসোসিয়েসন ও অন্যান্য গবেষণাগারের জন্যও স্থানটি প্রসিদ্ধ।

(২৩) বেলগাঁও (Belgam), ধারওয়ার (Dharwar) প্রভৃতি মহীশূরের অন্যান্য সহর। কার্পাস, পশম ও রেশম শিল্প কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধ।

(২৪) মহীশূর (Mysore): ইহা মহীশূর রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত কার্পাস, রেশম, পশম সাবান, সুগন্ধদ্রব্য প্রভৃতি শিল্পের জন্য উল্লেখযোগ্য।

(২৫) কোলার (Kolar): ইহা মহীশূর রাজ্যে অবস্থিত স্বর্ণখনির জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার কয়েকটি খনি পৃথিবীর মধ্যে গভীরতম এবং ভারতের স্বর্ণ উৎপাদনের শতকরা ৯৮ ভাগ এখান হইতেই পাওয়া যায়। শিবসমুদ্রম হইতে ইহা জলবিদ্যুৎ শক্তি পাইয়া থাকে।

(২৬) ভদ্রাবতী (Bhadrabati): ইহা মহীশূর রাজ্যের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র। এখানকার অন্যান্য শিল্পের মধ্যে সিমেণ্ট ও কাগজ উল্লেখযোগ্য।

(২৭) ত্রিবান্দ্রম (Trivandrum): ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত কেরালার রাজধানী, শিল্প ব্যবসা ও শিক্ষা কেন্দ্র। এখানকার নারিকেলের দড়ি, পেন্সিল, হাতির দাঁতের কাজ, সিমেণ্ট, বাদাম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কেরালার অন্যান্য বন্দরের মধ্যে কোচিন, (Cochin), কুইলন (Quilon) ও আলেপ্পী (Alleppey) উল্লেখযোগ্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রমশিল্প

(Manufacturing Industries)

Q. 1. Discuss the factors which influence the localisation of industries in a particular area.

(যে অবস্থাগুলি কোন অঞ্চলে শিল্পের একদেশতার উপর প্রভাব বিস্তার করে তাহাদের আলোচনা কর।)

Ans কোন স্থানে বহুসংখ্যক এক বা একাধিক শিল্পের সমাবেশ ঘটিলে তাহাকে শিল্পের একদেশতা (localisation) বলে। এই একদেশতা বিভিন্ন অবস্থা বা কারণের উপর নির্ভর করে। নিম্নে উহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল :

(১) **কাঁচা মালের সহজলভ্যতা (Easy availability of raw materials) :** যে স্থানে কাঁচামাল সহজে পাওয়া যায় সে স্থানে শিল্পের একদেশতা বেশী দেখা যায়। কোন শিল্প কাঁচামাল উৎপাদন কেন্দ্রের সন্নিকটে কিংবা কিছুটা দূরে অবস্থিত হইবে তাহা কাঁচামালের প্রকৃতির উপর অনেকটা নির্ভর করে। যে কাঁচামাল খাঁটি (Pure raw materials) অর্থাৎ যে কাঁচামাল শিল্পজাত দ্রব্যে রূপান্তরিত হইলেও ওজনের দিক দিয়া বিশেষ পরিবর্তন হয় না, তাহা যানবাহন ব্যবস্থা ভাল হইলে দূর অঞ্চলে স্থানান্তরিত করিয়া শিল্প কার্যে লাগান চলে। পাট বা তুলা এই জাতীয় কাঁচামাল। ফলে ম্যানচেষ্টার তুলা উৎপাদন না করিয়াও আমদানিকৃত তুলা দ্বারা বস্ত্রশিল্পে একদেশতা লাভ করিতে পারিয়াছে। অনুরূপে ডাণ্ডিতে পাট-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু লৌহের মত আবর্জনাসহ ভারী কাঁচামালের (weight losing material) শিল্প লৌহখনির নিকটে অবস্থিত হওয়া সুবিধাজনক। পচনশীল (perishable) কাঁচামালের পক্ষেও একথা প্রযোজ্য। এ কারণে উত্তরপ্রদেশে অধিকাংশ ইক্ষু শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

(২) **শক্তি (Power) :** শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য 'শক্তি' অত্যাবশ্যক। ইহা ভিন্ন শিল্প কারখানা চলিতে পারে না। কিন্তু শক্তির উৎস হিসাবে কয়লা, খনিজ তৈল, জলবিদ্যুৎ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। যেখানে এই শক্তি সরবরাহ সহজে সম্ভব সেখানেই শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। কয়লা ভারী জিনিস এবং উহার পরিবহণ ব্যয় বেশী। এজন্য কয়লার খনির নিকটে শিল্প আকৃষ্ট হয়। তাই ইংলণ্ডের শিল্পাঞ্চল কয়লার খনির নিকটে বেশী দেখা যায়। জলবিদ্যুৎ ও খনিজ তৈল বহন ব্যয়

অপেক্ষাকৃত কম। এজন্য উক্ত শক্তি দূরবর্তী অঞ্চলে পাওয়ার সুবিধা থাকিলে সেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে।

(৩) জলবায়ু (Climate): জলবায়ু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিল্পের একদেশতায় সাহায্য করে। মহারাষ্ট্র ও ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র শিল্পের একদেশতায় উক্ত অঞ্চলের আর্দ্র জলবায়ু সহায়ক হইয়াছে। তবে বিজ্ঞানের যুগে কারখানায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করিয়া অনেক শিল্প গড়িয়া উঠিতে দেখা যাইতেছে। শিল্পের কাঁচামালের উৎপাদন জলবায়ুর উপর অনেকটা নির্ভরশীল। সুতরাং যে অঞ্চলে জলবায়ুর প্রভাবে কোনও কাঁচামাল প্রচুর উৎপন্ন হয়, তথায় ঐ শিল্পের একদেশতা সৃষ্টির সাহায্য করে। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গে পাট শিল্পের, উত্তর প্রদেশে ইক্ষু শিল্পের একদেশতা দেখিতে পাওয়া যায়।

(৪) শ্রমিক (Labour): শিল্পের জন্য সস্তা ও সুদক্ষ শ্রমিক অধিক সংখ্যায় প্রয়োজন। যে সমস্ত অঞ্চলে লোকসংখ্যা ঘন তথায় শ্রমিক সরবরাহ সহজসাধ্য এবং শিল্প স্থাপনের অন্যান্য সুবিধা থাকিলে শ্রমিকের প্রাচুর্য্য হেতু শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে। আসামের চা শিল্পের একদেশতা উত্তর প্রদেশ ও বিহার হইতে সুলভ শ্রমিক আমদানির জন্যই অনেকটা সম্ভব হইয়াছে।

(৫) পরিবহণ (Transport): যে অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে তথায় শিল্পজাত দ্রব্যের স্থানীয় চাহিদা ছাড়া অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী অঞ্চলেও পাঠানোর প্রয়োজন। আবার শিল্পের উপযোগী নানাবিধ কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি অন্যস্থান হইতে আমদানি [illegible] প্রয়োজন হয়। এজন্য শিল্পাঞ্চলের সহিত অন্যান্য স্থানে জলপথ, স্থলপথ বা রেলপথে যাতায়াতের ভাল ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সুতরাং উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা শিল্পের একদেশতায় সহায়তা করে। বোম্বাইয়ের বস্ত্র শিল্পে কিংবা কলিকাতার পাট শিল্পের একদেশতার উপর উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থাও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

(৬) বাজার (Market): শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদার উপর শিল্প প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে। তবে এই চাহিদা বা বাজার দেশে বা বিদেশে পরিব্যাপ্ত থাকিতে পারে। সুতরাং যে স্থান হইতে বাজারে বা বিক্রয় কেন্দ্রে শিল্পজাত দ্রব্য অনায়াসে প্রেরণ করা চলে সেখানে শিল্পের একদেশতা দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার পাটজাত দ্রব্যের বাজার পৃথিবীব্যাপী। কিন্তু কলিকাতা হইতে সমুদ্রপথে রপ্তানি করার সুযোগ-সুবিধা থাকায় এখানে পাট শিল্পের একদেশতা লাভ করিতে কোন অসুবিধা হয় নাই।

(৭) মূলধন (Capital): শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইলে প্রচুর মূলধন প্রয়োজন। সুতরাং যে অঞ্চলে মূলধন প্রাপ্তির সুযোগ সুবিধা বেশী তথায়